সারস্বত গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ৩

জ্ঞানীগুরু

বা

জ্ঞান ও সাধন-পদ্ধতি

অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেব নিশ্চয়ং স্ফারং সম্যগ্ জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ॥
—যোগবাশিষ্ঠ

পরিব্রাজকাচার্য পরমহংস

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

প্রণীত

[মূল্য—আট টাকা

প্রকাশক

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ

পোঃ হালিসহর, ২৪ পরগণা।

[প্রথম সংস্করণ—১৩১৫, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩১৯, তৃতীয় সংস্করণ—১৩২৪, চতুর্থ সংস্করণ—১৩২৭, পঞ্চম সংস্কবণ—১৩৩০. ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩৩৬, সপ্তম সংস্করণ—১৩৫১, অষ্টম সংস্করণ—১৩৫৫,

প্রাপ্তিস্থান

১। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর (২৪ পরগণা)

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্ (কলেজ স্কোয়ার)

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—শ্রীঅমলেন্দু শিকদার

জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩/১, মণীন্দ্র মিত্র রো, কলিকাতা-৯

শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ তৎ সৎ

উৎসর্গপত্র

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উদ্দেশে

দেব

নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় আপনাদের পরিত্যাগ করিয়া যে কঠোর পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে সফলতালাভ আপনার আশীর্বাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কেননা শাস্ত্রে আছে,—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

পুত্র সর্বদোষে দোষী হইলেও পিতার নিকট ক্ষমার্হ। তাই আপনার আশীর্বাদে জগৎপিতা আমাকে মঙ্গলের পথে কিরূপে লইয়া যাইতেছেন, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি আপনার চরণে নিবেদন করিলাম।

শাস্ত্রে পড়িয়াছি, পুত্র হইলেই মানব পিতৃ-ঋণে মুক্ত হয়। কিন্তু আমি এখন অধ্যাত্ম-জগতে সংসারী,—"সাধনা" আমার পত্নী। তাঁহার গর্ভে

"জ্ঞান" নামক পুত্র ও "ভক্তি" নাম্নী কন্যা লাভ করিয়াছি। কন্যাটীকে আজীবন বুকে রাখিব। পুত্রটিকে আপনার চরণে সমর্পণ করিয়া অদ্য পিতৃ-ঋণে মুক্ত হইলাম। যখন হতভাগ্য সন্তানের স্মৃতি জাগ্রত হইবে বা সাংসারিক অশান্তিতে হৃদয় অধিকার করিবে, তখন এই পৌত্রটীকে নিকটে ডাকিবেন, তাহা হইলে ইহকালে পরাশান্তি এবং পরকালে পরমাগতি লাভ করিতেপারিবেন। আমার প্রার্থনা, বাল্যকালের ন্যায় চিরকালই আমার প্রতি মঙ্গলদৃষ্টি রাখিবেন।

আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র
শ্রীনলিনীকান্ত

গ্রন্থকারের বক্তব্য

নমঃ পরমহংসায় সচ্চিদানন্দমূর্ত্তয়ে।
ভক্তাভীষ্টপ্রদায়াশু সাক্ষাচ্চৈতন্যরূপিণে ॥

শিরস্থিত শুক্লাব্জে হংসাসনে উপবিষ্ট নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ গুরুদেবের পদপঙ্কজে প্রণতিপুরঃসর তদীয় কৃপালব্ধ, জ্ঞানগম্য "জ্ঞানী-গুরু" বা "জ্ঞান ও সাধন-পদ্ধতি" অগ্র সাধারণ পাঠকবর্গের অমল করকমলে বিমলানন্দে অর্পণ করিলাম।

আমার পঠদ্দশায় আমি যখন ছাত্রবৃত্তি পাঠ অধ্যয়ন করি, তখন প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভূবিদ্যাপাঠে গ্রহণ ভূমিকম্প প্রভৃতির কারণ অবগত হইয়া প্রাণে একটা দারুণ দুঃখের বোঝা চাপিয়া গেল। সে দুঃখ কাহাকেও জানাইলাম না—কেহ জানিতেও পারিল না। সময়ে সময়ে মনে হইত বুঝি গ্রহণ-ভূমিকম্পের স্থায় হিন্দুদের সকল কথাই "ঠাকুরমার গল্প"। ইতিপূর্বে পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট ধর্মশ্রবণ ও বিধবা পিসীমাতাদের বটতলার ছেঁড়া রামায়ণ-মহাভারত ভিন্ন কোন ধর্মশাস্ত্রের অস্তিত্বই জ্ঞাত ছিলাম না। কিন্তু তখন হইতেই মনে ধর্ম ও সাধন-রহস্যের একটা অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি জাগিয়া পড়ে। আমি অতি গোপনে—উদাসীনের স্থায় নীরবে ধর্ম-উপদেশ শ্রবণ ও শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করি। তখন স্বধর্মে (প্রবৃত্তিমার্গে) বিশেষ আস্থা না থাকিলেও হিন্দুদের "শাস্ত্র" আষাঢ়ে গল্প এবং "ধর্ম" বালকের পুতুল-খেলা, একথা মনে করিতে কষ্ট হইত। কুসংস্কারাপন্ন অসভ্য হিন্দুবংশে জন্মিয়াছি, একথাও মনে স্থান পায় নাই। ইহা হয়ত জাতীয় অভিমান হইতে পারে; কিন্তু পরমারাধ্য গুরুদেব বলিয়াছেন, "ইহাই আমার পূর্বজন্মের সংস্কার।"

তাহার পর কত দীর্ঘ সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, এ হৃদয়ে কত আশা কত উত্তম লইয়া কত আস্ফালন করিয়াছি, দাসত্বশৃঙ্খল গলে পরিয়া লম্ফে-ঝম্ফে কতই রঙ্গভঙ্গ করিয়াছি। মহামায়ার সম্মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক শত-সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও নিদ্রিত ছিলাম। সহসা কালের করালদংষ্ট্রাঘাতে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল—চারিদিক আঁধার দেখিলাম। অন্যে পাগল হইত, আমি প্রকৃতি-দেবীর যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সংসার ছাড়িয়া পলাইলাম। নিভৃত বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে সাধু-সন্ন্যাসীর আড্ডায় ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন কোন্ শুভলগ্নে পরিব্রাজকাচার্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী গুরুরূপে দেখা দিয়া হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দিলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার কৃপায় আর্য-শাস্ত্রের জটিল-রহস্য উদ্ভেদ করিতে শিক্ষা করিলাম। বাল্যকালের সেই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার ফলে জানিতে পারিলাম, পৃথিবী ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা সমতল প্রভৃতি যাহা অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনা যায়, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে ; কেননা হিন্দুশাস্ত্রে আছে,—

কপিত্থফলবৎবিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্।—গোলাধ্যায়

যে হিন্দু সূর্যদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া উদয়াচল হইতে অস্তাচলে লইয়া যান, তাঁহারাও হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত তথ্য জানেন না। শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—

চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।—গোলাধ্যায়

ভাস্করাচার্যের গোলাধ্যায় গ্রন্থের আর একটী শ্লোক পাঠ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল। যে মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নিউটন পাশ্চাত্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং ইংরাজশিষ্য ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই সেই গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া উর্ধ্বপুচ্ছে পূর্বপুরুষগণকে অস্বাভাবিক দোষে দোষী স্থির করিয়াছিলেন, সে তত্ত্ব হিন্দুঋষিগণ বহুপূর্বে অবগত হইয়া গিয়াছেন। যথা—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে ॥

সেই অবধি আমি হিন্দুঋষিগণকে গুরুর ন্যায় হৃদয়ে পূজা করিতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহাদের প্রচারিত শাস্ত্র ভক্তি-বিশ্বাসের কারণ বুঝিয়া আমি তাহাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলাম। তাই আজ হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে, গুরুর উপদেশ ও কার্যকারণের প্রত্যক্ষতা ফলে হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে যেসকল সত্য আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ এই গ্রন্থে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভরসা আছে এই সকল সত্য অন্যান্য সাধুজনেরও হৃদয় স্পর্শ করিবে।

আমি যখন "যোগীগুরু" গ্রন্থখানি প্রকাশ করি, তখন অনেকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই নাটক-নভেল-প্লাবিত দেশে, বাই-খেমটা-থিয়েটারের আমলে উদাসীনের গান কে শুনিবে?" কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার অল্পদিন পরেই আমার সে বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি, এই হিন্দুর দেশে এখনও অসংখ্য হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা, হিন্দুধর্মে বিশ্বাস ও ভজন-সাধনে প্রবৃত্তি আছে। ভারতের সর্বত্র—এমন কি সুদূর সিংহল, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতেও অসংখ্য হিন্দু "যোগীগুরু" পাঠ করিয়া পত্রদ্বারা তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিয়া লইতেছেন। অনেকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। আরও সুখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি ভদ্রবংশসম্ভূত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁহাদেরই উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হইয়াছি। তবে অনেক হিংসাপরায়ণ বলদ-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নানাকথা বলিতে পারেন, কিন্তু সেরূপ ব্যক্তির প্রলাপোক্তি ধর্তব্য নহে। কেননা—

হস্তী চলৈ বাজার মেঁ কুত্তা ভুঁকৈ হজার।
সাধুওঁ কা দুর্ভাব নহী জোঁ্যা নিন্দে সংসার॥

এই গ্রন্থে উচ্চাঙ্গের কতকগুলি সাধন-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল। আমি বিশেষরূপে জানি, মৌখিক উপদেশ ও হাতে-কলমে সাধন-কৌশল দেখাইয়া না দিলে কোন সাধক সাধনে সক্ষম হইবে না। তাই অকারণ সাধনরহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ না করিয়া কতকগুলি সাধন-তত্ত্ব মোটামুটি-ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। সুকৃতিমান্ সাধকগণের আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। জন্ম-জন্মান্তরের কর্মগুণে যদি কাহারও গ্রন্থোক্ত কোনও সাধনে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার নিকট আসিলে আমি সবিশেষ জানাইতে বাধ্য আছি।*

এই গ্রন্থে সামান্য জনগণের আচরিত ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব এবং উচ্চ অধিকারীর জন্য ব্রহ্ম-বিচার, ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও তাহার সাধনা প্রভৃতি আর্যশাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ও মহান্ ভাব যথাসাধ্য সরলভাবে ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, আর্যশাস্ত্রোক্ত মহৎ ধর্ম তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা মাদৃশ ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির সাধ্যাতীত। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা গুণগ্রাহী সাধকগণের বিবেচ্য। আরও এক কথা, এ পথের পথিক ভিন্ন এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভগবানের কৃপাই ইহা বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

এই গ্রন্থে দেবলোক বা দেবতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছি বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, আমি প্রকারান্তরে নিরাকার-বাদীর পক্ষ সমর্থনপূর্বক সাকারবাদ উড়াইয়া দিয়াছি। আমি স্থূল-সূক্ষ্ম, সান্ত-অনন্ত ও সাকার-নিরাকার প্রভৃতি ভগবানের সকল ভাবই বিশ্বাস করি। তবে এই গ্রন্থখানি জ্ঞানশাস্ত্র। জ্ঞানীর মতে প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীব-

* পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্থূলের কার্য পরিসমাপ্ত করিয়া বিগত ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ব্রহ্মনির্বাণ গ্রহণ করিয়াছেন।—প্রকাশক

জগৎ যখন মিথ্যা, তখন জড়জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী সূক্ষ্ম অদৃষ্ট-শক্তিরূপিণী দেবতাগুলি যে কল্পিত রূপক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে জানাইতেছি যে, শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতগণের বিশ্বাসের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, সংহিতা, গীতা, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি আর্যশাস্ত্রের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয় নাই। কারণ, ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠক ঐ অংশ বাদ দিয়া পড়িলেও কোন অভাব বোধ করিবেন না। এক্ষণে মরালধর্মানুসরণকারী পাঠকগণ দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্বকার্যে ব্রতী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। কিমধিকবিস্তরেণ—

দুর্গাপুর, শান্তি-আশ্রম
২রা ভাদ্র, জন্মাষ্টমী
১৩১৫ বঙ্গাব্দ

ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু
দীন—**নিগমানন্দ**

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রয়োদশ সংস্করণের বক্তব্য

"জ্ঞানীগুরু"র দ্বাদশ সংস্করণ অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় ত্রয়োদশ সংস্করণ মুদ্রিত করিতে হইল। "জ্ঞানীগুরু"র ন্যায় বৃহৎ দার্শনিক গ্রন্থের এতাদৃশ বহুল প্রচার দেশের পক্ষে সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যে বাঙ্গালী জাতি "অভাগিয়া কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে" বলিয়া জ্ঞানের নাম শুনিলে কর্ণ আচ্ছাদনপূর্বক নাসিকা কুঞ্চিত করিত, আজ সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানগ্রন্থের এরূপ আদর দেখিয়া মনে হইতেছে বাঙ্গালীজাতির অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।

এই সংস্করণ দ্বাদশ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হইলেও ইহাকে যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করা হইয়াছে।

সর্ববিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধিহেতু পূর্ব সংস্করণের মূল্য আট টাকা নির্ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে মুদ্রণব্যয় এবং কাগজের মূল্য অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও গ্রাহকগণের কথা বিবেচনা করিয়া বর্তমান সংস্করণের মূল্য পূর্ববৎ আট টাকাই রাখা হইল। ইতি—

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
স্বামী সত্যানন্দ

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—নানাকাণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড

তৃতীয় খণ্ড—সাধনকাণ্ড

প্রথম খণ্ড

নানা কাণ্ড

একমেবাদ্বিতীয়ম্

গীত

মূলতান—একতালা

মা আমার হ'য়েছে কালী-কালা কালে।
অবোধ মানবে ভিন্ন বলে,—যারা বিষয়-বিষে ভোলা,
তারাই কেহ কালা, কেহ বা কালী বলে॥

কালী হ'তে শূলী কিন্তু পত্নী ঘোষে,
লক্ষ্মীরূপে সে-ই সেবে শ্রীনিবাসে,
আবার শুনি (ওরা) ছিল ঐ গর্ভাবাসে,
ভেদভাবে রিশে, মিশে দলে॥

আদ্যাশক্তি মাতা দেব-দুঃখ তরে
ল'য়ে অসি-পাশাঙ্কুশ চতুষ্করে,
লোলজিহ্বা লম্বোদরী মূর্তি ধরে,
দানবদলে নাশিতে ;—

আবার ভূভার-হরণ কারণে,
অসি ত্যজে বাঁশী নিল বৃন্দাবনে,
গোপাল হইয়া গোপাল-ভবনে,
চরালে গোপাল কদমতলে॥

দীন নলিনীকান্ত যুগ্মকরে কয়,
সত্ত্ব-রজস্তমে এক বিশ্বময়,
ভেদাভেদজ্ঞানে নরক নিশ্চয়,
দ্বিভাবে অভাব পড়ে ;—

প'ড়েছে আমার হৃদয়েতে কালী,
জেনে তাই আমি ভালবাসি কালী,
হ'য়ে কুতূহলী বলি কালী কালী
কালের মুখে কালী দিব ব'লে।

নদীয়া—কুতবপুর। ৩।২।১৩০৭

জ্ঞানীগুরু

প্রথম খণ্ড—নানা কাণ্ড

ধর্ম কি ?

ধর্মতত্ত্ব জানিতে হইলে অগ্রে ধর্ম কি তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। ধর্ম কাহাকে বলে ?—

ধ্রিয়তে ধর্ম ইত্যাহুঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ।

ধারণ করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম। পুণ্য কি, পাপ কি, জ্ঞান কি, অজ্ঞান কি, সুন্দর কি, কুৎসিৎ কি—এক কথায় ভাল কি, মন্দ কি, যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। লোকত্রয় বা জগত্রয় যাহাতে ধৃত বা নিহিত, তাহাকেই ধর্ম বলে। অথবা লোকসকল যাহাকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই ধর্ম। কেবল লোকসকল বলি কেন—মহদাদি অণু পর্যন্ত, ভুবনত্রয়ে যাহা কিছুর সম্ভাবনা আছে, তৎসমস্তই ধর্মের দ্বারা ধৃত, রক্ষিত ও পরিচালিত। ধর্মই জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রী—ধর্মই সুখের স্বরূপ। ধর্মের জন্যই জাগতিক পদার্থের আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি।

দেবতা, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্‌ ও জড়পিণ্ড প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থেরই ধর্ম ও সাধনার আবশ্যকতা আছে। তবে মানুষের

ধর্ম আছে, ধর্মজ্ঞান আছে,—আর পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বা উদ্ভিদাদির ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মজ্ঞান নাই। ধর্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ অন্যান্য প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ। আর এক কথা—মানুষ জীবসৃষ্টির চরমোন্নতি, ধর্মসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র, তাই মানুষ জন্মজন্মান্তরের অনুশীলনবলে ধর্মজ্ঞানে সমুন্নত হয় ও সাধনপথে অগ্রসর হইয়া পড়ে। তাই মানুষ ইচ্ছা করিলে—চেষ্টা করিলে সহজেই ধর্মসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে পারে, অন্যান্য জীবে তাহা পারে না। কিন্তু তাহারাও ধর্মদ্বারা চালিত ও রক্ষিত। মানুষ এ বিষয়ে অনেকাংশে স্বাধীন, ইতর জীব প্রকৃতির অধীন। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—"ক্রমবিবর্তনবাদে এক বিন্দু বালুকাকণা মহামহীধরে পরিণত হয়, বা মানুষ হইয়া জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া থাকে।" কথাটা সত্য, বালুকাকণার যে ধর্ম আছে, সে ধর্মই তাহাকে উন্নতির পথে টানিয়া লইয়া ক্রমবিবর্তনবাদেই বলুন, আর জন্মান্তরীয় উন্নতির পথেই বলুন, তাহাকে ক্রমে ক্রমে বহুজন্মের পথ দিয়া মানুষে পরিণত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু ঐ বালুকাকণার ক্রমোন্নতি প্রকৃতির ধর্মে সম্পাদিত হয়, আর মানুষের ধর্মজ্ঞান থাকায়, সে ইচ্ছা করিলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে।

আবার মানুষ হইলেই যে তাহার ধর্মজ্ঞান আছে, ইহা সর্বত্র স্বীকার করিতে পারি না; পার্বত্য বনজঙ্গলে ও অনেক অসভ্য দেশে আজও এমন মানুষ আছে যে, যাহারা ধর্ম কি তাহা জানে না বা কোন প্রকারেই ধর্মের অনুশীলন বা সাধনা করে না। এমন কি সভ্য সমাজে জন্মিয়াও অনেক মানুষ ধর্মের দিক ঘেঁষে না। শিথিলচর্ম, পককেশধারী বৃদ্ধও আত্মসুখে রত থাকিয়া জীবনের দিনকয়টা কাটাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের ধর্ম আছে, তবে ধর্মজ্ঞান নাই। ধর্মজ্ঞান থাক্ আর নাই থাক্, ইহা স্বীকার করিতে

হইবে যে, তুচ্ছ বালুকণা হইতে পশু, পক্ষী এমন কি দেবতাদের পর্যন্ত ধর্ম আছে, এবং সেই ধর্মই সকলকে ধারণ করিয়া আছে ও ক্রমবিবর্তন-বাদে উন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে। এখন দেখিতে হইবে, মানুষ পশ্বাদি ইতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা ও মৈথুন প্রভৃতি আত্মসুখে রত থাকিয়াই কি আমরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া স্পর্দ্ধা করি? যদি তাহাই হইত, তবে মনুষ্যত্বে ও পশুত্বে প্রভেদ থাকিত না। মানুষের ধর্মজ্ঞান ও স্বাধীনভাবে তাহার পরি-চালনার শক্তি আছে বলিয়াই এবং জগৎপিতা একমাত্র মনুষ্যকেই সেই শক্তিশালী করিয়াছেন বলিয়াই আমরা জীবসৃষ্টির শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছি। যাহারা ধর্মের অনুশীলন বা সাধনা করে, তাহারাই প্রকৃত মনুষ্য, আর যাহারা আহার, নিদ্রা ও মৈথুনে রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা মনুষ্যদেহধারী পশু মাত্র। অতএব মনুষ্যজীবন ধারণ করিয়া, ধর্মজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য। কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, যখন স্বাভাবিক ধর্মে সকলকেই ক্রমোন্নতির পথে টানিয়া লইতেছে, যখন আমরাও একদিন আপনা-আপনি উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারিব, তখন স্বাধীন চেষ্টা কেন করিব? একদিন আমরা উন্নতির চরম সীমায় উঠিতে পারিব বটে কিন্তু সে কতদিনের কথা? কত যুগ কত কল্প কাটিবে, কত শত শত দেহ লয় হইবে, কত ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আপন অধিকারে রহিয়াছে; মানুষ ইচ্ছা করিলে এই জীবনেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। ভগবান্ মানুষকে দয়া করিয়া ঐ শক্তি দান করতঃ তাঁহার সাধের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন। সে শক্তি কি?—ধর্মজ্ঞান।

মনুষ্যকুলে জন্মিয়া যতদিন ধর্মজ্ঞান সমুদ্ভূত না হয় ততদিন মানুষ পশুসদৃশ। যদি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরও ধর্মজ্ঞান না জন্মিয়া থাকে, তবে

তাহাকেও পশু বলা যাইতে পারে। অতএব মানুষ হইয়া ধর্মালোচনায় পশুত্ব বর্জন ও মনুষ্যত্ব অর্জন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আবার শুধু মনুষ্যত্ব লাভই চরম সীমা নহে। পশুত্ব পরিহারপূর্বক ধর্ম-অনুশীলনে মানুষ হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। দেবত্বলাভ হইলে তখন ব্রহ্ম-উপাসনায় ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। মানুষের সে শক্তি আছে। সে শক্তি আছে বলিয়াই মানুষ অন্যান্য মনুষ্যেতর জীব হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহার অনুশীলনে মানুষ পশুত্ব পরিহারপূর্বক ক্রমে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম ও তাহার অনুশীলনের নাম ধর্মসাধনা।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম কি, ইহা বুঝিলে ধর্মসাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়; তথাপি সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের উচ্চশ্রেণীর জীব মানুষ হইতে অতি নিম্ন-শ্রেণীর জীব কীট-পতঙ্গাদি পর্যন্ত, সকলেই সুখের জন্য অহোরাত্র লালায়িত—সুখের জন্য প্রতিক্ষণ ব্যস্ত। তাহাদের স্বভাব, গতি ও ব্যবহার দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সুখের আশা সকলেই করে। কিন্তু সুখী কে? অনুসন্ধান করিলে দেখিবে, পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট্ হইতে কুটীরবাসী ভিখারী পর্যন্ত, সকলেই আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রদংশনে নিয়ত অস্থির। ধন-জন বল, রূপৈশ্বর্য বল, খ্যাতি-প্রতিপত্তি বল, কিছুতেই মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। চন্দ্রিকাশালিনী বসন্তযামিনীর মধ্যভাগে যূথিকা-শয্যায় শয়ন করিয়াও দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ সম্রাট্গণ সুখী হইতে পারেন নাই। সংসারে কাহারও আশা পূরে না—সাধ মিটে না। কেহ

এক বিষয়ে সুখী হইলেও অন্যান্য পাঁচ বিষয়ে নিরন্তর মনঃকষ্টে কাল যাপন করিতেছে। তবে সুখ কোথায়? সুখী কে?

সুখ অর্থে [সু=উত্তম+খ (জ্ঞানের) ইন্দ্রিয়] ইন্দ্রিয়-শক্তির স্বভাব-নিয়মিত স্ফূর্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তিবিশেষ। তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে, আত্মশক্তি জ্ঞানের স্ফূর্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্যই সুখ। ধর্ম সেই সুখের উপায়, ধর্মদ্বারাই ইন্দ্রিয়-শক্তির সম্যক্ স্ফূর্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

সুখং বাঞ্ছতি সর্বো হি তচ্চ ধর্মসমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্মঃ সদা কার্যঃ সর্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ॥

—দক্ষসংহিতা, ৩।২২

সকলেই সুখের বাঞ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু সুখ ধর্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়; অতএব সকলেই সর্বদা সযত্নে ধর্মাচরণ করিবে। ধর্মাচরণে ইন্দ্রিয়শক্তির সম্যক্ স্ফূর্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তখন সর্ববিধ জগতের (বাহ্য, আন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম) যথার্থ তত্ত্ব আত্মায় উপলব্ধি করিলে সুখ লাভ হয়। সে সুখ স্থায়ী, তাহাতে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মৃদু মধুর লহরীলীলা আছে, লেলিহান আকাঙ্ক্ষার লক্ লক্ জিহ্বার প্রসার ও অনলময়ী ঝটিকা নাই।

আরও এক কথা, সংসারে সর্বসুখে সুখী হইলেও, সে সুখ চিরস্থায়ী নহে। কেননা দেহপাত হইলে পরলোকের পথে ধন-জন বল, স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব বল, কেহই সাথের সাথী হইবে না, তখন একমাত্র ধর্ম সঙ্গে যাইবে।

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

এতাবতা স্পষ্টই জানা গেল যে, জীব স্বাধীন, ধর্মপ্রবৃত্তি তাহাদের স্বাধীন বৃত্তি,—অবিদ্যা বা মায়া তাহাকে মোহগর্তে নিপাতিত করিতেছে। অতএব মনুষ্যের কর্তব্য যে, যাহাতে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া

আত্মোন্নতি হয়—আত্মপ্রসাদ লাভ হয়—কামনাবাসনার খাদ দূরীভূত হয় তাহাই করা। আত্মা সুখ-দুঃখ চাহেন না, আত্মোন্নতিই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের লক্ষ্য—আত্মোন্নতির মূল কারণ ধর্ম, একথা সকল দেশের জ্ঞানিগণের অনুমোদিত। ঐ দেখ, পাশ্চাত্য ধর্মগুরু বলিতেছেন—

Not enjoyment and not sorrow
Is our destined end or way,
But to act, that each tomorrow
May find further than to-day.

শুধু আত্মোন্নতি বলি কেন? অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির মূলেও ধর্ম নিহিত। অতএব ধর্মের মত বন্ধু আর কে আছে? ইহ-লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সেই পরলোকে—সেই অজানা-অপরিচিত দেশে, সেই পাপ-পুণ্য-বাসনা-শান্তির দেশে, সেই নরক-স্বর্গের সাধনার দেশে যে অনুগামী হয়, তাহার মত আদরের যত্নের স্নেহের বন্ধু আর কে আছে? ধর্ম-সাধনার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। ধর্মের স্নেহবাহুর মধ্যে—সুরভি-সুবাসের মধ্যে আত্মাকে সুখে রাখিবার উদ্দেশ্যই ধর্মসাধনার প্রয়োজন।

আর একটি মহতী কথা, আত্মা পরমাত্মার অংশ (দ্বৈতমতে পার্ষদ বা দাস), সুতরাং ব্রহ্মানন্দ বা পূর্ণ সুখ তিনি ভোগ করিয়াছেন,—সে আস্বাদ জানেন। জগতের জীব সেই সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। জীব অবিদ্যার বন্ধনে আত্মবিস্মৃত, কিছুই জানে না—কিছুই বুঝে না, তবুও সুখের জন্য লালায়িত, জীবমাত্রেই সুখস্পৃহার অধীন। ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিতে জীব ছুটিতেছে। সুখের আশাতেই দাতা দান করিতেছে, গ্রহীতা হাত পাতিতেছে, সুখের কামনায় রাজরাজেশ্বরী মাথায় মুকুট পরিতেছে, কাঙ্গালিনী তৃণগুচ্ছে কুটীর সাজাইতেছে। সুখের পিপাসার দুর্নিবার জ্বালায় সখের ইয়ার 'ঢাল ঢাল আরও ঢাল' বলিয়া বোতলস্থ দ্রব-

বহির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সুখের জন্যই চোর চুরি করিতেছে, কেহ রূপ-রস টাকাকড়ি কামনা করিতেছে, কেহ অযথা ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতেছে। সর্বজনহিতৈষী সাধু সুখতৃপ্তিরই অজ্ঞাত অনুশাসনে, দীনদুঃখীর দুঃখমোচনচিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াছেন। সুখ-তৃপ্তি-লালসাতেই রাজাধিরাজ ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারী সাজিতেছেন, আব দরিদ্র দশটি টাকার জন্য অপরের প্রাণ নষ্ট করিতেছে। তৃষ্ণার্ত মৃগ যেমন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিত হয়, সুখের আভাস পাইলেই জীব তদ্রূপ ধাবিত হইতেছে। কিন্তু সংসারে সবাই অতৃপ্ত, কাহারও সুখের আশার নিবৃত্তি হইতেছে না। হইবে কেন? সংসারে সকল সুখই অংশ মাত্র, জীব পূর্ণ সুখের কাঙাল। ব্রহ্মানন্দের তুলনায় রাজৈশ্বর্য তুচ্ছ, তাই রাজরাজেশ্বর মণিময় ময়ূরসিংহাসনে বসিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কেবল একমাত্র ধর্মাচরণে সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায় বলিয়াই সকলে ধর্মসাধনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

ধর্মের সার্বভৌমিকতা

ভগবান্ এক, মানবাত্মাও এক, সুতরাং ধর্মও এক ভিন্ন কখনও দুই রকম হইতে পারে না। মহদাদি অণু পর্যন্ত যাহার দ্বারা ক্রমবিবর্তন-ধারায় উন্নতির চরম সীমায় চালিত, তাহার নাম ধর্ম। সুতরাং যাবতীয় মানবই এক ধর্মের অধীন। তবে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার এ বিদ্বেষ-কোলাহল উত্থিত হয় কেন?

সকল দেশের, সকল মানবের, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম এক, কিন্তু সাধনপথ বিভিন্ন। জীবমাত্রেরই শরীরপোষণার্থ ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিক পদার্থের প্রয়োজন। সকলেই ঐ সকল পদার্থ শরীররক্ষার্থ নিত্য নিত্য

গ্রহণ করিতেছে। তবে হিংস্র জন্তু রক্ত-মাংসময় জীবদেহ ভক্ষণে, অন্যান্য পশুগণ তৃণ-গুল্মাদি ভক্ষণে, মানুষের কোন সমাজের লোক ঘৃত-ময়দা, কোন সমাজের লোক মৎস্যমাংস, কোন সমাজের লোক ফলমূল, কোন সমাজের লোক মিশ্রিতপদার্থোৎপন্ন খাদ্য ভক্ষণে ঐ পাঞ্চভৌতিক পদার্থে শরীর পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষুধা-শান্তি, গৌণ উদ্দেশ্য শরীর পোষণ; কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও যেমন তাহা পূরণের পন্থা বিভিন্ন, তদ্রূপ ধর্ম ও তাহার সাধনার উদ্দেশ্য এক হইলেও সাধনপ্রণালী বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায়, যাবতীয় মানবকর্তৃক বিবিধ ধর্মসম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। মূলে ধর্মের উদ্দেশ্য একই রূপ।

মনুষ্য ব্যতীত পশুপক্ষী হইতে জড়পিণ্ডাদির ক্রমোন্নতি-ধর্ম প্রকৃতির হস্তে ন্যস্ত, কাজেই তাহাদের ধর্ম সকলকে সমভাবে সমান গতিতে উন্নতির পথে চালিত করিতেছে। কিন্তু মানুষ স্বাধীন জীব, ধর্মের পরিচালনায় আত্মোন্নতি তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা। সেইজন্য বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মনীষিগণকর্তৃক ধর্মসাধনার প্রণালী বিভিন্ন হওয়ায় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহার যেরূপ জ্ঞান—যেরূপ প্রতিভা—যেরূপ সাধনা, তিনি আত্মার সেইরূপ উন্নত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সেই অবস্থা প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবনপূর্বক স্ব স্ব সমাজের আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং সমাজ-অনুযায়ী ধর্মসাধনের উপায় নির্ধারিত হওয়ায় নানা ধর্মসম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। তাই আজ জগতের সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত মনীষী, সমুদয় ধর্মযাজক আপন আপন মত, আপন আপন ধর্মকাহিনীর শান্ত-মধুর প্রোজ্জ্বল ব্যাখ্যা করিয়া মানব-হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সংসারে মনুষ্যের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ত তৃষ্ণাময়ী হৃদয়বৃত্তি বুঝি ধর্মব্যাখ্যার পরম পবিত্রভাব লইয়াই নিশিদিন ব্যস্ত ও বিভিন্নভাবে বুঝাইয়া দিতে সচেষ্ট।

আবার যে সম্প্রদায় যত সজীবতা লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তত শাখা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলমানের সিয়া, সুন্নি—খৃষ্টিয়ানের প্রোটেষ্টাণ্ট্ ও রোমান্ ক্যাথলিক্;—আর হিন্দুর তো কথাই নাই, চারিদিকে অগণিত সম্প্রদায় আপন আপন ধর্মভাবে বিভোর রহিয়াছে। বর্তমান কালের একটা দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতেছি।

বঙ্গদেশে যখন রাজনীতিচর্চা ছিল না—থাকিলেও নির্জীব অবস্থায় দুই-চারিজন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির হৃদয়ে নিহিত ছিল—তখন যে যাহা বলিত, সকলে নীরবে শুনিত, কোন মতভেদ ছিল না—বঙ্গব্যবচ্ছেদ হওয়ার পর হইতে সর্বসাধারণের মনে স্বদেশী আন্দোলন ও রাজার নিকট প্রজার ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। যে রাজনৈতিক চর্চা এতদিন নির্জীব অবস্থায় ছিল, তাহা এখন সজীবতা লাভ করিয়াছে। তাই আজ বিপিনবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুতে মতভেদ—রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের দুইজনের দুইটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন নহে, উভয় দলের ইচ্ছা বঙ্গচ্ছেদ রহিত এবং স্বরাজ্য লাভ। মূল উদ্দেশ্য এক—তবে উদ্দেশ্যসাধনার প্রণালীতে মতভেদ হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন দলে পরিণত হইয়াছে। ভারতের সুবর্ণযুগে দেবকল্প মুনিঋষিগণ পর্বতকন্দরে, ভীষণ বনজঙ্গলে আজীবন ধর্ম অনুশীলন করিয়া ধর্মের স্থূল হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কত অতীত কাল হইতে তাহারই আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্য উদ্ভেদ হইতেছে; কত বৈজ্ঞানিক, কত দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক করিয়াছেন—তাহার ফলে কত স্থূল-সূক্ষ্ম, কত দ্বৈতাদ্বৈত, কত সাকার-নিরাকার, কত সগুণ-নির্গুণ, কত প্রকৃতি-পুরুষ, কত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, কত যোগ-জপ-তপ-পূজা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; তাহারই এক-একটি মত লইয়া হিন্দুধর্মে বহু শাখা-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত শাখা-সম্প্রদায় এখন হিন্দুধর্মের সজীবতার প্রমাণ দিতেছে। ইহা

হইতেই হিন্দুধর্ম কিরূপ মার্জিত ও উজ্জীবিত হইয়াছিল. তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই সকল সম্প্রদায়ের সাধনপথের গতি একমুখী; এই গতিপথে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে আসিলে শাক্ত, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সী, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকলেই একত্রে মিলিয়া যায়। ধর্মের এতাদৃশী উচ্চস্থানে আসিলে আপন সম্প্রদায় দূরে থাক্, মুসলমান, খৃষ্টান আদির আচরিত ধর্মকেও অগ্রাহ্য করিবে না, গোঁড়ামি দূরে যাইবে—তখন মুসলমানকে "নমাজ" করিতে বা খৃষ্টানকে গীর্জায় যাইতে দেখিলে মনে অপার আনন্দ ও হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইবে। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস হিন্দুধর্মের বহু সম্প্রদায়োক্ত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া পরে মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্মসাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।* অতএব ধর্মের সাধনপ্রণালী ভিন্ন হইলেও ধর্ম সকলেরই এক। আশা করি, ইহার পর ধর্মের সার্বভৌমিকতায় কাহারও অবিশ্বাস হইবে না। এই সার্বভৌম ধর্ম ও তাহার সাধনার রহস্যই আমি এই গ্রন্থে লিখিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুধর্ম

লোকসমাজে যতপ্রকার ধর্মপ্রণালী অধুনাতন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্মের ন্যায় অন্য কোন ধর্মের এমন পরিণতি বা পরিপুষ্টি ঘটে নাই। যে কোন ধর্মীকে জিজ্ঞাসা করিবে, "কোন্ ধর্ম ভাল?" সে তখনই বলিবে "আমার ধর্ম ভাল।" গোঁড়ামি করিতে নাই, ধর্মের নামে গোঁড়ামিতে মহাপাতক হয়। ধর্মের নিন্দা নরকের কারণ। তাই বলি, সকলের বিচার-শক্তি, জ্ঞান-শক্তি ও অনুভব-শক্তি সমস্তই আছে। অনুভব করুন,

* সেবক রামচন্দ্রকৃত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনচরিত দেখ।

বিচার করুন, সাধন করুন, পথ পরিষ্কৃত হইবে। যে ধর্ম আচরণ করিলে মানুষ নিজ অভিজ্ঞতায় সমস্ত প্রত্যক্ষানুভব বা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এইজন্য আমি হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিতেছি।

হিন্দুগণ ধর্মকে চতুষ্পাদ বৃষ বলিয়া সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। যথা—

বৃষোঽসি ভগবান্ ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্তিতঃ।
বৃণোমি ত্বামহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্বদা॥

—বৃষোৎসর্গপদ্ধতি

আরও দেখুন, মনু বলিয়াছেন—

"বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলং।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং ন লোপয়েৎ॥"

—মনুসংহিতা

ধর্মকে চতুষ্পাদ বৃষ বলিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য ধর্মের চতুষ্পাদ সাধককে বুঝান। চতুষ্পাদ অর্থে চারিভাগে পূর্ণ। এক এক পাদ ধর্মাচরণে এক এক জগতের জ্ঞান হয় ও তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়শক্তির স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য লাভ হইয়া থাকে। জগৎ চারিটি। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা যে জগৎকে জানিতে পারা যায়, তাহাকেই বহির্জগৎ বলে। ধর্মের প্রথম পাদের আচরণ ও সাধনাদ্বারা বহির্জগৎ বশীভূত হয় ও তাহার উপর ক্ষমতা বিস্তার করা যায়। মন অন্তরিন্দ্রিয়—মনের বিষয় যে জগৎ তাহাই অন্তর্জগৎ। অন্তর্জগৎ বৃত্তিময়, বৃত্তি মানস-বিকার। ধর্মের দ্বিতীয় পাদের সাধনাদ্বারা এই জগৎ আয়ত্তীভূত হয়। সত্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বৌদ্ধ জগৎ বলে। বুদ্ধিই সত্যেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ধর্মের তৃতীয় পাদ সাধনাদ্বারা এক অদ্বিতীয় এবং সত্যস্বরূপ ভগবান্ আমাদের বুদ্ধির গম্য হন। ইহাতে তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আরোপিত হওয়ায় তাঁহার স্বরূপ দর্শন হয়। আর বিবেকগ্রাহ্য জগৎকে অধ্যাত্মজগৎ

বলে। বিবেকই ধর্মজ্ঞানের সাধন। বিবেক যখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত সকলকে তুচ্ছ করিবে, তখনই ভগবানে গাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইবে। ধর্মের চতুর্থপাদ সাধনায় এই ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। যে সম্প্রদায়ের ধর্মপদ্ধতি সাধন দ্বারা ইহা হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। হিন্দুধর্মের বিধান-পদ্ধতিতে ঐ চারিপ্রকার ইন্দ্রিয়-শক্তির স্ফূর্তি, সামঞ্জস্য ও পরিণতি হইলেই ঐ চারি জগতের তত্ত্বনির্ণয়ে সামর্থ্য ও সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, তাই হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছি।

বর্তমানে মর্ত্যধামে যতপ্রকার প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হিন্দুধর্মের মত প্রাচীন ধর্মপ্রণালী আর নাই। শুধু প্রাচীন নহে, এই ধর্মের আদি কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হিন্দুধর্ম যে বেদমূলক, সেই বেদের আদি কোথায়, তাহা নির্ণীত হয় নাই, তাহা শ্রুতিপরম্পরায় অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ কারণ বেদের অন্যতর নাম শ্রুতি। হিন্দুশাস্ত্রমতে এই শ্রুতিপরম্পরাগত বেদ প্রতি সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হয় এবং প্রলয়ে বিলীন হয়। সুতরাং প্রতি কল্পান্তে যখন বেদের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তখন এই বিশ্বসংসার যেমন অনাদি নিত্যরূপে চিরকালই সৃষ্ট হইতেছে, বেদও তদ্রূপ। বেদ যদি সনাতন ও নিত্য হয়, সেই বেদমূলক ধর্মও তদ্রূপ সনাতন ও নিত্য। সেজন্য হিন্দুধর্মের অন্যতর নাম সনাতনধর্ম। এই সনাতনধর্মের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিলে বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টীয়, শিখ, পার্সী, মহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্মপ্রণালীকে আধুনিক বলিতে হয়। যাহা আধুনিক তাহা উৎপন্নধর্ম। এই সমস্ত উৎপন্ন ও আধুনিক ধর্মপ্রণালীর সহিত হিন্দুধর্ম এইরূপে বিভিন্ন হইয়াছে।

শুধু প্রাচীনত্ব ধরিয়া হিন্দুধর্ম প্রভিন্ন নহে, সেই সমস্ত উৎপন্নধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে। গঙ্গা যেমন স্বর্গ হইতে নামিয়া শতমুখে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম তেমনি নিবৃত্তিপ্রমুখ

স্বর্গদেশ হইতে নামিয়া প্রবৃত্তিপ্রমুখ শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া জনসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে-সব সাম্প্রদায়িক সাধনা-পথের গতি একমুখী। এই গতিপথের এক বা অন্য স্তরে সর্ব সম্প্রদায় ও ধর্মপ্রণালী আছে; হিন্দুর সকাম ও নিষ্কাম পথ আছে, দেবদেবীর স্থূল সাকার উপাসনা এবং সূক্ষ্ম সাকার উপাসনাও আছে—শাক্ত আছে, বৈষ্ণব আছে, খ্রীষ্টান-মুসলমান আছে, জৈন আছে, শিখ আছে, বৌদ্ধ আছে, ব্রাহ্ম আছে, সম্প্রদায়ভেদে সবাই আছে। এমন সার্বভৌমিক ধর্ম আর নাই। এ ধর্ম সর্বপ্রকার অধিকারীর জন্য প্রচারিত হইয়াছে। তাই সর্ববিধ অধিকারী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এই ধর্মমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ঘোর বিষয়ী হইতে ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞানী পর্যন্ত এই ধর্মের আশ্রিত। হিন্দুধর্মের সাধনপ্রণালী এইজন্য সম্পূর্ণাবয়বী। হিন্দুধর্মাবলম্বী জনগণমধ্যে যিনি যেরূপ পূজাপদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন, সে সকল পূজাই এক অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা। কি স্থূল সাকার, কি সূক্ষ্ম সাকার, কি নিস্ত্রৈগুণ্য সাধকের নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, সর্ব উপাসনাই একমুখী হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
>
> —গীতা, ৪।১১

এমন উদার ও উচ্চ শিক্ষা কি কোন ধর্মে আছে? হিন্দুধর্মের উদার গর্ভে সর্বাধিকারী জনগণকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্ববিধ ভক্তকেই আশ্রয় দান করিবার জন্য হিন্দুধর্মের এই উদার শিক্ষা। তাহাতে স্থূল দেবদেবীর উপাসক, স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ-সুখকামী, নিষ্কাম ধর্মজ্ঞানী, সূক্ষ্ম ঈশ্বরোপাসক সবাই আছেন। কারণ, সবাই ধর্মের তপস্যাপথের পথিক, সবাই একদিকে যাইতেছেন, সবাই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইতেছেন। হিন্দুর ধর্মপথ এতই প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ। হিন্দুধর্মের এই প্রশস্ত পন্থায় সর্ববিধ হিন্দু-সম্প্রদায়, ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান, মুসলমান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম সকলেই থাকিয়া অনন্ত ব্রহ্মপদমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এই ধর্মপ্রণালীতে

অদ্বৈতজ্ঞানের সহিত ঐশী ভক্তি মিলিত হইয়া হিন্দুধর্মকে পূর্ণাবয়ব ও সর্ববিধ জনগণের আশ্রয়ভূমি করিয়াছে। ইহা বিশ্বব্যাপী ধর্মপ্রণালী। হিন্দুধর্ম সাধকের অধিকারানুসারে বিভক্ত হওয়াতে তাহার কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া গিয়াছে। সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের ধর্ম হইতে সামান্য জনগণের ধর্মাচারপদ্ধতি পর্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্মের দেহ। সুতরাং যাহারা হিন্দুসমাজস্থ সামান্য জনগণের ধর্মপ্রণালী দেখিয়া বিবেচনা করে, "এই বুঝি হিন্দুধর্ম", তাহারা একদেশদর্শী। সেই সামান্যজনগণ-আচরিত ধর্মপ্রণালী হইতে এই ধর্ম যে ক্রমে ক্রমে কত উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বিচার করিলে এ ধর্মের সর্বনিম্নস্তর অতি সামান্যাংশ বলিয়াই বোধ হইবে। যদিও সেই স্তরের লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা সমধিক, তথাপি তাহা মূলদেশ মাত্র। যেমন পর্বতের মূলদেশ সুবিশাল ও প্রকাণ্ড, তদ্রূপ। উচ্চ উচ্চ দেশের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে। কমিয়া যাইলেও তাঁহারা সবাই হিন্দুধর্মভুক্ত। বরং উচ্চদেশের ধর্মাবলম্বিগণ ধর্মের পবিত্রতা ও প্রকৃত মূর্তি আরও বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন। পর্বতের উচ্চ উচ্চ দেশে উঠিলে যেমন নব নব দেশ দৃষ্টিগোচর হয়, এ ধর্মেও তেমনি উচ্চ উচ্চ দেশে নব নব অধ্যাত্ম তত্ত্বাবলীর সুন্দর দেশ প্রত্যক্ষীভূত হয়, শেষে চূড়াদেশের অনন্ত আকাশে কেবল—**একমেবাদ্বিতীয়ম্**।

হিন্দুধর্মের এই সকল মহান্ তত্ত্ব না বুঝিয়া বর্তমান যুগের অন্য ধর্মাবলম্বিগণ সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক পথহারা ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ বহুদিন হইতে অধীনতাশৃঙ্খল পরিয়া জড় হইয়াছে, কাজেই হিন্দুকে "জড়োপাসক" প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে—নতুবা যে জড়বাদিগণের অনুষ্ঠিত ধর্মের অস্থিমজ্জা পৌত্তলিকতা—কাম-কামনায় কলুষিত,

তাহারাই হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলে। যাহাদের ধর্ম এখনও খঞ্জ বালকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। যদি বুঝিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিবে, হিন্দু যাহা করে, তাহার একবিন্দু কুসংস্কার বা মিথ্যা নহে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার ত্রিসীমায় পঁহুছিতে অন্য ধর্মাবলম্বিগণের বহু বিলম্ব আছে। হিন্দুধর্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে জড় বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য দেশের অথবা অস্মদ্দেশের শিক্ষিত ও সজ্জন আখ্যাধারী হিন্দুধর্মনিন্দুকগণ জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝে না বলিয়া হিন্দুকে জড়োপাসক বলিয়া থাকে। জড়বিজ্ঞানে এ তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারে যে, যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পরে আরও কিছু থাকিল—আলোচনার শেষ হইল, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের শেষ হইল না। যাহা খুঁজিলাম, তাহা পাই নাই, কিন্তু খোজা শেষ হইয়া গিয়াছে—শেষ মিলিল না। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সার আক্ষেপ করিয়া আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

The ultimate mystery continues as great as ever. The problem of existence is not solved ; it is simply removed further back. The Nebular hypothesis throws no light on the origin of diffused matter and diffused matter as much needs accounting for as the concrete matter. The genesis of atom is not easier to conceive than the genesis of a planet. Nay, indeed so far from making the universe a less mystery than before, it makes it a great mystery.

এই তো জড়বাদীদের অনুসন্ধানের চরম ফল ; ইহার কারণ এই যে, যে বস্তু খুঁজিতে হইবে, তাহার মত দর্শনশক্তি আবশ্যক হইবে। ব্রহ্ম-

বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের সত্তা সম্ভাবিত হওয়া চাই। যোগীর সমাধি ভিন্ন তাহা সম্ভবে না। সে যোগ হিন্দুরা আবিষ্কার করিয়াছেন—সে তত্ত্ব হিন্দুধর্মপ্রণালীতে বিধিবদ্ধ আছে। আমি সেই তত্ত্বই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রের পর্যালোচনায় প্রতীত হয় যে আমাদের শাস্ত্রীয় মতামত নানা বাদানুবাদ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। যখন যে মত উঠিয়াছে, তখনই পণ্ডিতগণ বলিয়া উঠিয়াছেন—'সে কথার প্রমাণ?' সুতরাং হিন্দুদার্শনিকেরা প্রমাণ ভিন্ন এবং পূর্বপক্ষ খণ্ডন না করিয়া কোন্ কথার মীমাংসা করেন নাই। ধর্মের এমন তন্ন তন্ন বিচার আর কোন জনসমাজের ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় না। হিন্দু জানে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥—যোগবাশিষ্ঠ

—কেবল শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করিয়া ধর্মনিরূপণ করা কর্তব্য নহে, কারণ যুক্তিহীন বিচারদ্বারা ধর্মহানি হইয়া থাকে।

তাই হিন্দুশাস্ত্রে কি লৌকিক, কি অলৌকিক, সর্ববিধ তত্ত্বেরই বিশেষ প্রকার উপযুক্ত প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুধর্মকে নিন্দা করিবার পূর্বে একবার তত্ত্বগুলি বিচার করিতে ও নিজের ধর্মপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজস্থ সামান্য জনগণের ধর্মপ্রণালী দেখিয়া এবং তাহার প্রকৃত তথ্য ও মহান্ ভাব না বুঝিয়া যে সকল নিন্দাবাদ করিয়া রসনা কলুষিত করেন, সেই সামান্য জনগণের ধর্ম হইতে নিস্ত্রৈগুণ্যসাধকের নিরাকার ব্রহ্ম-উপাসনা পর্যন্ত আমি এই গ্রন্থে আলোচনা করিব। আশা করি পাঠকগণ তাহাতেই হিন্দুধর্মের বিশ্বব্যাপকতা ও গভীরতার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ অধিকারভেদাদি সমাজধর্ম আলোচনা করা যাউক।

অধিকারভেদ

কোন আধুনিক বা উৎপন্ন ধর্মে অধিকারভেদ স্বীকৃত হয় নাই, কারণ সে সমস্ত ধর্ম মানবাত্মার নিমিত্ত এক নির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য দিয়াছে, সেই লক্ষ্যের প্রতি সমগ্র মনুষ্যসমাজকে নিয়োজিত করিতে চাহে। হিন্দুধর্ম যখন মানবাত্মাকে তাহার অনন্তস্বরূপে আনিতে চাহে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, তাহার গতি অনন্তের পথে। এই অনন্তপথ নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। এই অনন্তগতিপথে লোক-সমাজের সকলেই আছে, কিন্তু সকলেই সমান অধিকারী নহে। পূর্ণ যুবক যে উপায়ে আহার্য গ্রহণ করিতে পারে, শিশু তাহা পারে না। যুবক কঠিনতর পদার্থ চর্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে, শিশুকে তরল দুগ্ধ তুলার দ্বারা ধীরে ধীরে খাওয়াইতে হয়। আবার একজন জ্ঞানীর সহিত অজ্ঞানীর আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তেমনি একজন বুদ্ধিমানের সহিত একজন নির্বোধেরও বিস্তর প্রভেদ। যে ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে যাহাতে ধর্ম বলিয়া একটা কিছু আছে এমন সংস্কার লাভ করিতে পারে, সেই কার্য করা কর্তব্য। তাই হিন্দু-বালিকা কোমল হৃদয়ে ধর্মবীজ রোপনের জন্য—ধর্ম আছে, কেবল তাহাই বুঝিবার জন্য যমপুকুর, পুন্নিপুকুর, গোলক, ধনগছান প্রভৃতি ব্রত করে। যুবতী কর্মফলে জীবনে ধর্মবৃদ্ধি করিবার জন্য দুর্বাষ্টমী, অন্নদান, অনন্তচতুর্দশী প্রভৃতি ব্রতে নিযুক্ত হয়। সাধারণ দোল-দুর্গোৎসব, পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ করে—দেবশক্তি লাভ করিয়া জড়ত্বের হস্ত হইতে কিঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়া ধর্মশক্তির বর্ধন উদ্দেশ্যে। যোগী কর্মের সংস্কারবীজ দগ্ধ করিয়া যোগের আগুনে জড়ত্ব গলাইয়া পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে জগতে যতপ্রকার ধর্মসাধনার পথই দেখিবে, সমস্তই অধিকারভেদে—

অবস্থাভেদে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার জন্য। কোন ধর্মপথই নিরর্থক নহে, সকলেই পূর্ণ ধর্মলাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে। তবে কথা এই যে, ধর্মপদ্ধতি অনুসারে—ধর্মের সাধনানুসারে কেহ অনেক দূর অগ্রগামী হয়, কেহ বা অল্প দূরে থাকে।

ধর্ম সকলকেই উঠাইয়া অনন্তপথের এক এক স্থানে আনিতে চাহে। হিন্দুধর্ম এই বিভিন্ন অধিকারী ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ধর্মসাধনার প্রকরণ বিভিন্ন করিয়া দিয়া আপনাকে সর্বলোকোপযোগী করিয়া দিয়াছে। এই অধিকারানুসারে হিন্দুধর্মে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি নানা সাম্প্রদায়িক সাধনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত সাধনা-প্রণালীর ধর্মাচার ও প্রকরণ বিভিন্ন হইলেও সকল ধর্মপ্রণালী হিন্দুধর্মীয় মুক্তিসাধকের গতিপথে অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় ধর্মাদি যেমন নিজ নিজ সম্প্রদায়স্থ জনগণকে স্বর্গাদি প্রভৃতি এক এক লক্ষ্যস্থানে আনিতে চাহে, হিন্দুধর্মের শাক্ত-বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক সাধনাপ্রণালীতেও তদ্রূপ সকলকে হিন্দুধর্মীয় মুক্তিপথের এক এক দেশে উপনীত করিতে চাহে। কিন্তু তাহাও চরমগতি নহে।

মনুষ্যসমাজে নানা প্রকৃতির মানুষ, সকলের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা সমান নহে। সকলের মানসিক উন্নতির ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সমান নহে। এই সকল বিবেচনা করিয়া হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন—

সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধা ভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৩ উঃ

এই সংসারে, সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণীর মানব আছে। ইহার মধ্যে যাহারা নিষ্কাম, তাহারা মোক্ষপথের অধিকারী; আর যাহারা সকাম, তাহারা কর্মানুযায়ী স্বর্গলোকাদি গমনপূর্বক নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া, কৃতকর্মের ক্ষয়ে পুনরায় ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া

থাকে। ইহা হইতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গ, এই দুইটি পথ বাহির হইল। ইহার আবার এক-একটির সাধনাপ্রণালী অনন্ত।

অধিকারভেদে সাধনা চারি প্রকার। যথা—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো, ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো, বহিঃপূজাধমাধমা ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ

ব্রহ্মসদ্ভাব উত্তম, এজন্য উচ্চাধিকারিগণ ব্রহ্মবিচার ও ব্রহ্মোপাসনা করিবে। মধ্যম অধিকারিগণ স্থূল, সূক্ষ্ম ভূতাদি বা জ্যোতির্ধ্যান করিবে অধম অধিকারিগণ স্তব, জপ, পূজাদি করিবে। আর অধমের অধম অধিকারিগণ অর্থাৎ যাহারা ধর্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহারাই বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিবে।

আবার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ধর্ম অনুসারে সাধকের ক্ষমতা বিচার করতঃ ব্রহ্মোপাসনা, ধ্যান, তপ, জপ ও বাহ্যপূজাদির নানারূপ পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। তবে ধর্মের যত উচ্চদেশে উঠিবে, লোকসংখ্যার অল্পতার সহিত সাধনাপদ্ধতিরও হ্রস্বতা দৃষ্ট হইবে। এখন পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্মপ্রণালী মহানির্বাণতন্ত্রের ঐ শ্লোকদুইটির মধ্যে দেখিতে পাইবেন। যে যেরূপ ধর্মপ্রণালী অবলম্বন করুক না কেন, সকলেই ঐ চারি শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

সকল ব্যক্তি দর্শনবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যাহার সেরূপ শিক্ষা আছে, সে অবশ্য বুঝিতে পারিবে। অর্ধশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনগণকে অগ্রে দর্শন-বিজ্ঞান বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া পরে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে হয়। আর অশিক্ষিত ব্যক্তি বর্ণপরিচয় করিয়া কর খল হইতে সুবোধ নীতি-পাঠ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্যাদি ক্রমে পাঠ করতঃ তবে দর্শন-বিজ্ঞান পাঠে সক্ষম

হইতে পারে। হিন্দুধর্ম-শিক্ষকগণ, যাহার যেরূপ জ্ঞান আছে বুঝিয়া তাহাকে সেই স্থান হইতে আরম্ভ করাইয়া ক্রমে উচ্চস্তরে আনয়ন করেন। আর যাহার আদৌ ধর্মজ্ঞান নাই, তাহাকে বাহ্যপূজা হইতে আরম্ভ করাইয়া ক্রমে ব্রহ্মসম্ভাবে আনয়ন করেন। তাই হিন্দুধর্মের স্তর ও অধিকারভেদে অসংখ্য ধর্মপ্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ জনগণকে প্রথম হইতে কিরূপ ধর্মসাধনায় নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে উঠাইতে হয় এবং এক এক স্তরের সাধনায় কি শিক্ষা হয়, তাহা **চৈতন্যচরিতামৃত** গ্রন্থ হইতে দেখাইতেছি।

ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও মহাত্মা রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে এই তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভু কহে কহ কিছু সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়॥

যাহার জন্য সাধনা, তাহাই সাধ্য; চৈতন্যদেব সাধ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ সাধকের কিরূপ সাধ্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে বলিলেন না; তখন রামানন্দ রায় কাজেই ভক্তিহীন সংসার-জাল-জড়িত মানবের প্রথম হইতেই সাধ্য নির্ণয় করিলেন। কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইল—"**স্বধর্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়।**"

আপন আপন বর্ণাশ্রমোচিত কুল-ধর্মই স্বধর্ম। ভগবদ্ভক্তিহীন পাষাণ প্রাণে ধর্মবীজ রোপণের উপায়স্বরূপ স্বধর্মাচরণ নির্দেশ করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তিই কি জীবনের লক্ষ্য, না আরও কিছু আছে?

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার॥

আছে বলিয়াই চৈতন্যদেব বলিলেন, "ইহা বাহিরের কথা (বাহ্যধর্ম,) আরও অগ্রসর হইয়া বল অর্থাৎ স্বধর্মাপেক্ষা আরও উচ্চ অধিকারীর কথা

বল।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "সমস্ত কর্ম ভগবচ্চরণে অর্পণ করাই সাধ্যের সার।" আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম করিতে উপদেশ দিলেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ সর্বসাধ্যসার॥

নিষ্কাম কর্মের কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন "ইহাও বাহিরের ধর্ম, আরও অগ্রসর হইয়া বল।" যখন নিষ্কাম ধর্মসাধন করিয়া সাধকের আত্মনির্ভরতা জন্মিবে, তখন স্বতন্ত্রতায়ই তাঁহার উন্নতি; তখন তাঁহাকে আর বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর রাখা উচিত নহে। তাই রায় রামানন্দ বলিলেন, স্বধর্মত্যাগই সাধ্যের সার।" চৈতন্যদেব ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শুনিয়া,—

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার॥

রামানন্দের এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব বুঝিলেন, ইহা উত্তম সাধ্য। তাই বলিলেন,—

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার॥

চৈতন্যদেব এতক্ষণ "এহো বাহ্য" বলিতেছিলেন, কিন্তু এইবার বলিলেন "এহো হয়", তবে ইহা শেষ নহে; আরও অগ্রসর হইয়া বল। চৈতন্যদেব-কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া রায় রামানন্দ ঐশীভক্তির কত উচ্চ উচ্চ স্তরের মাধুরীলীলা প্রকাশ করিলেন। কেহ যেন

এইগুলিকে "বৈষ্ণবী-হেঁয়ালি" মনে করিয়া নিজের স্বচ্ছ সরল নাসিকাটি কুঞ্চিত করিবেন না। উহার প্রত্যেক কথা দর্শন-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর সংস্থাপিত। আগে হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি, দর্শন, উপনিষদ পাঠ করুন, তৎপর ঐ ডোর-কৌপীনধারী নেড়া-নেড়ীর হেঁয়ালী পাঠ করিতে প্রয়াস করিবেন। এই ভাবের ভাবুক ভিন্ন অন্যের সে সত্ত্ব বোধগম্য হইবে না।

রায় রামানন্দকথিত স্বধর্ম, নিষ্কামধর্ম, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রভৃতি এক-একটি ধর্মপ্রণালী সাধনার জন্য অধিকারিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তদনুরূপ সাধনার অনুষ্ঠান করিবেন। অশিক্ষিত ব্যক্তি দর্শন-বিজ্ঞান পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যেমন কিছুতেই তাহার পাঠে মনঃসংযোগ হয় না, বরং বিরক্ত হইয়া সে ঐ তত্ত্বের চর্চা ত্যাগ করে, তদ্রূপ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও অতি সূক্ষ্ম এই ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুতেই ধারণা করিতে সক্ষম হয় না, অধিকন্তু বিরক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণেই হিন্দুধর্ম বলিতেছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।২৬

কর্মিগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত অজ্ঞান, তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। এই সকল বিবেচনায় অধিকারভেদে ধর্মপ্রণালী উপদেশ দিবার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্মে লোকের জ্ঞান ও রুচি অনুসারে সাধনাপ্রণালীর সংগঠন হইয়াছে। তাহাতে বিবিধ সাম্প্রদায়িক উপাসনা-প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদিক হিন্দুধর্ম দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী অধিকারভেদ স্বীকার করিয়াছেন। সমাজের একাংশের জন্য ধর্ম নহে। তাই হিন্দুধর্ম উচ্চ, নীচ ও মধ্যম অধিকারিভেদে নানাবিধ সাধনা-প্রণালীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য একই, কেবল প্রকরণ ভিন্ন মাত্র। এজন্যই সেই ধর্মে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদে আদৌ দ্বিবিধ সাধনপথ

দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাধিকারীর জন্য নিবৃত্তিপথ ও নিষ্কামধর্ম, নিম্নাধিকারীর জন্য প্রবৃত্তিপথের বিস্তারিত মহাকাম্যক্ষেত্র।

অসংখ্য মানুষের কাম-কামনা অসংখ্যপ্রকার, তাই হিন্দুর প্রবৃত্তি-পথের সাধনাপ্রণালীও অসংখ্যপ্রকার। এই অধিকারভেদে সর্বপ্রকার জনগণের জন্য ধর্মপ্রণালী প্রকাশিত হওয়ায় হিন্দুধর্মের মূলদেশ অতি প্রকাণ্ড হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়, মহম্মদীয় প্রভৃতি কাম্যধর্ম ও তাহাদের সাধনা-প্রণালী হিন্দুধর্মের এই বিশালস্তরের একদেশে পড়িয়া রহিয়াছে।

হিন্দুধর্মপ্রণালীতে প্রথমে পশুত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মনুষ্যত্বে যাওয়া, তৎপরে মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করা এবং সর্ব-শেষে দেবত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপথ। আমাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রণালী কেবল দেবত্ব পর্যন্ত উঠিয়াছে। বিচার করিলে বিজাতীয় অন্যান্য ধর্মপ্রণালীর সীমাও এই পর্যন্ত। অতএব হিন্দুধর্মের এই বিশাল স্তরে অবস্থিতি করিয়া ধর্মের সুশীতল ছায়ায় সকলেই তৃপ্ত হইতেছে।

জাতিভেদ

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় হিন্দুধর্মে জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত দেখিয়া হিন্দুগণকে অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করেন। আর অস্মদ্দেশীয় এক শ্রেণীর লোক আহার-বিহারে সুশৃঙ্খলার জন্য জাতিভেদপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনে প্রয়াসী। জাতিভেদপ্রথার ভিতরে হিন্দুধর্মের কি মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ তাহা জানে না। তাহারা মনে করে, মিথ্যা জাতিভেদপ্রথার প্রবর্তন দ্বারা হিন্দুগণ বিবিধ সামাজিক অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম কি বলে শুনুন—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।

প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না, সমস্ত ব্রহ্মময় ছিল। কিন্তু পরে—

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

কর্মদ্বারা বর্ণবিভাগ হইয়াছে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

আমি গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।* তাহা হইলে জাতির দ্বারা গুণ ও কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তে উক্ত আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরোস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

—বিরাটপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পদ হইতে শূদ্র জন্মিলেন।

ইহার ভাবার্থ এই,—অধ্যয়ন-অধ্যাপনরূপ কার্যপ্রধান ব্রাহ্মণ, বিরাট-পুরুষ অর্থাৎ জীবময় জগতের মুখস্বরূপ। বাহুবলপ্রধান ক্ষত্রিয়, সমাজের বাহুস্বরূপ। উরুবলপ্রধান বৈশ্য, সমাজের উরুস্বরূপ। আর ভৃত্যভাবাপন্ন শূদ্র, সমাজের পদসেবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। অপিচ জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া মৌখিক কার্য, সুতরাং ব্রাহ্মণ মুখস্বরূপ। যুদ্ধাদি কার্য বাহুবলসাধ্য, তাই ক্ষত্রিয় বাহুস্বরূপ। বাণিজ্য করা উরুবলসাপেক্ষ, সেইজন্য বৈশ্য উরুস্বরূপ। চাকরি প্রভৃতি পরপদলেহনজন্যই শূদ্র পদস্বরূপ। অতএব হিন্দুসমাজ গুণ ও কর্মভেদে জাতিভেদ স্বীকার করিয়াছে।

* ভগবান কর্তৃক যখন জাতিভেদ হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, অন্যান্য দেশেও জাতিভেদ আছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই চারি শ্রেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়, সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বরং আমাদেরই জাতি ও গুণকর্ম ঠিক নাই।

গুণ ও কর্মক্ষয়ের জন্য যে সাধনা, তাহাই স্বধর্ম। স্বধর্মাচরণে গুণ ও কর্ম ক্ষয় করিয়া জীবকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয়। তাই হিন্দুধর্মের গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে ধর্মভেদ বা অধিকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই অধিকারভেদই জাতিভেদের মূল ভিত্তি। অন্য ধর্মসম্প্রদায়ে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর জন্য একই ধর্মপ্রণালী নির্দিষ্ট থাকায় তাহারা এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায়ে গুণ ও কর্মানুযায়ী ধর্মবিভাগ হওয়ায় জাতিবিভাগ হইয়াছে। হিন্দুধর্মের সাধারণ জনগণ ধর্ম-অধিকারানুসারে নানা খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় হিন্দুসমাজ নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পরের এই গুণ ও কর্ম পরস্পর বিভিন্ন রাখিবার জন্য বিশেষরূপে জাতিভেদ প্রবর্তিত হইয়াছে।

জাতিভেদপ্রথা না থাকিলে, সকলের গুণ ও কর্ম এক হইয়া যাইত। যে যে-কর্ম করে, সে তাহারই আলোচনা করিয়া থাকে। অতএব এক জাতির সহিত আর এক জাতির আহার-বিহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে পরস্পর গুণ ও কর্মের আলোচনা হইত। ইহার ফলে উচ্চ জাতি ইতর গুণ ও কর্মের পক্ষপাতী হইত এবং নীচ জাতির বুদ্ধি-বিভেদ ঘটিত। তাই হিন্দু সমাজের মনীষিগণ গুণ ও কর্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তন ও নানাবিধ বিধি-নিষেধ দ্বারা তাহা রক্ষা করার উপায় করিয়া দিয়াছেন। পাঠক! অধিকারভেদের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিয়া থাকিলে জাতিভেদের কারণ বোধগম্য হইবে। জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে অধিকারানুসারে ধর্মসাধনপ্রণালীর বিভিন্নতা স্থায়ী হইত না।

বড়ই দুঃখের বিষয়,—একশ্রেণীর দুর্বলচিত্ত লোক বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণজাতির স্বার্থরক্ষার জন্যই জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তিত হয়। যদি স্বার্থ-পরতাই জাতিভেদের মূল হয়, তবে শূদ্রাদির যাজন ও দানগ্রহণে ব্রাহ্মণের পাতিত্যবিধান শাস্ত্রসিদ্ধ হইল কেন? শাস্ত্রে পরস্বগ্রাহীর ভূরি ভূরি নিন্দা আছে। যে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে জগতের সম্রাট্ হইতে পারিতেন,

তিনি পর্ণকুটীরে থাকিয়া ফলমূল ভক্ষণে কালযাপন করিলেন কেন? ইহা কি লোভ-পরিহারের জ্বলন্ত প্রমাণ নহে? অলৌকিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহারা শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় ভোগ্যবস্তু লইয়া বিবাদ করেন নাই, ইহা কি তাঁহাদের দেবত্বের পরিচয় নহে? কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতে সকলই চক্রনেমির ন্যায় পরিবর্তিত হয়। তাই এক্ষণে ব্রাহ্মণ লোভের ক্রীতদাস। যে ব্রাহ্মণ পৃথিবীর দেবতা (ভূদেব) ছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণের ঘৃণিত পরপদলেহন-বৃত্তিই একমাত্র কর্তব্য হইয়াছে। মিথ্যা, বঞ্চনা ও চৌর্যাদিরও অভাব দৃষ্ট হয় না। এক-একজনের প্রতি লক্ষ্য করিলে ব্রাহ্মণত্ব দূরের কথা মনুষ্যত্বেই সন্দিহান হইতে হয়। গুরু-পুরোহিতগণের অবস্থাও শোচনীয়। যে যত অধিক নিরক্ষর ও বঞ্চক, সে নিজেকে সে পরিমাণ উপযুক্ত মনে করে। তবে জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকাতেই হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষা হইতেছে। নতুবা হিন্দুর নাম আকাশে বিলীন হইত। হিন্দুসমাজ অধোগতির শেষ সীমায় আসিয়াছে বটে, কিন্তু জাতীয় পার্থক্য ধ্বংস হয় নাই—আপন আপন জাতীয় মহত্ত্ব বজায় আছে। আমার নিকট ধর্মজিজ্ঞাসু হইয়া যাঁহারা পত্র লিখেন বা সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা প্রায়ই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যবংশসম্ভূত, তন্মধ্যে আবার অধিকাংশই ব্রাহ্মণসন্তান। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, সকল শ্রেণীতেই দেবতা ও নরকের কীট আছে। আমাদের দেশ সুশাসিত, কিন্তু সমাজ এখন স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল; জাতিগত কার্যভেদের অতিক্রমই এই সর্বনাশের মূল।

পাঠক! হিন্দুধর্মে জাতিভেদের কারণ ও তদ্দ্বারা হিন্দুধর্মের কি মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, বোধ হয় বুঝিয়াছেন। হিন্দুধর্মমতে স্ব স্ব গুণানুসারে ধর্মকার্য করা কর্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। কেননা, ব্রাহ্মণাদির সুন্দর ধর্ম হইলেও শূদ্রাদির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আচরণ করা কর্তব্য নহে। তাহাতে স্বগুণের ক্ষয় হয় না; গুণক্ষয় না হইলে, তাহার

ক্রিয়া এক সময়ে না এক সময়ে হইবেই হইবে। তাই স্ব স্ব গুণ ও কর্ম স্বতন্ত্র রাখাই জাতিভেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দু তথাপি জানে, মিথ্যাময় জগতে জাতিভেদের কল্পনা মরীচিকা-তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রান্তিময় জগতের সকলই মিথ্যা। নদীপর্বতালঙ্কৃতা পৃথিবী অথবা চন্দ্রসূর্যনক্ষত্রাদিভূষিত আকাশ, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহাই মিথ্যা। এক আত্মময় জগতে মনুষ্য-পশ্বাদির ভেদকল্পনাও মিথ্যা, সুতরাং জাতিভেদ যে কল্পিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শুধু নিম্নাধিকারী স্বধর্মাচারী জনগণের জন্য জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। স্বধর্মাচরণে যাহার গুণ ও কর্ম ক্ষয় হইয়াছে, তাহার বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের গণ্ডী নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাসো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ততে শ্রুতিমূর্ধণি॥

—অজ্ঞানবোধিনী

হিন্দুধর্মে বিধি-নিষেধ

হিন্দুর মধ্যে সামান্য জনগণের ধর্মাচরণপদ্ধতিতে বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-সংযমের সুদৃঢ় বিধান দৃষ্টে অনেকে মনে করেন—উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, পৃথিবীর সমস্ত সুখে বৈরাগ্য ও আত্মপীড়নই বুঝি ধর্ম। কিন্তু হিন্দু জানে, হিন্দুধর্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্ধনই তাহার মূল কারণ। ভগবানে ভক্তি, জীবে প্রীতি এবং হৃদয়ে শান্তি বা ইন্দ্রিয়শক্তির সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য—ইহাই ধর্ম। ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি এই তিনটি শব্দে যে বস্তু চিত্রিত হইল

তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছে ? কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, গোড়ায় কিছু দুঃখকষ্ট না করিলে কোন সুখই লাভ করা যায় না। ভোগবিলাসোন্মত্ত ব্যক্তি যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই সুখ মনে করে, তাহারও উপাদান যত্নে ও কষ্টে আহরণ করিতে হয়। ধর্মালোচনায় যে অসীম অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহা উপভোগের জন্য প্রয়োজন—ধর্ম-মন্দিরের নিম্নসোপানে যে-সকল কঠিন ও কর্কশ তত্ত্বগুলি বন্ধুর প্রস্তরের মত আছে, সেগুলিকে আগে আপনার আয়ত্ত করা। তাই হিন্দুধর্মের নিম্নসোপানের নিয়ম-সংযমগুলি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

আহারাদি শারীরিক ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক, এই দ্বিবিধ নিয়ম-সংযমে হিন্দুধর্ম গঠিত। আগে আহারাদি বিষয় বিচার করা যাউক।

আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ, আবার শরীর সুস্থ না থাকিলে কিছুই হয় না।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।

—আয়ুর্বেদ

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ করিতে হইলে সর্বতো-ভাবে শরীর আরোগ্য রাখা অতীব কর্তব্য। শরীর পীড়াগ্রস্ত বা অকর্মণ্য হইলে কোন কার্যই হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। তাই আর্যশাস্ত্রকারগণ, যাহাতে শরীর সুস্থ ও সবল রাখিয়া ধর্মাচরণ করা যায়, তাহারই উদ্দেশ্যে দেশভেদে, বয়োভেদে, কার্যভেদে আহারের তারতম্য করিয়া দিয়াছেন। এক দেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, অন্য

দেশে হয়ত তাহা ভোজন করিলে তদ্বিপরীত ফল হইয়া থাকে। দেশের প্রাকৃতিক ধর্ম নিরূপণ করিয়া খাদ্যাদির বিষয় স্থির করিতে হইবে। জল-বায়ুভেদে আহারের পার্থক্য হওয়া কর্তব্য। শীতপ্রধান দেশে যে খাদ্য ভোজন করিলে দেহের পুষ্টি, ধর্মবুদ্ধির উন্নতি ও মানসিক বল সঞ্চয় হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা ভোজন করিলে শরীরের ক্ষয়, বুদ্ধির জড়তা ও ধর্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। এইজন্য শীতপ্রধান দেশের মৎস্য, মাংস পেঁয়াজ, রশুন ও সুরা প্রভৃতি খাদ্য উষ্ণপ্রধান দেশে একান্ত অহিতকর। অহিতকর বলিয়াই এই সকল আহার্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেশের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া এই দেশের শাস্ত্রকারগণ শরীরবিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া আহার সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা সর্বদা কর্তব্য। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিকর খাদ্য ভক্ষণ করা আহারের চরমোদ্দেশ্য নহে। তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জয়েৎ।

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়প্রীতিজনক এরূপ বৃথা পাক পরিত্যাগ করিবে।

ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদম্।
ধর্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীয়তে রোগসন্ততিঃ।
সন্মতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥

—যাহা দেহের শক্তিদায়ক, চিত্তের প্রসন্নতাপ্রদায়ক, ধর্মবুদ্ধির উদ্দীপক, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সুপথ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যাহা দ্বারা শরীর বলশালী হয়, রোগসমুদয় দূরীভূত হয়, সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্বুদ্ধি উপচিত হয়, পণ্ডিতগণের মতে তাহাই সুপথ্য।

ইহামুত্র সুখং যস্মাৎ তদেবাদ্যং প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদগরলং যথা॥

—যাহা দ্বারা ইহজীবনে সুখ এবং পরজীবনে শান্তি লাভ হয়, তাহাই

ভোজন করা কর্তব্য। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি এতদতিরিক্ত যাবতীয় আহার্য গরলের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।

কার্যভেদেও আহারের তারতম্য হয়। যাহাদিগকে যুদ্ধাদি করিয়া দেশ রক্ষা করিতে হইবে, সমাজ সংরক্ষণ করিতে হইবে, নরশোণিতে ধরা রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে মৃগয়া বা মাংসভক্ষণ দূষণীয় না হইতে পারে। বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বলবত্তা প্রভৃতি রাজসিক গুণ-বর্ধক দ্রব্য তাহাদিগের আহার্য। রজোগুণবর্ধক দ্রব্য ভোজন ব্যতিরেকে রাজসিক প্রবৃত্তির বর্ধন হয় না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ জ্ঞানানুশীলন-নিরত ব্যক্তির কখনই মাংসাদি আহার হিতকর নহে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্বগুণ বর্ধনের প্রয়োজন, অতএব তাঁহাদিগের সত্বগুণবর্ধক আহার্য ভক্ষণ করা কর্তব্য; তাই হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিভেদে আহারের বিভেদ নির্ধারিত হইয়াছে।

এতদতিরিক্ত একাদশী, অমাবস্যা-পূর্ণিমার নিশিপালন প্রভৃতি অন্যান্য অনেক বিধি-নিয়ম হিন্দুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তিথ্যাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ভক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে। এই সকল সামান্য সামান্য কারণের উদ্দেশ্য অনেকেই আজকাল বুঝিতে পারিতেছেন। আধুনিক শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দুগ্ধসম্বন্ধে বলেন, 'গাভী বা বৎস রুগ্ন হইলে, সদ্যপ্রসূতা গাভীর, কিম্বা ফুঁকা দেওয়া দুগ্ধ শরীরের পক্ষে অহিতকর।' কিন্তু বহুপূর্বে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন—

বর্জয়েৎ সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ।

অতএব হিন্দুধর্মে আহারাদি সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ আছে, তাহার এক বিন্দু মিথ্যা বা কুসংস্কার নহে। উচ্ছিষ্টভক্ষণ, যাহার-তাহার অন্ন গ্রহণ হিন্দুশাস্ত্রে একান্ত নিষিদ্ধ। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলির সম্যক্ তত্ত্ব নির্ধারণ করিতে পাশ্চাত্য জড়তত্ত্ববিদ্‌গণের এখনও বহুদিন গত হইবে।

আশা করি অতঃপর হিন্দুগণ জাতীয় আচার-ব্যবহারানুসারে চলিতে কদাচ ভুলিবেন না।

হিন্দুধর্মে অধিকারভেদ-অনুসারে যেমন সাধনাপ্রণালীর পার্থক্য আছে, তেমনি দেশভেদে, কার্যভেদে আহারাদির পার্থক্যবিধান রহিয়াছে। আবার ধর্মসাধনাপ্রণালীভেদে নিয়ম-সংযমের কঠোরতা আছে।

হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চধর্মে উঠিতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধর্মের প্রধান সাধন ও মূলকথা। ইন্দ্রিয়দমন ও রিপুসংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধর্মের সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং এই চিত্তশুদ্ধির সাধনাই প্রবৃত্তিপথের সংযম ও তপস্যা।

মন বশীভূত না হইলে কোন কার্যই হয় না। সামান্য জনগণের সাধনাপ্রণালীর যত কিছু অনুষ্ঠান, সকলই চিত্তবৃত্তির নিরোধপূর্বক মনোজয় উদ্দেশ্যে। মদমত্তমাতঙ্গসদৃশ প্রমত্ত মনকে জয় করা সুকঠিন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

—গীতা ৬।৩৫

হে মহাবাহো! চঞ্চলত্বাদি প্রতিবন্ধকতাপ্রযুক্ত মনকে বশীভূত করা একরূপ অসাধ্য।

ইন্দ্রিয়গণ অপ্রতিহত প্রভাবে একবার যথেচ্ছাচারী হইলে, তাহাদিগকে পুনরায় স্ববশে আনা সাধ্যাতীত। ইন্দ্রিয়গণ চপলতাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু—

সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।

—মনুসংহিতা

ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই অনায়াসে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
—গীতা ২।৬০

বিবেকী ব্যক্তি যদিও মোক্ষের প্রতি যত্ন আরম্ভ করেন, তথাপি ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়বর্গ বলপূর্বক বিষয়ে আকর্ষণ করে। অতএব—

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
—গীতা ২।৬১

—যত্নপূর্বক ঐ সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমাতে (পরমেশ্বরে) একমনা হইয়া থাকিবে, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত হয় তাহারই জ্ঞান স্থির থাকে।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

দুরন্তেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
যে ত্বসক্তা মহাত্মানস্তে যান্তি পরমাং গতিম্॥
—মহাভারত, মোক্ষধর্মপর্ব, ৪২।১

—মানবগণ ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে মহাত্মারা সেই সুখে আসক্ত না হন, তাঁহারাই পরমাগতি লাভ করিতে পারেন।

এই সকল মহৎ তত্ত্ব অবগত হইয়া হিন্দুগণ নিয়ম-সংযমের কঠোরতা

সর্বশাস্ত্রবিৎ হইলেও ঘোর মূর্খ।* যাহার রিপু-শাসন ও ইন্দ্রিয়-দমন হয় নাই, সে কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে সংযমী, যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সে হিন্দুসমাজে ও হিন্দুমতে সাধু বলিয়া গণ্য ও সকল পথেই অগ্রবর্তী হইতে পারে। সংযমী হইয়া প্রবৃত্তিকে ভক্তিপথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া আনাই হিন্দুধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম একজনকে চিরদিন ব্রহ্মচর্যের কঠোর সংযমে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে না। যতদিন চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত না হয়, তাবৎ মানব বিধি-নিয়মের দাস। কিন্তু মনোজয় হইয়া প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইলে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। যথা—

তাবৎ বিদ্যা ভবেৎ সর্বা যাবৎ জ্ঞানং ন জায়তে।

—যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, সেই পর্যন্তই শাস্ত্রসমূদয়ের আধিপত্য। যেমন একটা বনের পাখী ধরিয়া প্রথমে বিশেষ সাবধানে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে হয়, কিন্তু "পোষ" মানিলে আর সতর্কতার প্রয়োজন হয় না, সে তখন স্বেচ্ছামত উড়িয়া আপন স্থানে আসিবে; তেমনি মনকে প্রথমাবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত নিয়ম-সংযম বা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর পুরিয়া রাখিবে, তৎপরে চিত্ত বশীভূত হইলে আর গণ্ডীর ভিতর রাখার আবশ্যক করে না। তাই শুকদেব বলিয়াছেন—

ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তৌ।
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যপথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥

—শুকাষ্টকম্, ১

* মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

কাম ক্রোধ মদ লোভ কী জব্ তক্ মনমে খান।
তব্ তক্ পাণ্ডিত-মূরখো.তুলসী এক সমান॥

মানবগণের চিত্তক্ষেত্রে যে পর্যন্ত কাম, ক্রোধ, মদ এবং লোভের খনি বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্যন্ত পণ্ডিত মূর্খ উভয়ে সমান।

যে সকল মহাত্মাগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্যপথে বিচরণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই। তিনি অভেদজ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানকে নাশ করিলে পশ্চাৎ অভেদজ্ঞানও স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত হয়। ঐরূপে পাপপুণ্য বিশীর্ণ হইয়া যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সংসার এবং বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্মসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি কেবল শব্দাতীত ও গুণত্রয়শূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। সে অবস্থায় বেদাদি শাস্ত্রের বিধি-নিষেধদ্বারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না।

অতএব যতদিন তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, ততদিন ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য বিধি-নিষেধের অধীন হইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক বিধি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল কার্য্যে অলক্ষ্যে হিন্দুকে সংযম শিক্ষা দিতেছে।*

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

পৃথিবীর মানবসমাজে যেমন বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী আছে, হিন্দুসমাজে তেমনি স্বতন্ত্র ধর্ম্মশিক্ষার প্রণালী আছে। বিদ্যাশিক্ষার্থ যেমন প্রথমে বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন, ধর্ম্মশিক্ষার্থ তেমনি প্রথমে ধর্ম্মজ্ঞানের বর্ণপরিচয় আবশ্যক। সেই বর্ণপরিচয় দেবদেবী-পূজার ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রবৃত্তিপথের নানা ক্রিয়াকলাপদ্বারা প্রথমে আরব্ধ করা হয়। আরম্ভ করাইবার নিমিত্ত হিন্দুসমাজে ধর্ম্মশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র গুরুগণ নির্দ্দিষ্ট আছেন। কারণ গুরু ভিন্ন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে একপদ অগ্রসর হইবার যো নাই। যেমন

* মৎপ্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" পুস্তকে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রথমে পাঠশালায় হাতেখড়ি হয়, তারপর সামান্য গুরুর নিকট পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ ধর্মশিক্ষার্থ প্রথমে কুলগুরুর নিকট ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতি আরম্ভ করিতে হয়। এই পূজা-পদ্ধতি ও ধর্মকর্মানুষ্ঠানের শিক্ষা এই যে কর্মফল সমস্তই ভগবচ্চরণে সমর্পণ কর। বিদ্যাশিক্ষায় বালকেরা অগ্রবর্তী হইয়া আসিলে যেমন উত্তরোত্তর ভাল ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, হিন্দুসমাজে ধর্মশিক্ষাপ্রণালীতেও তদ্রূপ। পাঠশালার গুরুমহাশয় যেমন বিশিষ্টরূপে পণ্ডিত না হইলেও চলে, তেমনি কুলগুরু বিশিষ্টরূপে তত্ত্বজ্ঞানী না হইলেও চলিয়া যায়। তাঁহারা প্রথমে ধর্মানুষ্ঠানের হাতেখড়ি দেন মাত্র। তজ্জন্য যতদূর পাণ্ডিত্যের বা কার্যদক্ষতার প্রয়োজন, ততদূর থাকিলেই যথেষ্ট হইল। তবে কুলগুরুগণ যদি অধিকতর পণ্ডিত বা কার্যকুশল হয়েন তবে ত আরও ভাল। তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষা শেষ হইলে জ্ঞানলাভার্থী শিষ্য অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাই মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন—

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

—তন্ত্রবচন

—মধুলোভে ভ্রমর যেমন এক ফুল হইতে অন্যান্য ফুলে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য নানা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

অতএব সকলেই প্রথমে কুলগুরুর নিকট ধর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া জ্ঞানলাভার্থে উপযুক্ত গুরু করিবে।

এইরূপে কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি সৌর, কি গাণপত্য, কি তান্ত্রিক—হিন্দুধর্মের সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ নিজ নিজ ধর্মসাধনা-পথে গুরুর উপদেশানুসারে অনুষ্ঠানাদি করিয়া ধর্মাচারদ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে থাকেন। পরিশুদ্ধ হইতে না পারিলে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্মের উচ্চাদর্শে উঠা যায় না। উচ্চাদর্শে উঠিলে তবে হিন্দুধর্মের উচ্চ শিখরে

পঁহুছিতে পারা যায়। এই উচ্চদেশে হিন্দুধর্মের পরম-নিবৃত্তিপথের সন্ন্যাসধর্ম। সেই সন্ন্যাসে আসিয়া সর্বসাম্প্রদায়িক জনগণ একত্র হইয়া যায়, সেই সন্ন্যাসধর্মে ব্রহ্মতন্ময়তা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্ম-তন্ময়তায় ব্রহ্মময় বিশ্বের পূজা ও প্রেম; সেই বিশ্বপ্রেমে সমদর্শী হয়। সেই সমদর্শিতায় বিশ্ব ও ব্রহ্ম এক।

হিন্দুধর্মের এই শিখরে আনিবার জন্ম প্রতি সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিভিন্ন ধর্মাচার; নহিলে পথ সব একই, কেবল প্রকরণ বিভিন্নমাত্র। সেই সমস্ত প্রকরণে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার জন্য যদি ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকারে অধিকতর জ্ঞানী গুরুর আবশ্যক হয়, তবে তদ্রূপ গুরুর নিকট ধর্মশিক্ষা করিতে কোন সম্প্রদায়েরই কিছু আপত্তি নাই। যিনি যে কুলে জন্মিয়াছেন, তাঁহার সেই কুলের গুরুর নিকট প্রথমে ধর্মশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, এইমাত্র নিয়ম। এতদ্দ্বারা শিষ্য ও গুরুর উভয় কুল সুরক্ষিত হয়।

প্রথম ধর্মশিক্ষা আরম্ভ করাকে হিন্দুধর্মমতে দীক্ষা বলে। তাই দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং পরমগুরু-ভেদে হিন্দুধর্মের গুরু ত্রিবিধ। গুরু-শব্দে পুরোহিতকেও বুঝায়; মাতা-পিতাও গুরুপদবাচ্য। তাঁহারাও উপদেশে, অনুষ্ঠানে এবং আদর্শে সন্তান-সন্ততিগণকে ধর্মকর্মে সুশিক্ষিত করেন। কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রবুদ্ধ হইলে যাহার ধর্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত পিপাসা জন্মে, তাহার পক্ষে শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন; অনুসন্ধান করিলে এরূপ শিক্ষাগুরুর অভাব হয় না। আজিও কাহারই অভাব হয় নাই। সকলেই সময়ক্রমে নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী গুরুলাভ করিয়াছেন। তবে একই গুরুর নিকট সর্বশাস্ত্রজ্ঞান বা সর্বধর্ম-পদ্ধতি লাভ করা না যাইতে পারে; সেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন গুরু অনুসন্ধান করিয়া লইতে হয়। উপযুক্ত গুরু বিরল ও দুষ্প্রাপ্য বটে, কিন্তু খুঁজিলে যে একেবারে পাওয়া যায় না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমি

ভুক্তভোগী, তাই জানি, এইরূপ গুরু অনেক সময় আপনাআপনি জুটিয়া যায়। যে যে-পথে থাকে, সে সেই পথের আলোচনা করিতে করিতে এমন সময় আসিবে যে, আপনা হইতেই গুরুলাভ হইবে। আর স্বয়ং ঈশ্বরই পরমগুরু, সেই ঈশ্বরের বা ঈশ্বরসম আপ্তগণের উপদেশই হিন্দুশাস্ত্র। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

—গীতা, ১৬।২৩

—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য করে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না, সে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি লাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত ধর্মমতের অসার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় শাস্ত্র অগ্রাহ্যপূর্বক অহম্মুখভাবে হিন্দুশাস্ত্রমতে চলিতে পরাঙ্মুখ, তাঁহাদের ভগবানের এই মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ে ধর্মশিক্ষার জন্য ধর্মযাজক বা ধর্মপ্রচারক থাকিলেও কোন ধর্মেরই হিন্দুধর্মের ন্যায় সর্বসম্পূর্ণতা ঘটে নাই। সুতরাং ধর্মশিক্ষাপ্রণালীতেও হিন্দুধর্ম সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

শাস্ত্রবিচার

উৎপন্ন বা আধুনিক সমস্ত ধর্মের সাধনাপ্রণালী ও নিয়মাদি এক-এক ধর্মগ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। সেই সেই ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, কোরাণ, ত্রিপিটক প্রভৃতি। হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা এত অধিক যে, তাহা কোন এক নির্দিষ্ট গ্রন্থে নিবদ্ধ হইতে পারে নাই। বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত বিভিন্ন শাস্ত্রাদেশ পালনীয় হইয়াছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ,

তন্ত্র প্রভৃতির শাসনে শাসিত হইয়াছে। শাস্ত্রসকল বিভিন্ন হইলেও কেহ শ্রুতি বা বেদবিরোধী নহে। যাহা বেদমূলক শাস্ত্রানুসারী, তাহাই হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠ সাধনাপ্রণালী, তাহাই বেদোক্ত মোক্ষধামে লইয়া যাইতে পারে। অধিকারিভেদে বেদেরও শাখাপ্রশাখা বিস্তর; বিস্তর হইলেও সকলই একই মোক্ষমুখ হইয়া আছে। সুতরাং হিন্দুধর্মের প্রাণ এই বেদ। বৌদ্ধাদি উৎপন্নধর্ম বেদের সকল শাসনে শাসিত হইতে চাহে না, তজ্জন্যই হিন্দুধর্মের সহিত তাহাদের বিভিন্নতা।

বেদ-বেদান্ত—বেদ কর্মকাণ্ডের এবং বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ। বৈদিক কর্মকাণ্ড, মনুষ্যকে ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তি-পথে আনিয়া নিষ্কাম করিবার শিক্ষা-প্রণালী। নিষ্কাম-ধর্মে মানুষের যে জ্ঞান উদয় হয়, সেই বিবেকজ্ঞানে মানুষের ব্রহ্মদর্শন-হেতু মোক্ষ লাভ হয়; এই ব্রহ্মদর্শনে মানুষ সমুদয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মময় দেখেন। বেদ-বেদান্ত এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রণালী, সুতরাং বেদ প্রধানতঃ প্রবৃত্তিপথের এবং বেদান্ত প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গের পথপ্রদর্শক। অগ্রে কর্ম, তৎপরে জ্ঞান, এজন্য কর্মকাণ্ড পূর্ব এবং জ্ঞানকাণ্ড শেষভাগ বলিয়া কথিত।

দর্শনশাস্ত্র—দর্শনশাস্ত্রসমুদয় বেদ-বেদান্তের প্রধান চক্ষু ও মীমাংসা-শাস্ত্ররূপে প্রকৃতপক্ষে ত্রয়ী বিদ্যার দর্শন-স্বরূপ হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্র অধিকারিভেদে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদে বিভক্ত হইয়াছে। আস্তিক-নাস্তিকভেদে দর্শনশাস্ত্র দ্বিবিধ। সংশয় না হইলে কিসের মীমাংসা হইবে? প্রথম পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য ষড়্বিধ আস্তিক-দর্শন সেই নাস্তিকবাদ খণ্ডন করিয়া বেদকে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

স্মৃতি আদি সমাজ-ধর্মশাস্ত্র—এই সমাজ-ধর্মশাস্ত্রে লোক-যাত্রার সমুদয় কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম ভিন্ন আর কোন ধর্মে কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের জন্য স্বতন্ত্র শাস্ত্রসৃষ্টি দেখা যায় না। বেদে

কর্তব্যাকর্তব্য যে প্রকারে অস্পষ্ট ও সূক্ষ্মরূপে আভাসিত হইয়াছে, লোকযাত্রার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। এজন্য সৃষ্ট্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বেদ-বেদান্তের অনুমানসিদ্ধ কর্তব্যনিরূপক শাস্ত্র। মন্বাদি ঋষিগণ এই সমাজধর্ম-শাস্ত্রে সেই কর্তব্যপথ অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। এইসকল শাস্ত্রে যে-সমস্ত কর্মকাণ্ডের ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, পূর্বমীমাংসাদর্শনে সেই সকলের সুন্দর মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞানলাভের পন্থাকে সুপ্রণালীবদ্ধ করিয়া আনিয়া অতি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

ভক্তিশাস্ত্র—দর্শনশাস্ত্রে যেমন কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা আছে, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে তদ্রূপ ভক্তিপথেরও স্বতন্ত্র মীমাংসাশাস্ত্র ঋষিগণ-কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভক্তিপথেরও সকল সংশয় এই মীমাংসাশাস্ত্র দ্বারা খণ্ডিত হয়। তদ্দ্বারা ভক্তিপথে যে আলোকপাত হইয়াছে, সেই আলোকে ভক্তির অধ্যাত্মবৈজ্ঞানিক পন্থায় ভক্তগণ চালিত হইয়া পরমেশ্বরের দর্শনলাভপূর্বক সর্বশান্তিময় আনন্দধামে উপনীত হয়েন। হিন্দুধর্মে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত ভক্তি মিশ্রিত হওয়ায় হিন্দুধর্ম বড়ই মধুর হইয়াছে।

এক্ষণে তন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস—ইহার সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইবে।

তন্ত্র-পুরাণ

বর্তমানে হিন্দুশাস্ত্রের তন্ত্র ও পুরাণশাস্ত্র লইয়াই যত গোলযোগ। হিন্দুধর্মের ভাবুক জনগণের ধর্মশাস্ত্র, তন্ত্র ও পুরাণ দেখিয়া অনেকে ইহাকে "আষাঢ়ে গল্প" বা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ-বিরচিত গল্পগাথা এবং তদুক্ত বিভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধনাপ্রণালী দেখিয়া তাহা বালকের পুতুলখেলা বা হিন্দুদিগের কু-সংস্কার বলিয়া নিজ অভিজ্ঞতার

পরিচয় দিয়া থাকেন। যে দেশে তন্ত্র-পুরাণের জন্ম, যে দেশের লোক কত যুগযুগান্তর হইতে তন্ত্র-পুরাণের মতে পূজা ও ক্রিয়াকলাপ করিয়া আসিতেছে, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব ও মহান্ উদ্দেশ্য অন্য দেশের লোকের বুঝিবার সাধ্য কি? কেননা, হিন্দুদের পুরাণাদি দর্শনশাস্ত্রের স্থূলাংশ। যাহাদের বুদ্ধিতে দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না, গল্পে উদাহরণে তাহাদের জন্য পুরাণাখ্যানের সৃষ্টি। অতএব অদূরদর্শী অজ্ঞান ব্যক্তির নিকট পুরাণাখ্যান আরব্য উপন্যাসের গল্প বলিয়াই বোধ হয়। পূর্বে বলিয়াছি, হিন্দুর শাস্ত্রোপদেশ অধিকারভেদে—সেইজন্য কিঞ্চিৎ আবৃত। কেননা, যাহারা অধিকারী, তাহারাই মর্মগ্রহণে সক্ষম হইবে, অনধিকারী কেবল অর্থ বুঝিয়া কি করিবে?—আসল বিষয় বুঝিতে পারিবে না।

বেদে সূক্ষ্মরূপে যে যোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তন্ত্র বা আগমে সে যোগপথ পরিষ্কার করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। সেই যোগপথে সামর্থ্য দিবার জন্য যে-সকল শক্তি প্রয়োজন, এই যোগশাস্ত্রে সেইসকল শক্তির বিরাট রূপও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনাদিতে সূক্ষ্ম কথার প্রসঙ্গ, পুরাণে ও তন্ত্রে স্থূল কথার প্রসঙ্গ। ইউরোপীয় বিদ্যায় যেমন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিষয় ছবি দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়,* হিন্দুধর্মশাস্ত্রে সেইরূপ অগ্রে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমুদয় শ্রুতি-স্মৃতি-দর্শনে বিবৃত হইয়াছে। তৎপরে সেই বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতত্ত্বসমুদয় তন্ত্রে ও পুরাণে প্রতিমার স্থূল-রূপে ও বিস্তারিত আকারে খণ্ডে-বিখণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্রের শক্তিসাধনা এইরূপ যোগবিদ্যার চিত্রিত ছবি এবং পুরাণের দেবদেবীসকল বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার খণ্ডিত স্থূল রূপ ও প্রতিমা। শুধু তাহাই নহে, এই সকল তত্ত্ব সাধকগণের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিবার

---

* ১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেস) অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে যে শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে সূর্য হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টিপ্রণালী চিত্রসাহায্যে দেখান হইয়াছিল।

জন্ম নানাবিধ ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে ; এই ইতিহাস ত্রিবিধ। যথা—

প্রথমতঃ—অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্বসমুদয় বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য পশু-পক্ষী প্রভৃতির আখ্যানচ্ছলে তত্ত্বোপদেশ একপ্রকার ইতিহাস। এইরূপ ইতিহাস মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মকর্তৃক বিস্তর কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—নিম্নাধিকারী জনগণের প্রবোধ ও শিক্ষার্থে দেবদেবীর সৃষ্টি ও লীলাদিবিষয়ক ইতিহাস।

তৃতীয়তঃ—ভক্ত, সাধক ও যোগীদিগের আখ্যায়িকা। সমস্ত জীবনের আখ্যায়িকা নহে, তাঁহাদের জীবন-চরিতমধ্যে যাহা কিছু অসামান্য, অসাধারণ ও দেবতুল্য ছিল, কেবল সেই চরিতাংশবিষয়ক বিবরণ। কারণ হিন্দুধর্মশাস্ত্রে ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয়—পরমার্থতত্ত্ব। সুতরাং ইংরাজীতে যাহাকে ইতিহাস (History) বলে, আর্যশাস্ত্রে ইতিহাস শব্দের অর্থ ঠিক তাহা নহে। হিন্দুশাস্ত্রে ইতিহাসের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ উপদেশযুক্ত যে পুরাবৃত্ত, তাহাকেই ইতিহাস বলে।

সেই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য প্রধানতঃ পরমার্থতত্ত্ব ; ব্যবহারিক জ্ঞান নহে। সেই তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য পুরাণাদিতে অদ্ভুত কল্পনাসম্ভূত ঐতিহাসিক বিবরণের সৃষ্টি। সেই ইতিহাস পরমার্থজ্ঞানের প্রবাহক মাত্র। সেই সমস্তই আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ পারমার্থিক ইতিহাস—অধ্যাত্ম-জগতের প্রকৃত ঘটনা ও তত্ত্বকথা।

উপনিষদে সামান্যাকারে যে ইতিহাস আরব্ধ আছে, পুরাণে ও তন্ত্রে তাহারই বিস্তৃত সৃষ্টি। এই পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে নিম্নাধিকারী

সাধকের জন্য শক্তিবাদ, ভক্তিবাদ ও কর্মবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি তদনুযায়ী এক বা অন্যতর বাদের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ হইলে, যখন তাঁহার কর্মসন্ন্যাসযোগে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন তিনি দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হয়েন। তন্ত্র ও পুরাণ হিন্দুদের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত শূন্যোচ্ছ্বাস নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বেদে সূক্ষ্মরূপে যে যোগপথ আভাসিত হইয়াছে, তন্ত্রে সেই যোগপথ পরিষ্কার করিয়া বিবৃত আছে। দক্ষযজ্ঞ হইতে দশ-মহাবিদ্যারূপ, যজ্ঞনষ্ট, সতীর দেহত্যাগ, শিবের সাধনা, মদনভস্ম ও কার্তিকের জন্ম প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি আশা করি হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য যোগীর যোগসাধনা। এখানে মানবের মনই দক্ষ, তিনি আপন কর্মশক্তিগর্বে স্ফীত হইয়া ঈশ্বরহীন কর্ম করিতেছেন। সাংখ্যমতের প্রকৃতি-পুরুষ, এখানে সতী ও শঙ্কর। এখন কর্মশক্তির পরিচালনায় অপরা প্রকৃতিকে বাধ্য হইতে হইবে। মানবের ঈশ্বরহীন কর্মই দক্ষযজ্ঞ, কিন্তু এরূপ কর্মে ঈশ্বর-স্বরূপ আত্মা শক্তি দিতে চাহেন না, তাই প্রকৃতির দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ। দশমহাবিদ্যার রূপ জাগতিক ঐশ্বর্যমূর্তি ; আত্মা দশমহাবিদ্যা বা জগতের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রকৃতি কর্মের অধীন হওয়ায় দেহত্যাগ করিলেন অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে কুণ্ডলিনী অবস্থায় স্বাধারে মহানিদ্রিতা হইলেন। এই পর্যন্ত জীবের বর্তমান অবস্থা, তৎপর সাধনপথ, ইহাই মহাদেবের তপশ্চর্যা। মর্ম এইরূপ—

যোগের দ্বারা আত্মা তাঁহাকে জাগাইয়া লইলেন, কুণ্ডলিনী জাগিয়া ষট্‌চক্রভেদ করিয়া সহস্রারপদ্মে তাঁহার সহিত বিহারে রত হইলেন। এই জাগরণ সতীর পুনর্জন্ম, বিবাহ ষট্‌চক্রভেদ, আর সহস্রারে শিবের সহিত সম্মিলনই বিহার। সেই বিহারের ফলে কার্তিক ও গণপতির জন্ম।

ইহার তাৎপর্য এবম্বিধ—সাধকের সর্বসিদ্ধি করতলগত, আর এই সূক্ষ্ম প্রকৃতিপুরুষের সংযোগে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার দ্বারাই হৃদয়রূপ স্বর্গরাজ্যের কাম-ক্রোধাদি অসুরগণ দূরীভূত ও দয়া-দাক্ষিণ্যাদি দেবশক্তি রক্ষিত হয়।

ব্রজলীলার স্থূল ঘটনাবলীরও এইরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব আছে। রাধা ও কৃষ্ণ লইয়াই ব্রজলীলা। রাধ্ ধাতু হইতে রাধা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাধ্-ধাতুর অর্থ আরাধনা, অতএব যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা আর কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা ; যিনি সাধনাকারিণী শক্তির সর্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন,তিনিই কৃষ্ণ। সুতরাং **কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**। আর রাধা বা আরাধিকা জীবাত্মা। কারণ—

সোঽহং-হংসপদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা।

জীবাত্মা সর্বদা সোঽহং শব্দে ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন। সুতরাং রাধাই জীবাত্মা।

ব্রজলীলার তাৎপর্য—রাধা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রথমে কাত্যায়নীর ব্রত করেন, ইহাই জীবের কুলকুণ্ডলিনীর সাধনা। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে জীবের সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়। তখন লজ্জা, সরম, ঘৃণা, শঙ্কা, কুল, মান, ধর্মাধর্ম সমস্তই ভগবচ্চরণে অর্পিত হয়, আত্মাভিমান থাকে না। ইহাই পুরাণের রাধার ব্রতসাঙ্গ, বস্ত্রহরণ ও বনবিহার। রাসই জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ, তৎপর রাধা শত বৎসর সমাধিতে নির্গুণা হইয়া প্রভাসের জ্ঞানযজ্ঞের পর পুরুষোত্তমে প্রবেশ করিয়াছিলেন।*

---

* এই তত্ত্বের সাধনা এই গ্রন্থের সাধনকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে এবং মৎপ্রণীত "প্রেমিকগুরু" গ্রন্থে এই সকল তত্ত্ব বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে।

এইরূপ শত শত সাধন-রহস্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব, পুরাণ ও তন্ত্রমধ্যে স্থূল আখ্যায়িকা দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা ব্যক্তিগত ক্ষমতার আয়ত্তাধীন নহে। পুরাণের দেব-দেবীর স্থূল রূপে সৃষ্টিতত্ত্বের কি সূক্ষ্মভাব নিহিত আছে, তাহাই দেখা যাউক।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতা-রহস্য

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা বল, অসুর বল, ভূত বল, মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্বত বল, জল বায়ু অগ্নি যাহা কিছুই বল,—সমস্তই ব্রহ্ম।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্যতে॥

—পঞ্চদশী

এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পূর্বে নাম-রূপাদি-বিবর্জিত কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। আর এখনও তিনি সর্বব্যাপী ও সেই ভাবেই বিদ্যমান আছেন।

এই বাক্যের বিশেষত্ব এই, প্রতি প্রলয়কালে বিশ্বসত্তা বীজাকারে যে নির্গুণ সত্তায় পরিণত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়, সেই সত্তাই সগুণ হইয়া আসিয়া সৃষ্টিকালে জগতের উপাদানরূপে পরিণত হয়। সুতরাং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এই সত্তাংশ মাত্র নির্গুণ অবস্থা হইতে সগুণ আকার ধারণ করে।

পাদোঽস্য সর্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।—শ্রুতি

এই সমুদয় ভূত তাঁহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুক্ত ও দ্যুলোকে অবস্থিত।

অমৃত কেন—তাহা জন্মমরণের অতীত। নিত্যমুক্ত কেন—তাহা ত্রিগুণের অতীত হইয়া নির্গুণ এবং অপরিণামীহেতু নিত্যমুক্ত এবং তাহা আনন্দময় দিব্যধাম, তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, "তিনি সৃষ্টির পূর্বেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনিই আছেন।"

ভগবান্ জগৎসৃষ্টির বাসনা করিয়া বলিলেন, "অহং বহুস্যাম্"—আমি বহু হইব।

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।—শ্রুতি

তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব বা জন্মিব। ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলে তিনি প্রকটচৈতন্য হইলেন ও সেই বাসনা মূলাতীতা মূলা প্রকৃতি হইলেন। এই মূলা প্রকৃতিই জগতের আদি কারণ, কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। এই মূলা প্রকৃতিই তন্ত্রের আদ্যাশক্তি এবং চৈতন্যই পুরাণের মহাবিষ্ণু। ইহারাই সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ। মূলা প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইলেন। পুরাণের মতে—

মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ভাবার্থ—প্রকটচৈতন্যস্বরূপ নারায়ণ জগতের কারণস্বরূপ,—তাই প্রলয়কালে তিনি কারণবারিতে প্রসুপ্ত। সেই কারণের জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি, সেই কারণ-জগৎ পদ্মস্বরূপ। পদ্ম অর্থে ব্রহ্মাণ্ডের আভাস। ব্রহ্মা স্বয়ং সমস্ত কারণ ও শক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্টিস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধিষ্ঠানরূপ-জগতের সূত্র আভাস-পদ্ম লইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা সেই পদ্মকে জগৎরূপে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার মধ্যে আত্মারূপে গমন করিয়া প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, সেই তিন বিভাগে "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" হইল। ইহাই পুরাণের পৃথিবীলোক, পিতৃ বা প্রেতলোক ও স্বর্গলোক। ভূলোকে জীবলীলা, পিতৃলোকে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্বশক্তিতে

আত্মাবস্থান। এই তিনটি অবস্থাদ্বারা জীব ভোগ মাত্র করিতে পারিবে,—মুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন—এই পাঁচটি মায়া-ধর্মকে ভোগ বলে। জীবগণের এই ভোগদ্বারা জন্ম-মৃত্যুর অধীন অবস্থায় লয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ভোগ-বাসনা-বিবর্জিত হইলে তবেই মোক্ষ হয়।

এইরূপে "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" এই ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই ব্রহ্মার সৃষ্টি। ইহাতেই এই ত্রিলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট সূক্ষ্ম-শক্তিকেই দেবতা বলা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম জগৎ কি? না, জগতের উপাদান—অর্থাৎ জগৎ যাহাতে অবস্থিত বা জগতের যাহা বীজস্বরূপ। পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণে স্থূল জগতের প্রকাশ। পঞ্চমহাভূতের যে সূক্ষ্মাংশ, তাহাই স্থূল জগতের সৃষ্টিকর্তা দেবতা। অতএব ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চমহাভূত, ইহারাই পুরাণের পঞ্চদেবতা। অবশ্য ইহাদিগের স্থূলভাগ দেবতা নহে, ইহাদের যে সূক্ষ্মশক্তি, তাহাই দেবতা। এই দেবতাদের সূক্ষ্মাংশের মিশ্রণে স্থূলের উৎপত্তি, সেই সূক্ষ্মের বিবর্তনই স্থূল জগৎ। আবার বিবর্তনে যে-সকল ভূত, যে-সকল অদৃষ্ট-শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও দেবতা। জগতে যত প্রকার স্থূল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগ (আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণ) দ্বারাই ভৌতিক স্থূল পদার্থের সৃষ্টি সংঘটিত হয়।" তাঁহাদিগের মতে জগৎসৃষ্টি ও নির্মাণের মূলে ভৌতিক পদার্থ (Elements) বিদ্যমান। Elementsও তো স্থূল পদার্থ। যাহার রূপ আছে, তাহাই স্থূল। জড়বিজ্ঞান এই Elements-এর উপরে আর যাইতে সক্ষম নহে। ইহাদের মতে Elements চিচ্ছক্তি-রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি, কেবল জড়পদার্থের সংযোগে উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে প্রকাশিত। জড়জগতের ক্রিয়া দেখিয়া

ভৌতিক পদার্থসকলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যে আকাশ (Ether) দ্বারা উহারা স্থূলের জগতে ব্যাপ্ত, তাহারই শেষ সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ কি, তাহারই তত্ত্ব কি, ইহা বুঝিবার ক্ষমতাই যখন আমাদিগের নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব যে সেই আকাশের বা ইথারের অন্তর্জগতে আবার কি বস্তু আছে? তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, কোন বস্তু আছে, নতুবা তাহারা সক্রিয় হয় কেমন করিয়া?* যোগিগণের ধ্যানধারণা ব্যতীত সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তির সন্ধান মিলে না।

ভারতের স্বর্ণযুগে যোগবলশালী আর্যঋষিগণের যোগতত্ত্ব দ্বারা সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি-শক্তিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে উহারা প্রকৃত আধি-দৈবিক; প্রত্যেক শক্তি মূলতঃ সূক্ষ্মজগতে চিচ্ছক্তিবিশিষ্ট দেবগণকর্তৃক অধিকৃত। তাঁহারাই সূক্ষ্মজগৎ হইতে স্থূলজগৎকে এমন সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালন করেন। হয়ত আমাদের স্থূল জগতের অমিশ্র-মিশ্ররূপে তেত্রিশ কোটি পদার্থ আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মূল সূক্ষ্মশক্তিকেই তেত্রিশ কোটি দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সেই অমিশ্র-মিশ্র সূক্ষ্মশক্তিগুলিকেই পুরাণকারগণ নাম ও রূপ দিয়া দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। অতএব দেবতাগুলি পুরাণের রূপক; কিন্তু এরূপ রূপক নহে—যাহা নহে বা অসম্ভব ঘটনা তাহাই বিশেষ

* জড়বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেনসারও স্পষ্টাক্ষরে আপন অক্ষমতা জানাইয়াছেন। যথা—

Supposing him (the man of science) in every case able to resolve the appearances, properties and movements of things into manifestation of Force in space and time, he still finds that Force, Space and Time pass all understanding.　　*—First principle, Page 66*

করিয়া বুঝাইবার জন্য বর্ণিত হইয়াছে ; পুরাণে সেরূপ রূপক লিখিত হয় নাই। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা যেমন বিষ্ণুর কার্যাবলী অজ্ঞ মানুষকে বুঝাইবার ও জানাইবার জন্য বিষ্ণু সাজিয়া তাঁহার লীলা-অভিনয় করে, তদ্রূপ শক্তিসকলও মহিমা ও শক্তিজ্ঞাপনার্থ স্থূলাকার ধারণ করে। তবে তাহারা রূপক এইজন্য যে, শক্তি বা চৈতন্যের রূপ গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। সে যে-রূপ, তাহা রূপক। সেই রূপকের এমন ভাব, এমন তাৎপর্যার্থ আছে, যাহা বিশ্লেষণ করিলে, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।

শুধু অধ্যাত্মবিদ্যা বলিয়া নয়, অন্যান্য জটিল তত্ত্বেরও এইরূপ চিত্র আছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন ; তাহা হইতে প্রতিমাও প্রস্তুত হইতে পারে। মূলতানী দীপক-রাগের সহধর্মিণী; দীপকের পার্শ্ববর্তিনী রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী ; চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্য ভিন্ন আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা মূলতান রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। মূলতান রাগিণী শুনিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা-দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। তদ্রূপ হিন্দুদিগের স্বর্গ, নরক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাসাদি সমস্তই অন্তর্জগতের বিষয় স্থূল অবয়বে প্রকটিত এবং সূক্ষ্ম, সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব স্থূল অবয়বে দেবদেবীরূপে প্রতীয়মান। ইহার সাকার প্রতিমা দর্শনে সে সূক্ষ্মভাব ধারণা হইবে। দুই একটির উদাহরণ, যথা—

বিষ্ণুমূর্তি—মহত্তত্ত্ব বা প্রকটচৈতন্য ; এ বেশ চতুর্ভুজধারী নারায়ণ। অনন্ত বায়ুরাশি নীলবর্ণ দেখায়, ইনিও অনন্ত ; তাই ইনি নীলবর্ণ। চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী। সৃষ্টির মূলীভূত জগৎকেন্দ্র নারায়ণের নাভিপদ্ম, পূর্বে এ কথা বলিয়াছি। নারায়ণের হস্তস্থিত পদ্মই সৃষ্টি-ক্রিয়ার, গদা লয়ক্রিয়ার, শঙ্খ স্থিতিক্রিয়ার এবং চক্র অদৃষ্ট- (যাহা

পলে পলে পরিবর্তিত) ক্রিয়ার প্রতিমা। সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপ। বিষ্ণুর দুই স্ত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। লক্ষ্মী আনন্দ ও সরস্বতী চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপা। ইনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তাই নাম বিষ্ণু। "বিগতা কুণ্ঠা (মায়া) যস্য স বৈকুণ্ঠঃ।" এইরূপ হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হয়েন বলিয়া তিনি বৈকুণ্ঠবাসী।

এই মহত্তত্ত্বের স্ত্রীরূপ **ভগবতীমূর্তি**। ইহাই ভগবানের শাক্ত শরীর। দক্ষিণে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যসমষ্টি আনন্দরূপা লক্ষ্মী, বামে নির্মল-জ্ঞানরূপা শুদ্ধসত্ত্বা চিচ্ছক্তি সরস্বতী। উভয় পার্শ্বে সর্বসিদ্ধিপ্রদ গণেশ, দেবশক্তি-রক্ষাকারী কার্তিক। অসুরশক্তি পরাজিত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের সূক্ষ্মশক্তি দেবতারূপে চালে অঙ্কিত। ইনি দশদিকে দশ হাত বিস্তার করিয়া জগতের কার্যে নিযুক্তা।

কালীমূর্তি—সাংখ্যদর্শনের সগুণ ঈশ্বর বা প্রকৃতি-পুরুষের প্রতিমা। সাংখ্যের মতে পুরুষ জড়, প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা। তাই শিব শবাকারে পতিত, প্রকৃতি তাঁহাতে স্থিত হইয়া জগদ্ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদৃষ্ট সূক্ষ্মশক্তিগুলি পুরাণে সাকার কল্পিত হইয়া নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত আলোচনা সম্ভবপর নহে।

দেবলীলা—যাহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই—মানবহৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মশক্তিই দেবতা, আর অসদ্বৃত্তিগুলির সূক্ষ্মশক্তিই দৈত্য, তাই দেব-দৈত্যে সর্বদা যুদ্ধ। যখন বৃত্রাসুর ও তারকাসুরের ন্যায় কাম বা ক্রোধাদি প্রধান দৈত্যের অভ্যুদয় হয়, তখন দেবশক্তি হৃদয়রূপ স্বর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করে, অসুরের একাধিপত্য হয়। তখন যোগসাধনে প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে কার্তিকেয়শক্তি লাভ করিয়া দৈত্যগণকে বিতাড়িত করিতে হয়।

কৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ। যাঁহারা সংসার হইতে দূরে গিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রজধামে আসিয়াছেন। ব্রজপুরে গোপরূপ জীব আসিয়া দেখেন সেখানেও সংসারের বিষময়ী চিন্তারূপী কালীয় ও পাপপ্রলোভনরূপী ভীষণ প্রলম্বাসুরের উৎপাত। তখন সাধনায় জীবে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে উহাদের উচ্ছেদসাধন করেন। তাঁহার হাতে গোবর্ধনগিরি (গো=বেদজ্ঞান, গোবর্ধন=জ্ঞানবর্ধনের উপায়স্বরূপ, গিরি =বেদান্তবাক্য); তিনি ইন্দ্র-ক্রোধহেতু অনিষ্টপাত নিবারণ করিয়া গিরি-যাজ্ঞিকগণকে রক্ষা করেন। অতএব পুরাণের এই সকল আখ্যান ও চিত্র অন্তর্জগতের নিত্যব্যাপার।

এই সকল সাকারমূর্তিতে, সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্তর্জগতের ঘটনা মানব-হৃদয়ে অঙ্কিত হইতেছে। অতএব দর্শনের যাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব, পুরাণের তাহাই দেব, আর কার্যকারিণী সূক্ষ্মশক্তিই দেবীরূপে তাঁহার স্ত্রী; ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি যাবতীয় দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অদৃষ্ট সূক্ষ্মশক্তি মাত্র। দুই একটি নামের বিশ্লেষণ করা যাউক।

গোপীজনবল্লভ কি ? শ্রুতি বলিতেছেন—

"গোপীজনাবিদ্যাকলাপ্রেরকস্তন্ময়া চেতি।"—গোপালতাপনী

যাঁহারা রক্ষা করেন, তাঁহারাই পালনীশক্তি—গোপী। সেই পালনী-শক্তিরূপিণী অবিদ্যা-কলার যিনি বল্লভ, তিনিই অবিদ্যার প্রেরক এবং অনন্ত জগতের অধিষ্ঠান; সুতরাং সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণই গোপীজনবল্লভ।

গোবিন্দ কে ? গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ।

গো শব্দের অর্থ বেদজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, যিনি বেদ বা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা উপলব্ধ, তিনিই গোবিন্দ।

বাসুদেব কে ? বসুদেবের পুত্র। বসুদেব কি ?

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৪ স্ক, ৩ অ

বসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বুঝায়। নির্মল সত্ত্বগুণে যিনি প্রকাশিত হন, তিনি বাসুদেব।

জনার্দন কে? জনং জন্ম অর্দয়তি হন্তি ভক্তস্য মুক্তিদত্বাদিতি জনার্দনঃ। কিংবা জনান্ লোকান্ অর্দয়তি হররূপেণ সংহারকত্বাদিতি জনার্দনঃ। কিংবা জনয়তি উৎপাদয়তি লোকান্ ব্রহ্মরূপেণ সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিতি জনার্দনঃ। কিংবা সমুদ্রান্তর্বাসিনঃ জননামকাসুরান্ অর্দিতবান্ ইতি জনার্দনঃ।

—যিনি ভক্তজনের জন্মমৃত্যু নিবারিত করিয়া মুক্তি দেন, তিনিই জনার্দন। কিংবা হররূপে যিনি জীব-জগৎ লয় করেন, কিংবা ব্রহ্মারূপে চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন, কিংবা সমুদ্রান্তর্বাসী "জন" নামক অসুরকে যিনি নিধন করিয়াছেন, তিনিই জনার্দন।

ভগবান্ কে?

উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

—যিনি ভূতসকলের উৎপত্তি, বিনাশ, গতি, অগতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, তিনিই ভগবান্।

এক্ষণে রূপের আলোচনা করা যাউক। ভগবানের সাত্ত্বিকী মূর্তির ধ্যান, যথা—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥

—গোপালতাপনী

টীকাকার বিশ্বেশ্বর অর্থ করেন—

"সৎপুণ্ডরীকনয়নং" কি? সৎ নির্মলং পুণ্ডরীকং হৃৎকমলং নয়নং প্রাপকং যস্য তং।—যাঁহাকে নির্মল হৃৎকমলে লাভ করা যায়। "মেঘাভং" কি? মেঘা উপতপ্তমনসি সচ্চিদানন্দস্বরূপা আভা যস্য তং—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বৈদ্যুতিক আভাবিশিষ্ট হইয়া যিনি উত্তপ্ত মনে শান্তি প্রদান করিতেছেন। "বৈদ্যুতাম্বরং" কি? বিদ্যুদেব বৈদ্যুতম্ তাদৃশম্ অম্বরং স্বপ্রকাশচিদাকাশমিত্যর্থঃ—যিনি স্বপ্রকাশ ও চিদাকাশস্বরূপ, যাঁহাকে প্রকাশ করিতে কিছুরই আবশ্যকতা হয় না, যিনি নিজ চিৎস্বরূপে বিদ্যুৎসম প্রকাশিত হইয়া আছেন, তিনিই পীতাম্বর, তাঁহার উজ্জ্বল পীতাম্বর সেই বিদ্যুৎসমান। "দ্বিভুজং" কি? দ্বৌ, হিরণ্যগর্ভবিরাড়াত্মনৌ ভুজৌ মৌর্তিকশিল্পহেতুভূতৌ হস্তৌ যস্য তং দ্বিভুজম্—জগৎসৃষ্টির কারণ হিরণ্যগর্ভ এবং জগতের মূর্তির হেতু বিরাট্‌পুরুষ তাঁহার দুই হস্ত। "জ্ঞানমুদ্র্যাঢ্যং" কি? জ্ঞানমুদ্রা—তত্ত্বমসীতি সচ্চিদানন্দৈকরসাকারা বৃত্তিঃ, তত্র আঢ্যং প্রকাশমানম্—যিনি "তত্ত্বমসি"রূপে সচ্চিদানন্দৈক-রসাকারমূর্তিতে প্রকাশমান। "বনমালিনং" কি? বনে বিবিক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে—যিনি নির্জন প্রদেশে স্বীয় ভক্তগণের নিকট প্রকাশমান। "ঈশ্বর" কি? ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্—যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের ও সকলেরই নিয়ন্তা।

অতএব সত্ত্বরূপী ভগবান্ নির্মল পুণ্ডরীকনয়ন, জলধরকান্তি, পীতবসন, দ্বিভুজধারী, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর যোগরূপ জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালাবিভূষিত, সকলের ঈশ্বর।

পাঠক! রূপ ও নামে কি বিরাট্ ব্যাপার ও মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে বুঝিলেন? আমরা আর্য-ঋষিদিগের এই সকল আশ্চর্য কবিত্ব ও কল্পনার যতই আলোচনা করিব, ততই তাঁহাদের মহতী কীর্তির পরিচয়

পাইব। বিলাসের উপকরণ চিত্রাদি হইতেও হিন্দু জ্ঞানলাভ করিতেছে।

ঐ দেখ **হরগৌরীমূর্তি**—জ্ঞান ও প্রেমের জ্বলন্ত ছবি। জ্ঞানই মহাদেব-প্রতিম, জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সংসারাসক্তি দূরে যায়। তাই কাশীর ন্যায় যাঁহার স্বর্ণপুরী ও কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, তিনি কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভস্ম ও নরাস্থি-অলঙ্কারে নগ্নবেশে শ্মশানে বাস করিতেছেন। জ্ঞানযোগী সর্বকার্যে উদাসীন, কিন্তু "ভগবৎপ্রেম" তাঁহাকে জড়াইয়া। জ্ঞানে প্রেম ও প্রেমে জ্ঞান মিশিয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! এবম্বিধ জ্ঞানযোগীর মানসপুরই কৈলাসধামতুল্য।

আবার ঐ ছবিখানা দেখ, কৃষ্ণ কদম্বতলে দাঁড়াইয়া রাধা-নামের সাধা বাঁশী বাজাইতেছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিফলযুক্ত কল্প-তরুর মূলে দাঁড়াইয়া ভগবান্ বিবেক-বাঁশরী-স্বরে আরাধিকা জীবকে অমৃতফলভোগের জন্য ডাকিতেছেন।

আর একখানা ছবি দেখ, অটল বৃষের উপর মহারুদ্র অবস্থিত, তাঁহার কোলে সর্বসৌন্দর্যবতী, সর্বালঙ্কারভূষিতা, চিরযৌবনা গৌরী বসিয়া আছেন। রুদ্রমূর্তি লয়ক্রিয়ার প্রতিমা। ঐ ছবি মানবদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে, "মানব! মরণে ভয় কি? একবার চাহিয়া দেখ মরণের কোলে কে বসিয়া আছে? একবার কোনরূপে মরিতে পারিলে সর্ব-সুখাধারস্বরূপ ঐ যুবতীকে লাভ করিতে পারিবে।" তাই কবি বলিয়াছেন,—

যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত।
রে মৃত্যু! তাহার ভূমি সরণী নিশ্চিত॥
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তাহায়।
সফল হইবে আশা যাইব তথায়॥

—৺কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

এ কথা মিথ্যা নহে, বৃষরূপী অটল সত্যের উপর এই বাক্য অধিষ্ঠিত। পাঠক! আর কত দেখাইব? হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য তত্ত্ব, অনন্ত ভাব; একজনের পক্ষে সমস্ত প্রকাশ করা অসম্ভব। তন্ত্র ও পুরাণের এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে অন্য ধর্মাবলম্বিগণের এখনও বহু বিলম্ব আছে।

শিবলিঙ্গ আরাধনারও রহস্য আছে।—

আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্নলিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥

ইন্দ্রিয়বিশেষকে লিঙ্গ বলে না, আলয়কে লিঙ্গ বলিয়া জানিবে। আলয় অর্থাৎ সর্বভূত যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোত্থিত বুদ্বুদ লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিব হইতে উদ্ভূত বুদ্বুদস্বরূপ জীবসমুদয় যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই লিঙ্গ।

সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গশরীর বলে।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ।—কঠশ্রুতি

পরমপুরুষ শিব সর্বময় হইলেও তিনি সাধকের হৃদয়মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত স্থানেই অবস্থিত; তাই তিনি লিঙ্গ।

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
প্রলয়ে সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

আকাশ লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাঁহার আসন; মহাপ্রলয়ের সময় সমুদয় দেবতাগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্তমান ছিলেন, তাই তিনি লিঙ্গশব্দে অভিহিত হইয়াছেন। অতএব লিঙ্গ বা গৌরীপীঠ অর্থে নিকৃষ্টতম স্ত্রী বা পুরুষ-ইন্দ্রিয়বিশেষ নহে।* অনন্ত ঈশ্বর এবং সূক্ষ্ম মূল প্রকৃতিকে সামান্য জনগণে ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না,

*আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার "প্রবাসের পত্র" নামধেয় গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"নিকৃষ্ট লিঙ্গ-উপাসকেরা" ইত্যাদি। হিন্দুসমাজের একজন গণ্য-মান্য-বরেণ্য ব্যক্তির এইরূপ উৎকট জ্ঞান, অগাধ ভক্তি ও আশ্চর্য বিশ্বাসে স্তম্ভিত

সেই জন্যই অধিকারভেদ-বিরহিত এই লিঙ্গরূপী শিবের ও শিব-শক্তি কালিকার আরাধনা করিবার বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যথা—

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥—শ্রুতি

ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্গুণের উপাসনা সম্ভবে না, অতএব শক্তিসহযোগে তাঁহার উপাসনা করিবে। তাই লিঙ্গময় ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত যোনি-পীঠ সংস্থাপন। অতএব শিবলিঙ্গপূজা, সগুণব্রহ্মের উপাসনা মাত্র।

আশা করি, তন্ত্র-পুরাণের দেব-দেবীর আখ্যায়িকা ও নাম রূপ এবং প্রতিমাগুলি কেহ যেন আষাঢ়ে গল্প বা বালকের পুতুলখেলা মনে করিবেন না। বেদ-বেদান্তের বিভাগকর্তা বেদব্যাসেরই সম্পাদিত সমুদয় পুরাণ। নিম্নাধিকারী জনগণকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য তিনি পুরাণে জাজ্জ্বল্যমানরূপে ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্য জনগণের ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য দেব-দেবীর সৃষ্টি। যাহাতে সেই ভক্তি অপনীত না হয়, তজ্জন্য তিনি পৌরাণিক সৃষ্টি ও কল্পনার বিষয় সাধারণের নিকট গোপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু জানে—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥

—রামতাপনী

ও বিস্মিত হইতে হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর কি হইতে পারে? ইঁহারাই হিন্দুদের নেতা হইয়া অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দিতে যান। লিঙ্গশব্দের একাধিক অর্থবোধ পর্যন্ত যাঁহার নাই, তাঁহার ধর্মগুরু সাজিতে যাওয়া আত্মম্ভরিতা ও ধৃষ্টতা প্রকাশমাত্র। কারণ ইহাপেক্ষা কোল-ভীল-সাঁওতালগণও স্বধর্মের জ্ঞান রাখিয়া থাকে। অনধিকারচর্চায় হস্তক্ষেপ করিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিই লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হয়; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি যে এরূপ অন্ধজ্ঞানাভিমান বহন করেন ইহাই আশ্চর্য। এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা স্বদেশ ও স্বধর্মের কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমেয়! হিন্দুসমাজ মৃত বলিয়াই আচার-বিচার বিমূঢ় ব্যক্তির এবম্বিধ-প্রলাপোক্তি নীরবে শুনিয়া যাইতে হয়।

—ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অশরীরী হইলেও উপাসকদিগের কার্যসাধনার্থ তাঁহার রূপকল্পনা হইয়া থাকে। যখন সাধক অধিকারী হইবে, তখন পৌরাণিক রহস্যসমুদয় আপনিই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইবে।

পূজাপদ্ধতি ও ইষ্টনিষ্ঠা

হিন্দুর দেবদেবী বলিয়া নয়, তাঁহাদের পূজা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দু যে আধ্যাত্মিক সাধনাবলে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দেখেন, সেই আধ্যাত্মিক সাধনাও প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্গোৎসবে যে স্থূল পূজা হয়, তাহা আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মসাধনারই বাহ্য আকার। ভগবদ্ আরাধনায় অগ্রে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক, সেই শুদ্ধিব্যাপারের বাহ্যরূপই আসনশুদ্ধি, অঙ্গশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি। এই শুদ্ধিব্যাপারদ্বারা সাধক পরিশুদ্ধ হন। তৎপর আত্মনিবেদন-ব্যাপার। চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে কেহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে না। আত্মনিবেদন করিতে গেলে হৃদয়ের সমুদয় কামনা, প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেবমুখী হওয়া চাই। সেই আত্মনিবেদনের বাহ্যরূপই নানাবিধ দ্রব্যের সহিত নৈবেদ্যদান। ভক্তিপুষ্পাঞ্জলির সহিত ভগবান্‌কে এই নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মায়া, মোহ ও সংসারাসক্তি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্মনিবেদন হয় না। যদি ইন্দ্রিয়পরতা এবং রিপুপরতন্ত্রতা কিছুমাত্র থাকে, তবে আত্মনিবেদন হইতে পারে না। এই সংসারাসক্তি ইন্দ্রিয় ও রিপুপরতন্ত্রতাই মানবের পশুত্ব, কারণ ইতর পশুতেই তাহা বিদ্যমান। সুতরাং এই পশুত্বের একেবারে সংহার করা আবশ্যক। তাই আত্মনিবেদনরূপ নৈবেদ্যদানের পরই পশুবলির ব্যবস্থা আছে। যখন

সংসারাসক্তির অবসান হয়, তখন তাহার দেহস্থিত তমোগুণান্বিত পশুর (কৃষ্ণবর্ণ অজের) বলিদান হয়।* সাধকের যখন এইরূপ পশুবলি হয়, তখনই তাহার ইষ্টে সম্পূর্ণরূপে রতি ও একান্ত আসক্তি জন্মে। ঈশ্বরে পূর্ণাসক্তির নামই আরাত্রিক। এই আরতিব্যাপারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাসক্তিতে হৃদয়ের ভগবদ্ভক্তির পূর্ণমাত্রা সম্পূর্ণ হওয়াতে ঈশ্বরতন্ময়তা জন্মে। সেই ভক্তিপঞ্চকের নিদর্শন—দীপমালা, সজল পদ্ম, ধৌত বস্ত্র, বিল্বপত্রাদি এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। এই পঞ্চরূপে আরাধনাই ঈশ্বরকে আরতিদান। যে ঐশ্বরিক জ্ঞানে দেবদর্শন হয়, সেই জ্ঞান ভক্তির পঞ্চদীপাধারে জ্যোতিস্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরে এই জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইয়া, সাধকের অন্তরে ভগবৎশক্তি দশভুজার সত্ত্বমূর্তিতে দশদিক আলো করিয়া দেখা দেন।

অন্যান্য দেবদেবীর পূজাও এইরূপ। ইহাতে সাধকের নিষ্কাম ধর্ম, সর্বস্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ, চিত্তের একাগ্রতা ও ইষ্টনিষ্ঠা সাধিত হয়। হিন্দু-উপাসক মৃন্ময়ী বা শিলাময়ী বা দারুময়ী মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবত্বের পূজা করেন। সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণ উড়িয়া যায়, তাহাতে ভগবানের সূক্ষ্মরূপের আবির্ভাব হয়। পূজার এইরূপ নিয়ম আছে, সাধক প্রথমে দেবতার রূপ ধ্যান করতঃ স্বীয় মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে পরমাত্মাকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া দেহস্থ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করা হয়। তৎপরে (মূলোচ্চারণপূর্বক) "শ্রীঅমুকদেবস্য মূর্তিং কল্পয়ামি" বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে পুনর্বার ধ্যান করতঃ সুষুম্নানাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মবর্ত্ম† দ্বারা হৃদয়স্থ কল্পিত দেবতাকে সহস্রারে নিয়োজিত করিয়া

*যাহারা মাংসাশী, তাহাদের শক্তি-উপাসনার সহিত নির্লোভ ও নিষ্কাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই বলিদানের অন্য উদ্দেশ্য, নতুবা পশুহিংসা পাপ। সকাম সাধকের পশুবলির জন্য পাপ হয়, পুরাণের সুরথরাজা তাহার দৃষ্টান্ত।

† ব্রহ্মবর্ত্ম প্রভৃতির বিবরণ মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থে দেখ।

নিশ্বাস-পথদ্বারা দীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য দীপের ন্যায় প্রতিমায় দেবতা-আবির্ভাব চিন্তা করিয়া আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—(মূলোচ্চারণ-পূর্বক) "অমুক দেব-দেবী ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতো ভব, ইহ সন্নিরুদ্ধো ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" এই মন্ত্র বলিয়া মূলমন্ত্রদ্বারা বিশেষার্ঘ্যের জল লইয়া দেবাঙ্গে প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে পাঠ করিবে—ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। তৎপরে করজোড়ে পাঠ করিবে,—

তবেয়ং মহিমামূর্তিস্তস্যাং ত্বাং সর্ব্বগং প্রভো।
ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্॥

পাঠক! বুঝিলে?—প্রথমে সর্বব্যাপী পরমাত্মার দেবতা-মূর্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখস্থ ঘট বা পটে তাঁহাকে আরোপ করা হইল। এতক্ষণ মৃত্তিকা বা ধাতু ছিল। কিন্তু সাধক বলিলেন "হে অমুক দেব, তুমি এখানে আসিয়া এই মূর্তিতে অধিষ্ঠান কর। তুমি সর্বব্যাপী, সর্বত্র গমন করিতে পার, তাই ভক্তি-স্নেহে ডাকিতেছি, তুমি এখানে আসিয়া যাবৎ আমি পূজা করি, তাবৎ স্থিরভাবে অবস্থান কর। আমি তোমাকে উহাতে দীপবৎ স্থাপন করিলাম।" মনে যদি তাঁহাকে স্থাপন করিয়া পূজা করা যায়, তবে অন্য বস্তুতে তিনি আরোপিত না হইবেন কেন?

তৎপর সাধক প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে পূজাদি শেষ করিয়া বলিবেন—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

—আমি আবাহন জানি না, পূজা জানি না, বিসর্জনাদি কিছুই জানি না; হে পরমেশ্বর! তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর।

তৎপরে বিসর্জনমন্ত্রে সাধক বলিবেন, "গচ্ছ দেব যথেচ্ছয়া"—হে দেব! তুমি ইচ্ছামত যথাস্থানে গমন কর। তখন মাটির প্রতিমা নদীর মধ্যে

পদাঘাতে পাতিত হয়। কেননা, হিন্দু জানে, আমি যাঁহাকে আবাহন করিয়া পূজা করিয়াছি, তিনি তো এখন নাই ; স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। এই বিসর্জনব্যাপারেই সপ্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুগণ প্রতিমাপূজা করেন না।

পূজার ভিতর আত্মসমর্পণ-বিষয়টি আরও সুন্দর। মন্ত্র যথা—

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতম্।
তৎ সর্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥

মহাদেব রামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
তৎ সর্বং রাঘবশ্রেষ্ঠ কুরুষ্ব চ মদর্পণম্॥

ভগবান্ অর্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। পূজাদির স্তবকবচে ভগবানের অনন্ত কীর্তি গাঁথা রহিয়াছে। অতএব হিন্দুদিগের মন্ত্র ও পূজা-পদ্ধতি ব্রহ্ম-উপাসনার স্থূল অবয়ব মাত্র। যাহারা তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে, তাহারা প্রথমে কোন স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করে, তারপরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়ে ; এবং তাহাতে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সুপারগ হইয়া উঠে। সেইরূপ সাধকগণও প্রথমে দেবতার সূক্ষ্মশক্তি লক্ষ্য করিতে পারে না। কাজেই তদবস্থায় স্থূলরূপ বা জড়ে তাহাদের লক্ষ্য স্থির করিতে হয়। প্রথম দেবমূর্তি অবলম্বন করিয়া তদুপরি ভাবনাস্রোত প্রবাহিত করিতে শিক্ষা করা হয়।

পূজা, আহ্নিক, তপ, জপ এই সকলের মহান্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উহা বালকের ক্রীড়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, কেহ ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্মী, কেহ সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ, কেহ বুদ্ধের মায়াবাদ, কেহ কৃষ্ণের কান্তাপ্রেমের মাধুর্যরস লইয়া একেবারেই ধর্মবিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। জানি, সে-সকল কার্য উত্তম ও সাধনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ;

কিন্তু তাহাতে তোমার কি ? তুমি স্ঁচ গঠনে অক্ষম, কামানের বায়না লও কেন ? তুমি যাহা জান, যেমন সঞ্চয় করিয়াছ, যেমন অধিকারী হইয়াছ, তদ্রূপ কার্য কর। তোমার হৃদয় ক্ষুদ্র, তুমি সান্ত, তুমি তোমার মনের মত মূর্তি গড়াইয়া তাঁহার চরণে তুলসী-চন্দন অর্পণ কর, তাহাতে দোষ নাই। বরং হিন্দুধর্মের সুশৃঙ্খলতায়ই তুমি জ্ঞান-চন্দন, ভক্তি-তুলসী অবগত হইয়া উপাসনার সূক্ষ্ম তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিবে।

ইষ্টনিষ্ঠার জন্যও বেচারী হিন্দুদিগকে কত কথা শুনিতে হয়। অনেকে বলেন, "এক ধর্ম-সম্প্রদায়ে থাকিয়াও শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পরস্পর হিংসা-দ্বেষ কেন ?" হিন্দু ইহাকে একতত্ত্ব অভ্যাস বলিয়া জানে। আমার একটি লোকের জঠরানল-নিবৃত্তির শস্য সঞ্চয় নাই, আমি বিশ্বের তৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি করিলে কি হইবে ? তাই সাধক প্রথমাবস্থায় আপন আপন ইষ্টদেবতাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করেন।

একদা পরম ভক্ত হনুমান শ্রীকৃষ্ণবিদ্যমানে ইষ্টপূজা করিতেছেন দেখিয়া, অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রাম ও কৃষ্ণকে কি পৃথক্ জ্ঞান কর ?" হনুমান হাসিয়া বলিলেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥"

ইহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে।* এইজন্যই শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব; ইহা হইতেই সাধকের ইষ্টদেবতার প্রতি গাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইষ্টনিষ্ঠায় একতত্ত্ব অভ্যাস হইলে যে জ্ঞানবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, ধর্মের সমুদয় ক্ষেত্র তাহার শাখা-প্রশাখা ও শিকড়ে ছাইয়া ফেলিবে, অতএব হিন্দুধর্মে যাহা দেখিবে, তাহার একবিন্দু কুসংস্কার নহে। বরং সভ্য

---

* ইহা প্রকৃত সাধকের উক্তি। যিনি স্বীয় আরাধ্যদেবতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, মুক্তি তাঁহার করতলস্থ। তিনি কেন অন্য দেবতার শরণ গ্রহণ করিতে যাইবেন ? স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি যাহাদের বিশ্বাস নাই,

সমাজের ইংরাজগণ আত্মমূর্তি ও চিত্র গড়িয়া সর্বদাই আপনাকে পূজা করেন, বড় বড় লোককে পূজা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রতিমূর্তি ও চিত্র রক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মে এরূপ স্থূল পৌত্তলিকতা নাই। তবে এক্ষণে তাঁহাদের দেখাদেখি অনেক ইংরাজী-কৃতবিদ্য হিন্দু এইরূপ আত্মপূজা করিতে শিখিয়াছেন।

অবতার ও তীর্থাদির বিষয় না লিখিলেও চলে। কারণ জগতের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় তীর্থ ও অবতার স্বীকার করিয়াছেন। মুসলমানদিগের মক্কা, মদিনা, পেঁড়ো তীর্থস্থান, আর মহম্মদ অবতার। খ্রীষ্টীয় ধর্মেও জর্ডন নদীর জল পবিত্র এবং যীশু ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

দেবতা হইতে খড়-কুটা পর্যন্ত পূজা করিলেও হিন্দুগণ জানেন, পরব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা বা সাকার দেব-দেবীর পূজা-অর্চনাদ্বারা অথবা তীর্থস্থানদ্বারা কিংবা যথেচ্ছাহার বা নিরাহারদ্বারা কখনও মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

তাহারাই তেত্রিশ কোটি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারাই একবার ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, "মাগো কালী! আমাকে উদ্ধার কর।" আবার বাঁদিকে মুখ ফিরাইয়া বলে "বাবা কেষ্ট ঠাকুর! আমাকে গোলোকধামে শিয়ালকুকুর করিয়া রাখ।" আমরা এরূপ সাধনের পক্ষপাতী নহি। সাধকের দৃঢ়তা ও অদ্বৈত-ভাব অতি উপাদেয় অমূল্য বস্তু। স্বর্গীয় পারিজাতকুসুমের সৌরভে তাহা পরিপূর্ণ। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"আমি এমন মায়ের ছেলে নইরে—বিমাতাকে মা বলিব।"

কমলাকান্তের একটি গান আছে,—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব?
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব?"

একজন ব্রাহ্মসাধক বলিয়াছেন :—

"আর কারে ডাকিব গো মা, ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার, ডাকিব গো মা যাকে তাকে।"

এবম্ভূত সাধক ভক্তি-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ হইয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া থাকেন।

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা॥

—পঞ্চদশী ৬।২১

—যেমন স্বীয় স্বপ্ন-অবস্থা নিবারণের জন্য স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোঁকে জুহোতি যজতে
তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।—শ্রুতি

—হে গার্গি! কোন ব্যক্তি অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যদিও ইহলোকে বহু সহস্র বৎসর হোম, যাগ, তপস্যাদি করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

—গীতা, ৭।২৪

—সংসার হইতে অতীত যে আমার শুদ্ধ-নিত্য স্বভাব, অল্পবুদ্ধি লোকসকল তাহা জানিতে না পারিয়া অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আমাকে মনুষ্যাদির ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট জ্ঞান করে।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র

—তমোগুণবিশিষ্ট লোকসকল, এ-তীর্থ ও-তীর্থ এতদ্রূপ ভ্রমেতে আচ্ছন্ন হইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করে। হে বরাননে! তাহারা আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে, অতএব কি প্রকারে তাহাদের মুক্তি হইবে?

বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ

—বায়ু, পর্ণ, কণা ও জলমাত্র পান করিয়া ব্রতধারণে যদি মুক্তিলাভ হয়, তবে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলচর জীব সকলেরই মুক্তি হইতে পারিত।

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ;—

তুলসী তপ জপ পূজা, য়হ্ সব কারিয়োঁ কা খেল।
জব্ পীতম্‌সে সরবর হোঙ্গি, তো রাখ্ পিটারী মেল॥

—তুলসী, তুমি তপ, জপ, প্রতিমা-পূজাদি সমস্তই বালিকাদিগের পুতুলখেলার ন্যায় জানিও। যে পর্যন্ত স্বামীসহবাস না হয়, সেই পর্যন্ত খেলে, তারপর পেটিকায় তুলিয়া রাখে।

শ্রেষ্ঠ সাধক গোবিন্দ চৌধুরী গাহিয়াছেন :—

(মাকে) কে সং সাজালে বল্ তা শুনি।

*   *   *

স্বয়ং স্বয়ম্ভু যাঁর স্বরূপ গঠিতে নারে,
সে শম্ভুদারারে গড়া কুম্ভকারে কি পারে ?
জান ভুবনমোহিনী বামাটি কে,
অঙ্গে দিল উঁহার বা মাটি কে,
তুলিতে স্বরূপ উঁহার তুলিতে কার সাধ না জানি॥

*   *   *

যেন দেবীমূর্তির প্রতিমা দর্শন করিয়া বলিতেছেন, আমার মাকে কে "সং" সাজালে? স্বয়ং শিব যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন না, সে শম্ভুদারাকে কি কুম্ভকারে গঠন করিতে পারে? ঐ ভুবনমোহিনী বামা কে—জান? আমি জানি না, তুলিদ্বারা উহার স্বরূপ চিত্রিত করিতে কাহার সাধ হইয়াছে।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"তুমি লোকদেখানো করবে পূজা,
মা তো আমার ঘুষ খাবে না।"
"এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে,
ধর্ম কর্ম সব ত্যজেছি।"
"শ্যামাপদকোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

শ্রুতি হইতে আধুনিক সাধকগণের উক্তি পর্যন্ত উদ্ধৃত হইল। যে দেশের কৃষক ভূমি চাষ করিতে করিতে, রাখালবালক গরু চরাইতে চরাইতে এই সকল গান করে, সে দেশের লোক ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, আর যাহারা ঈশ্বরকে সেসন-জজের পদে অভিষিক্ত করিয়া দায়রার দরবারে বসাইয়াছে, তাহারা জানে,—এই কথা আত্মাভিমান মাত্র। তবে হিন্দু তপ, জপ, দেবপূজা করে কেন ?—

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে।
কিং তস্য জপযজ্ঞাদ্যৈস্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৭ উঃ

—যাঁহার অন্তরে পরমব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাঁহার জপ, যজ্ঞ, তপস্যা, নিয়ম ও ব্রতাদির প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সাধারণের উপায় কি ? তাই যাহাদের পরজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদের জন্য হিন্দুধর্মের আচার্যগণকর্তৃক জ্ঞানের উপায়স্বরূপ সাকারোপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে। তথাপি তাহা কাল্পনিক নহে। সাকার দেব-দেবী ও পূজাপদ্ধতি বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিলে ব্রহ্ম ও উপাসনার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে।

একেশ্বরবাদ ও কুসংস্কার খণ্ডন

হিন্দুধর্ম শুধু ধ্যান ও স্তব-স্তুতি-পূজার ধর্ম নহে, তাহা সর্ববিষয়ে আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তাহা প্রতি ব্যক্তির শুধু সাধনধর্ম নহে, তাহা পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মপ্রণালীরূপেও বর্তমান। হিন্দুর ঈশ্বর সর্বব্যাপী; এজন্য সর্ববিশ্বকে সাধনা করিয়া হিন্দু ঈশ্বরোপাসনা করেন। কি দেবমন্দিরে, কি পরিবারমণ্ডলে, কি শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে, কি বিবাহে, কি আচার-ব্যবহারে, সর্বস্থলেই হিন্দুধর্মের সাধনা। সমুদয় বিশ্বকে লইয়া এমন দেবোপাসনা বুঝি আর কোন ধর্মে নাই। সমস্ত বৃত্তির সমঞ্জসীভূত সংযমে ও তৃপ্তিতে মানবের ঈশ্বরোপাসনা। তাই হিন্দু সমাজক্ষেত্রে সংসারধর্মসাধনার সহিত ধর্ম-কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে। হিন্দু ধর্মপ্রবৃত্তিতে সর্ববিধ সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্যে প্রবৃত্ত হন। সেইরূপ ধর্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রবৃত্তিসাধন করাইয়া হিন্দুকে ধর্মপথে চিরদিন নিয়োজিত করিয়া রাখা হয়, তৎপরে ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া পরম পুণ্যপথে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে পরম তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হন; সেই তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার মুক্তিসাধন হয়। জ্ঞানী সাক্ষাৎভাবে মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত, হিন্দুসংসারী অসাক্ষাৎভাবে সেইরূপ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। বিষয়কার্যের সহিত ধর্ম মিশাইয়া হিন্দুধর্ম যেমন পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, এমন আর কোন ধর্মপ্রণালী হয় নাই। কি দেবালয়ে, কি পরিবারমণ্ডলে, কি সমাজে, সর্বস্থলেই হিন্দু ঈশ্বরোপাসক।

হিন্দুধর্মের এই সকল মহান্ তত্ত্ব না জানিয়া, হিন্দুকে দেবতাপূজক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অনেকে বিদ্রূপ করেন এবং নিজেদের একেশ্বরবাদ জানাইয়া গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু হিন্দু-ধর্মের সমস্ত সাধনাপথ একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনা। হিন্দু বিশ্বপূজা

করিয়া বিষ্ণুপূজা করেন। হিন্দুগণ জানেন—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

এই জগৎ চরাচর সমস্তই ব্রহ্ম।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষিস্বরূপতঃ॥

—আত্মজ্ঞাননির্ণয়

—যে প্রকার আকাশ এই চরাচর বস্তুসমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্বাহ্যে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—ঈশোপনিষৎ, ৬

—যিনি সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্ববস্তুতে দেখেন, তিনি আর কোন বস্তুকে ঘৃণা করেন না।

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

—মনুসংহিতা, ১২।৯১

—পরমাত্মা স্থাবর, জঙ্গম, সকল ভূতে আছেন এবং পরমাত্মাতে সর্বভূতের অবস্থিতি, এইরূপ সমদৃষ্টির দ্বারা আত্মযাজী ব্যক্তি স্বারাজ্য (মোক্ষ) লাভ করেন।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

—গীতা, ৬।২৯

—যোগাভ্যাসে যাঁহার চিত্ত বশীভূত ও সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ সমদৃষ্টি

হইয়াছে, তিনি পরমাত্মাকে সর্বভূতে বিরাজিত এবং পরমাত্মাতেও সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখেন।

হিন্দুর সংসার ছাড়া ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ছাড়া সংসার নাই; তাই হিন্দুর সন্ন্যাসীও সংসারী। খৃষ্টান বা মুসলমানের ঈশ্বর, হিন্দুদের ন্যায় সর্বব্যাপী ঈশ্বর নহেন। তাঁহাদের ঈশ্বর বিশ্ব হইতে বিভিন্ন এক স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহারা মুখে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলেন মাত্র, কিন্তু কেবল হিন্দু তাঁহাকে সর্বব্যাপিরূপে সর্বত্র দেখেন।—শালগ্রামশিলায় দেখেন; চন্দ্রে, সূর্যে, গ্রহে, নক্ষত্রে, গগনে, মেঘে, সাগরে, নদীতে, গঙ্গায়, গোদাবরীতে, কাশীতে, প্রয়াগে, জলে, স্থলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, বনস্পতি অশ্বত্থে ও বটে—সর্বঘটেই বিশ্বব্যাপিরূপে অনুভব করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। কেহই জড়ের পূজা করেন না, সকলেই জড়ান্তর্গত-শক্তি-নিহিত অভিন্ন পুরুষের পূজা করেন। সর্বঘটে তিনিই বর্তমান বলিয়া হিন্দুর পূজা প্রধানতঃ ঘটে ও পটে। মূর্তি না গড়িয়াও হিন্দু সেই পরমপুরুষকে পূজা করেন। ধান-চালে তাঁহার লক্ষ্মীপূজা; সেখানেও আগে অনন্তের পূজা, তবে দেবীপূজা। হিন্দুর সমস্ত দেবদেবী যুগলরূপধারী। সুতরাং এই দেবদেবীপূজায় অদ্বয় ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্মরূপে বর্তমান। হিন্দু দেখেন, ব্রহ্মেরই অনন্তরূপের ঐশ্বমূর্তি তাঁহার তেত্রিশ-কোটি দেবতা—দ্বৈত জগতের মধ্যে সেই অদ্বৈতের আভাস। পরব্রহ্মের সূক্ষ্ম রূপ প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, স্থূল রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড। তাঁহার ঐশ্বর্যরূপ প্রকৃতি শক্তি মাত্র, যে শক্তিতে তিনি বর্তমান থাকিয়া বিশ্ব লালন, পালন ও শাসন করিতেছেন। সেই লালন-পালনকারিণী শক্তিতে তিনি ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহার নিজের কোন কর্ম না থাকিলেও তিনি সেই প্রকৃতিশক্তিতে শক্তিমান্, সেই প্রকৃতির কর্তৃত্বে তিনি বিশ্বকর্তা, বিধাতা ও নিয়ন্তা—সমস্তই। হিন্দু উপাসনার্থে শক্তি ও শক্তিমানকে অভেদ কল্পনা করেন। জীব যোগবলে ও সাধনবলে তাঁহার

ঐশ্বর্য লাভ করিয়া যখন ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তখন গুণভাব বর্তমান থাকে ; শেষে নিস্ত্রৈগুণ্যসাধনদ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মভাবে উপনীত হন। ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, ক্ষুদ্র নদী অনন্ত সাগরে লীন হয়। এইরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র নদীর গতিপথই আত্মার গতি—অনন্ত সাগরে গতি। তাই হিন্দুদের মূলমন্ত্র—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

তবে কেন বল, হিন্দু পৌত্তলিক, হিন্দু জড়োপাসক, হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক ? হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর, দেখিবে হিন্দুধর্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ, হিন্দুধর্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। কত যুগযুগান্তর হইতে এই ধর্মের বিমল স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে। কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে এই ধর্মের আলোচনা, আন্দোলন ও সাধনরহস্য উদ্ভেদ হইতেছে। এমন উদার, বিশ্বব্যাপক, সার্বভৌম ধর্ম জগতে আর নাই। তোমরা চারিশত বৎসরের সভ্য, তোমাদের জ্ঞান কত ? এখনও জড়ের সাধনা করিতেছ, হিন্দুধর্মের ত্রিসীমানায় পঁহুছিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। তাই বলি, হিন্দুদিগের নিকট ধর্ম শিক্ষা কর, হিন্দুশাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর, হিন্দুধর্মের সামান্য জনগণের আচরিত ধর্ম দেখিয়া, অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় কর্ণে বা পদে হাত দিয়া হস্তিকে কুলা বা স্তম্ভবৎ নির্ণয় করিও না, রসনা কলুষিত হইবে। যখন তোমরা অধ্যাত্মজ্ঞানে পঁহুছিবে, তখন অবশ্য হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে ; তখন হিন্দুধর্মের অমল-ধবল কৌমুদীতে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্লিত হইবে, মর-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া মানব-জীবন সার্থককরণে ও মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে।

হিন্দুধর্ম্মের গৌরব

ভারতের সুখসূর্য আজ অস্তমিত হইয়াছে। আজ সাতশত বৎসর ভারতভূমি বিদেশীয় জাতির দুর্ধর্ষ আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছে। কত জাতি ভারতে প্রভুত্ব করিল, কত জাতি প্রভুত্ব হইতে বঞ্চিত হইল, ভারতের স্বাধীনতা আর ফিরিয়া আসিল না। এখন পরাধীনতাই ভারতের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।* চিররোগী যেমন পার্শ্ব-পরিবর্তন করিতেও ক্লেশ বোধ করে, সেইরূপ ভারতবর্ষ আজ কঠোর পরাধীনতার প্রাচীর অতিক্রম করিয়া এক পা উঠাইতেও যেন কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু ভারতবর্ষের এত যে দুরবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি আজও হিন্দুজাতির জীবনীশক্তি বিনষ্ট হয় নাই। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে হিন্দুদিগকে কত নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, মুসলমান সম্রাট্‌গণ হিন্দুদিগকে মুসলমান করিবার জন্য কত প্রয়াস পাইয়াছিল; কত হিন্দু অকারণে মূর্তিপূজার অপরাধে ভগবৎপদ স্মরণ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল। সুলতান মামুদ কত দেবমূর্তি লুণ্ঠন ও শাস্ত্রাগার ভস্মীভূত করিয়াছিল। মোগল বাদসাহদিগের আমলে পাষণ্ড কালাপাহাড় হিন্দু-দিগের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ পবিত্র পুরুষোত্তমধামে প্রবেশ করিয়া,—লিখিতে বুক ফাটিয়া যায়—জগন্নাথদেবের মূর্তি দগ্ধ করিয়াছিল। আজিও সুসভ্য ইংরাজসুশাসিত দেশে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কতকগুলা নগণ্য চাষা মুসল-মানের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছে।† খৃষ্টীয় গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিয়া হিন্দুবালক খৃষ্টধর্ম শিক্ষা করিতেছে; এদিকে আবার গবর্ণমেণ্টের নানাপ্রকার সাহায্যে পরিপুষ্ট খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। পাদ্রী মেমেরা হিন্দুর

---

* এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।—প্রকাশক

† পাঠকগণ! ১৩১৪ সালের জামালপুর অঞ্চলের ব্যাপার স্মরণ করুন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুকোমলস্বভাবা রমণীগণকে বাইবেলের উপদেশ দিতেছেন। কি নির্বুদ্ধিতা! যাহারা আজীবন "ঠাকুরমার গল্প" শুনিয়া শুনিয়া খৃষ্টানসংস্পর্শে আপনাকে অপবিত্র মনে করিয়া স্নান করে, বাইবেলের দু'পাতা উপদেশে তাহারা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিবে কি? যাহাহউক, এত কষ্ট, এত নির্যাতন সহ্য করিয়াও, এত বিপদের মধ্যে থাকিয়াও নানা প্রলোভনে আজিও ভারতীয় আর্যবংশ বিলুপ্ত হয় নাই। আর্যভারতে পবিত্রতম আর্যভাব এখনও সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই, কখনও সম্পূর্ণ চলিয়া যাইবে বলিয়াও মনে করি না। যতদিন হিন্দুদিগের বেদ-উপনিষদ্ থাকিবে, রামায়ণ-মহাভারত থাকিবে, ততদিন এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুত্ব কখনই চলিয়া যাইতে পারিবে না! আর্যগণের পরিবারমণ্ডলে, হিন্দুর সমাজক্ষেত্রে, আচার-ব্যবহারে, সংসারে, ধর্মসাধনার সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম সংযোজিত বলিয়া হিন্দু-জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সাতশত বৎসর বিজাতীয় সম্রাট্‌গণের অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিয়া একমাত্র হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে আর কোনও জাতি এইরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। প্রাচীন রোমকগণ এখন কোথায়? কতকগুলি দুর্দান্ত পার্বতীয় জাতি সহসা রোমরাজ্য অধিকার করিল, ক্রমে রোমকজাতি আপনাদিগের বিশেষত্ব হারাইয়া কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। প্রাচীন গ্রীকজাতি, তাহাদিগের ধর্ম, তাহাদিগের আচার-ব্যবহার এখন কোথায়? প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম ও আচার-ব্যবহার কোথায় গেল? সে সকলই আজ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণের অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ধন্য হিন্দু! ধন্য তোমাদের ধর্ম!! তোমরা তোমাদের পূর্বগৌরব সব ভুলিয়াছ, কিন্তু ধর্মের মর্যাদা ভুলিতে পার নাই, উপর্যুপরি বিজাতীয় রাজগণের অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াও জাতীয় ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছ।

এখন দেখিতে পাই, কত হিন্দু বিজাতীয়ের জলস্পর্শ না করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন। হিন্দুজাতির ধর্মপ্রাণতার কথা পৃথিবীর কে না জানে? **"ধর্মো রক্ষতি রক্ষকং"** এই মহাবাক্য কখনও মিথ্যা হয় নাই। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্মও হিন্দুকে রক্ষা করিতেছেন। রোমক প্রভৃতি অন্যান্য জাতির পূর্বপুরুষেরা পার্থিব বিষয়লালসাতেই হৃদয় পূর্ণ করিয়া বিষয়-সাধনা করিয়াছিলেন, এইজন্য ধর্মকে লাভ করিতে পারেন নাই। ধর্মের মূল শিথিল ছিল বলিয়া সামান্য বাতাসেই তাহা বিলীন হইয়াছিল। আর হিন্দুগণ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের সাধনা করিয়াছিলেন, তাই হিন্দুদিগের ধর্মের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় বলিয়াই পরাধীনতার প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেও অটল রহিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানকালে একশ্রেণীর হিন্দুজাতি এমনই আত্মমর্যাদা হারাইয়া বসিয়াছেন যে, যতক্ষণ না পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের অমূল্য শাস্ত্রসকলকে ভাল বলিবেন, ততক্ষণ তাঁহারা জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিতে যেন লজ্জা বোধ করেন; সাহেবদিগের ইংরেজী-অনুবাদিত হিন্দুশাস্ত্র হইলে অন্ততঃ একবার চক্ষু বুলাইয়া থাকেন। সর্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রচলনে আজকাল অনেকেই হিন্দুশাস্ত্র অবহেলা করিয়া মার্জিত বুদ্ধি ও উর্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত স্বকপোলকল্পিত মতানুসারে ধর্মসাধন করিতে প্রয়াসী। ইহা মার্জিত বুদ্ধি ও উর্বর মস্তিষ্কের ফল হউক না হউক, পাশ্চাত্য ধর্মের আমদানীতে ও বিজাতীয় সংসর্গে বিকৃত মস্তিষ্কের ফল, তাহাতে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। এখন নূতন বাবুর জাতি নিজের ধর্ম-কর্ম জানেন না, জাতীয় রীতি-নীতি মানেন না, আর্যশাস্ত্র পাঠ করেন না, নিজের সমাজের কোন সমাচার রাখেন না। বরং আপন জাতীয় ধাতু ছাড়িয়া, প্রকৃতি ভুলিয়া, অবস্থা অবহেলা করিয়া পরের ভাবে বিভোর হইয়াছেন। এজন্য বর্তমান সময়ে নানারূপ স্বকপোলকল্পিত মতপ্রবর্তক আসুরী

প্রকৃতির অনেক হিন্দু দেখা যায়। কিন্তু সুবিখ্যাত জার্মাণদেশীয় পণ্ডিত Schopenhaur (সোপেনহোর) বলেন যে, "হিন্দুর উপনিষদ্‌সমূহ তাঁহার ইহ জীবনে শান্তিদান করিয়াছে এবং পরজীবনেও দান করিবে।" আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন, "পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া, হিন্দুর উপনিষদ্‌গুলি থাকিলে কোন ধর্মসম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থের জন্য অভাব অনুভব করিবেন না।" তাই বলি, বাবুর জাতি যতই কেন কৃত্রিমতার আবরণে অঙ্গ আচ্ছাদন করুন, সাহেবেরা "কালা আদমী" ভিন্ন অন্য কিছু বলিবে না। তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহাদের অবিদিত নহে; বীরের জাতি কখনও অম্লপিত্তরোগগ্রস্ত ধাতুক্ষীণ বাবু-জাতিকে সমতুল্য জ্ঞান করিবে না। একজন শিক্ষিত যুবক ইউরোপ আমেরিকাদি ভ্রমণান্তর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া কোন বিশেষ অবসরে বলেন, "তুমি যে কোন দেশে যাইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে, অমনি তাহারা সসম্ভ্রমে তোমাকে নমস্কার করিবে। এ নমস্কার তোমাকে নয়, হিন্দু বলিয়া তোমার জাতীয় ধর্মকে।"

ধর্ম রক্ষা করিবার প্রাণগত চেষ্টা থাকাতেই হিন্দুজাতির যশঃসৌরভ দেশ-বিদেশে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার জন্য হিন্দুজাতিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। তাঁহারা শুধু হিন্দুজাতিকে প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, যেসকল শাস্ত্রের কৃপায় হিন্দুজাতি ধর্ম-ভাবকে এইরূপ পরিপুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই সকল হিন্দু-শাস্ত্রকেও তাঁহারা "কণ্ঠের ভূষণ" "শান্তিবারি" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মোক্ষমূলার ইংলণ্ডপ্রবাসী একজন হিন্দুকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাদিগকে ইংরাজীতে কি শিখাইবে? যদি কিছু শিখাইতে পার তাহা একমাত্র হিন্দুর উপনিষদাদি শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান।" প্রকৃতই আর্যঋষিগণের সাধনফলে, আজ পর্যন্ত এই আর্যশাস্ত্রসকল কেবল হিন্দুজাতিকে নহে—সমুদয় সভ্য-জগৎকে

ধর্মের সুবিমল আলোক প্রদান করিতেছে। হিন্দু সর্ববিষয়ে সকল জাতির অধম হইয়াছে, কেবলমাত্র হিন্দুজাতির ধর্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

হিন্দুদিগের অবনতির কারণ

হিন্দুদিগের অবনতির কারণ কি ?—ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া যাইতে পারে, হিন্দুর অবনতির কারণ—ধর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা বিষয়লালসাতে ধর্মলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা আইন, পদার্থ-বিজ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির উৎকর্ষসাধনে পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পার্থিব বিদ্যাকে আর্যঋষিরা নিম্নপদবী দান করিয়া—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" (মুণ্ডকোপনিষৎ) বলিয়া একমাত্র ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিয়াছেন। শিক্ষাদ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহাকে সম্পাদ্য জ্ঞান বলে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই সম্পাদ্য জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক জ্ঞান, অপর বিজ্ঞান।

মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

—অমরকোষ

—মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে জ্ঞান এবং শিল্প বা শিল্পশিক্ষোপযোগী বস্তু ও বস্তুশক্তি যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাকে বিজ্ঞান বলা যায়।

হিন্দুশাস্ত্রমতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য, অবশিষ্ট গৌণ। তাই ভারতীয় আর্যদিগের পূর্বপুরুষ মুনি-ঋষিগণ পার্থিব বিষয়-লালসা সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া গিরিকন্দর, নদীতীর, গভীর অরণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির সুরচিত নির্জনতম প্রদেশে আত্মগোপন করিয়া অনন্যমনে ব্রহ্মসাধন

করিয়া অনুপম ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। সেই অনুপম ব্রহ্মসাধনোপায় হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই ধর্মচর্চাকেই হিন্দুগণ একমাত্র মানব-জীবনের কর্তব্য জানিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। তথাপি এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন্ দেশে সংখ্যা-গণনার সর্বপ্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল? এই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন্ দেশে আয়ুর্বেদ এবং জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাব ও উন্নতি সর্বপ্রথম হইয়াছিল? ভারতীয় হিন্দু এক সময়ে পৃথিবীর সর্বজাতি হইতে সর্ববিষয়ে উন্নতির চরম স্তরে উঠিয়াছিল। সেই উন্নত অবস্থাই বর্তমান অবনতির কারণ। সেই অবনতির কারণ জানাইবার জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের "বঙ্গদেশের কৃষক" শীর্ষক প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদ বরাত থাকিল।

ফলে ধর্মালোচনা একমাত্র কর্তব্য স্বীকৃত হওয়ায় হিন্দুগণ ঐহিক সুখে নিস্পৃহ হইলেন। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা ও সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে হিন্দু শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই পার্থিব লালসা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ধর্মশাস্ত্রকর্তৃক নিবৃত্তিজনক শিক্ষা প্রচারিত হইল। শিল্প-বিজ্ঞানে কেহ আর তাদৃশ মনোযোগ না করায় তাহা লুপ্ত হইতে লাগিল, কেহ আর তাহা দেখিয়াও দেখিল না। সে-সময় যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া ধর্মসাধনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালের কুটিলা গতির অধঃস্রোতে ভারতবর্ষ বর্তমান শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সকলেই প্রকৃতির গুণে ধর্মামৃত পানে বিভোর থাকিলেন, এদিকে একবারও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। দুরবস্থার আশঙ্কায় বিচলিত না হইয়া সন্তোষ-সুধা পানে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। এখনও সেই সন্তোষের মৌতাত হিন্দু কাটাইতেই পারেন নাই; তাই বর্তমান যুগের অত্যাচার-উৎপীড়ন, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, প্লেগাদি মহামারীর প্রাদুর্ভাব

অকাতরে সহ্য করিতেছেন ; রাজপুরুষদিগের অবৈধ যথেচ্ছাচারপ্রিয়তা নীরবে দেখিয়া যাইতেছেন। অন্য দেশ হইলে অশান্তি-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত ; আইরিশ, রুশীয়গণ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। হিন্দুদিগের দ্বারা কোন কালে কোন কারণে অশান্তি উৎপাদিত হয় নাই। যাঁহারা ধর্মবলে সহাস্যবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন—কোনও পার্থিব কষ্টে তাঁহারা বিচলিত হইবেন কেন ? তাই হিন্দু-কয়েদীদিগেরও মুখে অন্য জাতীয় কয়েদীগণ অপেক্ষা শ্রী ও সদ্ভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চার্লস্ ডার্বিনও ইহা ধর্মের ফল বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি আন্দামান দ্বীপের পোর্টলুই সহরে হিন্দুকয়েদীদিগের মুখশ্রী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা—"Were such noble looking,—." তিনি আরও বলিয়াছেন—"These men are generally quiet and well-conducted ; from their outward conduct, their cleanliness and faithful observance of their strange religious rites, it is impossible to look at them with the same eyes as on our wretched convicts in New South Wales."

(*A Naturalist's Voyage Round the World*)

অতএব ধর্ম হিন্দুকে সর্বকার্যে উদাসীন করায় বিজাতীয়দিগের প্রতিপত্তি ভারতবর্ষে বর্ধিত হইয়াছে। ধর্মবলে বলীয়ান্ বলিয়াই হিন্দুগণ সকলের পদানত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্মই সর্বস্ব। তাই বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা করিয়া অধার্মিক মুসলমানগণ ধর্মপ্রাণ হিন্দু-রাজ্য আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। বিজাতীয় রাজার অধীনতায় হিন্দু-সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় হিন্দুগণ প্রকৃত ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। হিন্দুরাজার অভাবে সকলে স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় উপধর্মের প্রবলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাজে যাঁহারা প্রকৃত বোকা, তাঁহারাই হিন্দু-

সমাজের গুরু-পুরোহিতরূপে ধর্মশিক্ষা দিতেছেন। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা গুরু-পুরোহিতের কার্য ঘৃণিত মনে করিয়া রাজসেবায় ব্রতী হইতেছেন।

একদা আসাম লাইনের ষ্টিমারমধ্যে স্বামী কালিকানন্দকে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ গোস্বামিবংশাবতংস গুরু-ব্যবসায়ী একজন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় অন্নাহার ত্যাগ করিয়াছেন ?"

কালিকানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমি তো মাছ-মাংস দিয়া তিন বেলা প্রচুর আহার করি। এমনকি খ্রীষ্টান, মুসলমানের অন্নও পরিত্যাগ করি না।"

গোস্বামী চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি ? মৎস্য-মাংসে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে, সন্ন্যাসী তো সত্ত্বগুণের সাধক !"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণের জন্ম, আমিও ব্রাহ্মণের সন্তান ; সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্য কি ?"

গোস্বামী বলিলেন, "আধুনিক মতে সর্বজাতির মধ্যে আহার-বিহারের জন্যই বোধ হয় সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন !"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলে সুবিধা হইত না কি ?"

নিকটে একজন শিক্ষিত বৈদ্য বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "গোঁসাই, ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ আর সন্ন্যাসিগণ নিস্ত্রৈগুণ্যের সাধনা করিয়া থাকেন।"

যে জাতির গুরুগণ এমন অগাধ জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের অধোগতির বাকী কি আছে ? অবস্থা অনুকূল হইলে যে আর্য-হিন্দুদিগকে পুনরায় পূর্ব মহিমায় জাগ্রত দেখিতে পাইব, আমাদের সে ভরসা আছে।

হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব

মুসলমান ও খ্রীষ্টানগণের ধর্ম সকাম ; কেননা তাঁহাদের ধর্মসাধনায় স্বর্গপ্রাপ্তিই চরম ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম নিষ্কামতা-মূলক। হিন্দুধর্মের কথা—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ, ১০৯-১১০

—যে পর্যন্ত শুভ বা অশুভ কর্ম ক্ষয় না হইবে, তাবৎ শতকল্পেও মানব মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। যেমন লৌহ ও স্বর্ণ উভয়বিধ শৃঙ্খলেই জীবকে বাঁধা যাইতে পারে, তেমনি পাপ ও পুণ্যদ্বারা জীব সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকে, মুক্ত হইতে পারে না। অথচ এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না।

ইহাই হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ। এই কর্মফলবাদেই হিন্দুধর্মে পাপের শাসন ও পুণ্যের উদ্বোধন। কর্মফলবাদের তাৎপর্য এই যে, সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় এবং দুঃখভোগ হইলে তৎকারণ পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব স্বর্গসুখভোগের পর মানবাত্মা পুনরায় দুঃখভোগ করেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম আত্মার গতিপথ তদূর্ধ্বেও নিয়োজিত করিয়াছেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মপ্রণালী আত্মার গতিপথের শেষ দেখাইয়া দেয়। কারণ সেই সেই দ্বৈতমতে ঈশ্বর মানবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। তাহাতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম সাকার

উপাসনা পর্যন্তই বিহিত হইয়াছে। তাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম "Be perfect as God" বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তাহা মানবাত্মাকে সামীপ্য-মুক্তি পর্যন্তই উঠিতে বলিল, যেন তদূর্ধ্বে আর তাহার গতি হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু জানে—Be God. বেদান্ত বলেন—

"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"—মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন। ইহাই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। খ্রীষ্টীয় প্রভৃতি ধর্মের মত হিন্দুধর্মেরও সম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু তাহা হিন্দুধর্মের খণ্ড-দেশ মাত্র। হিন্দুধর্মেও দ্বৈতবাদ আছে বটে, কিন্তু তাহা অদ্বৈতের সহিত মিশ্রিত হইয়া অদ্বৈতপ্রমুখ হইয়াছে, যেন সেইখানে তাহার শেষ সীমা নহে। হিন্দুধর্মেও সাধক সামীপ্য লাভ করিয়া as God হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাই শেষ গতি নহে; ভক্ত আরও অগ্রসর হইতে পারেন, অগ্রসর হইয়া সারূপ্য লাভ করিয়া ক্রমশঃ নিস্ত্রৈগুণ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যিনি না হইবেন, হিন্দুশাস্ত্র বলিতেছেন, তাঁহার আত্মার গতি সেইখানে আপাততঃ রুদ্ধ থাকিলেও জন্মজন্মান্তরের সাধনায় সে আত্মার চরমমুক্তি একদিন সাধিত হইবে। তখন আত্মা নিজ স্বরূপে উপনীত হইয়া পরম আনন্দধামে আসিবেন। যতদিন এই নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত না হয়, ততদিন আত্মার কিছুতেই সংসারবন্ধন ঘুচে না। সুতরাং হিন্দুধর্মানুসারে মানবাত্মার গতি অনন্ত-পথে, আনন্দ-ধামে। আত্মা বিষয়ানন্দ-সাধনাবলে ক্রমশঃ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া এই পরমানন্দধামে আসে। বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের দ্বারস্বরূপ। কেবল হিন্দুধর্মের সাধনাবলে সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দে পরিণত হইতে পারে। বিষয়ী লোকের আত্মায় বিষয়ানন্দরূপে ব্রহ্মানন্দ আভাসিত আছে মাত্র। কারণ, সংসারের নানা মায়াবন্ধনে সংসারীর আত্মা আবদ্ধ রহিয়াছে; আবদ্ধ থাকাতে আত্মার আনন্দ-স্বরূপ আবরিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা নিজ স্বরূপে

আসিয়া অনন্ত ব্রহ্মানন্দে মিশিয়া যায়। যেমন দীপালোক সূর্যালোকের সহিত মিশিয়া যায়, তেমনি মানবাত্মার আনন্দ অনন্তপূর্ণানন্দময় পরব্রহ্মে মিশিয়া যায়। সুতরাং এই মুক্তিসাধনপথই আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসাধনপথ। এজন্য হিন্দুধর্মের সর্বসাধনাপ্রণালীই—মুখ্যভাবে হউক আর গৌণভাবেই হউক—এই যোগসাধনপথ। এই যোগসাধন-তপস্যা ভক্তিপথে, কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানমার্গে। হিন্দুধর্মের শাস্ত্র এই ত্রিবিধ পথ পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করিয়াছে। হিন্দুধর্মের মত আর কোন ধর্মে আত্মার মুক্তিসাধনপথ এত বিশদরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। তজ্জন্য সেই বিষয়ের পরিচয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব শতমুখে সপ্রমাণ হয়।

এমন হিন্দুধর্মে বীতরাগ হইয়া যে সকল হিন্দু বিজাতির নিকট স্বর্গ-প্রাপ্তিমূলক সকাম ধর্ম শিক্ষা করিতে যান, তাঁহাদিগের দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব? অদূরদর্শী হিন্দুধর্মদ্বেষিগণ হিন্দুধর্মের যে সকল নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তাহারই খণ্ডন ও তাহার বিশাল তত্ত্ব এবং মহান্ উদ্দেশ্য এতক্ষণ বুঝাইয়া আসিলাম। এমন দেবকল্প আর্য-ঋষিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যে সকল অভিনব তত্ত্ব (যাহা অন্যান্য ধর্মে দৃষ্ট হয় না) আবিষ্কার করিয়াছেন, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। সর্বজাতির আদরণীয় ভগবদ্গীতা হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

গীতার প্রাধান্য

হিন্দুধর্মশাস্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিজ গৌরবে, কি হিন্দু কি অহিন্দু সর্বধর্মাবলম্বী জনগণের আদরণীয় হইয়াছে। হিন্দুগৃহে গীতাপাঠ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। একমাত্র গীতার উপর নির্ভর করিলে অন্য কোন শাস্ত্র পড়িবার আবশ্যক হয় না। এক

জীবনে কেহ শাস্ত্র পড়িয়া শেষ করিতে পারে না। কেননা শাস্ত্র অনন্ত কিন্তু জীবন অল্পকালস্থায়ী। এজন্য সকলকে গীতাপাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভগবদ্গীতা মহাভারতীয় ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। বৃহৎ হীরকখণ্ড যেমন শুভ্র মুক্তামালার শোভা সংবর্ধন করে, সেইরূপ ভগবদ্গীতা মহাভারতের শোভা পরিবর্ধন করিতেছে। গীতা সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত এবং একমাত্র ধর্মজ্ঞানের শেষ শিক্ষাস্থল। আজকাল সাহেবেরাও আদরের সহিত গীতাপাঠ করিয়া থাকেন। কয়েকজন সাহেব ও বাঙ্গালী গীতার ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞানিবাক্য নিম্নে সংযোজিত করিলাম। মহাযোগী জ্ঞানময় মহাদেব বলিয়াছেন—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ॥"

ইহার ভাবার্থ—এই গীতার প্রকৃত অর্থ মহেশ্বর, শুকদেব এবং শ্রীধর স্বামী এই তিনজন মাত্র অবগত আছেন। মহাভারতকার ব্যাসদেব গীতার অর্থ জানেন কিনা সন্দেহ। বুঝুন ব্যাপারখানা কি!

বৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে গীতামাহাত্ম্যে আছে—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সর্ববেদবিৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

তদিদং গীতাশাস্ত্রং বেদার্থসারসংগ্রহভূতম্।

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজ-ধর্মপরিত্যাগপূর্বকপরধর্মাভিসন্ধিনমর্জুনং ধর্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ

সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরূপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ।

রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন—

"ভগবদ্গীতা মানে না যে, তার কথা মানিবে কে ?"

বাবু রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছেন—

"কল্পতরু মহাভারত হইতে যে-সকল অমৃত ফল প্রাপ্ত-হওয়া যায়, তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা প্রধান। মহাভারতরূপ খনিতে যে-সকল হীরক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভগবদ্গীতা সর্বশ্রেষ্ঠ।"

মোনিয়র উইলিয়ম (Monier William) সাহেব বলিয়াছেন—"*** in which poem [the Mahavarata] it [the Bhagabadgita] lies inlaid like a pearl contributing with other numerous episodes, to the tessellated character of that immense epic."

এইচ. এইচ, উইলসন্ (H. H. Wilson) সাহেব বলিয়াছেন—"The Bhagabadgita, as is well-known, is a treatise on theology. ** It is a section of the Mahavarata as observed by Schlegel is proved ** to be a genuine and unadulterated work. Schlegel and Wilkins both regard it as a composition of high antiquity."

আমাদের ভালবাসার জিনিসকে অপরে ভাল বলিলে সুখ দ্বিগুণতর হয়; তাই সাহেবদিগের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহাদিগের শাস্ত্রে অধিকার হয় নাই, তাঁহারা নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া খিঁচুড়ি না পাকাইয়া ভগবদ্গীতা পাঠ করিবেন। যদিও বর্তমানে গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিবার বা বুঝাইবার লোক সুলভ নহে, তথাপি ধর্মজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তির সহিত নিত্য গীতাপাঠ করিবেন। মহাত্মাগণ বলেন,

ভক্তিপূর্বক গীতাপাঠ করিলে, আপনা হইতে গীতার প্রকৃত অর্থ সাধকের হৃদয়ে উদয় হয়। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে একমাত্র ভগবদ্গীতাই প্রায় তিন চারি হাজার বৎসর ভারতে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পবিত্র ধর্মস্রোত অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রমাণসমূহ অধিকাংশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

দেহাত্মবাদ খণ্ডন ও আত্মার প্রমাণ

এক ব্রহ্মেরই ভোগজন্য অধ্যাসহেতু সমস্ত জগতে নানারূপ শরীরধারী আত্মা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে—

অন্নময়াদ্যানন্দময়ান্তং পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানং কল্পিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

ব্যষ্টিপুরুষের ন্যায় সমষ্টি আত্মার বা অব্যয়পুরুষ ঈশ্বরের পঞ্চকোষময় দেহ আছে। যথা, (১) পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ও তাহার কার্যাত্মক স্থূল দেহসমষ্টিই অন্নময় কোষ, ইহাই বিরাট্ মূর্তি ; (২) উহার কারণস্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত ও তাহার কার্যাত্মক ক্রিয়াশক্তি সহ প্রাণময় কোষ ; (৩) তাহার নাম-মাত্রাত্মক সমষ্টি-জ্ঞান-শক্তি মনোময় কোষ; (৪) তাহার স্বরূপাত্মক বিজ্ঞানময় কোষ (এই প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানকোষ বা সূক্ষ্ম সমষ্টিই হিরণ্যগর্ভাখ্য লিঙ্গশরীর) এবং (৫) উহার কারণাত্মক মায়া-উপহিত চৈতন্য সর্বসংস্কারশেষ আত্মাই অব্যক্ত নামক আনন্দময় কোষ। সাংখ্যমতে শরীর দুই প্রকার—সূক্ষ্মশরীর এবং স্থূল বা মাতা-পিতৃজ শরীর ; মৃত্যুতে কেবল স্থূল বা অন্নময় শরীর ধ্বংস হয়। জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরের সহিত এ জীবনের ও পূর্বজীবনের সংস্কারগুলিতে বদ্ধ হইয়া প্রয়াণ করে। কারণ-শরীর দেবতার, আর লিঙ্গ-শরীর মানুষের। এই

শরীর পাঁচটি কোষ বা আবরণময়; মৃত্যুতে কেবল অন্নময় কোষ ধ্বংস হয়। মোক্ষলাভে সকল কোষগুলি ধ্বংস হয়। পুরুষ বা আত্মা এই শরীর হইতে ভিন্ন। জীবের ক্রিয়াদর্শনে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। রথের গতি দেখিয়া যেমন সারথির বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ দেহের বিদ্যমানতা ও দৈহিক ক্রিয়াদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আত্মনাস্তিকগণ বলেন—

চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণাদিভ্যঃ সমস্তেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥

—চার্বাক

'গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি প্রত্যেকে মাদক নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য একত্র হইলে ক্রিয়াবিশেষে তদ্দ্বারা সুরা প্রস্তুত হয় এবং তখন তাহার মাদকতা-শক্তি জন্মে। সেইরূপ এই দেহ অবচেতন ভূতসমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেও সমষ্টির পরিণামে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, পৃথক্ কোনরূপ আত্মার অস্তিত্ব নাই। সাংখ্যকার কপিল এ পক্ষকে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তণ্ডুলাদি সুরাবীজ-দ্রব্যসকলের প্রত্যেকেই সূক্ষ্মরূপে মদশক্তি বর্ত্তমান আছে। তণ্ডুল-গুড়াদির পরস্পর সংযোগে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত মদশক্তির আবির্ভাব হয় মাত্র। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, যে পঞ্চভূতে দেহ নির্মিত, তন্মধ্যে চৈতন্যসত্তা সূক্ষ্মভাবে নিহিত ছিল, তাহাদের একত্র সংযোগে চৈতন্যের উন্মেষসাধন হইল। তাহা হইলে প্রকারান্তরে চৈতন্যের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা স্বীকৃত হইল। যদি বল, হরিদ্রা ও চূর্ণযোগে এক নূতন বর্ণ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এ দৃষ্টান্ত সমীচীন নহে; কারণ হরিদ্রা ও চূর্ণের পরস্পর সংযোগে বর্ণের বিলোপ না হইয়া যখন বর্ণান্তরের উৎপত্তি হয়, তখন জড়ভূতনিচয়ের পরস্পর মিলনে তো জড়-ধর্মান্বিত বস্তুর উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব; কিন্তু তাহা না হইয়া তদ্বিপরীত ধর্মাক্রান্ত চৈতন্যেরই উদ্ভব হইয়া

থাকে। সুতরাং দেহ চৈতন্য নহে। গুড়-তণ্ডুলাদির সংযোগে মদশক্তির ন্যায় মানুষের দেহে যদি ভূতসমষ্টিতে চৈতন্য জন্মিত, তবে তাহা এক প্রকারের হইত এবং দেহাবয়ব পরিবর্তনে সে জ্ঞানেরও ধ্বংস হইত। আবার পূর্বশরীরে উৎপন্ন সংস্কারসকল পরবর্তী শরীরে সংক্রান্তও মনে করিতে পার না, কেননা, তাহা হইলে মাতা কর্তৃক অনুভূত বস্তু গর্ভস্থ শিশুরও স্মরণ হইত। মাতা যাহা দেখিয়াছিলেন, মাতার শরীর হইতে উৎপন্ন সন্তান সে-সকল বস্তু কেন স্মরণ করিতে পারে না? অতএব দেহ চৈতন্য নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্য—আত্মা।

মন, প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণও আত্মা নহে; মন আত্মা হইলে আমরা জ্ঞান-সুখাদি অনুভব করিতে পারিতাম না। কারণ—

ত্বঙ্মনঃসংযোগো জ্ঞানসামান্যে কারণম্।

—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের (রূপ-রসাদি) সন্নিকর্ষ হইয়া মনের সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

মন আত্মা হইলে যুগপৎ দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত। কিন্তু সকলেই অনুভব করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্যদর্শনও স্বীকার করিয়াছে যে, এককালে দুই বিষয়ে মনঃসংযোগ করা যায় না। জ্ঞানসকলের যুগপৎ অনুপপত্তিহেতু মন বিভু বা ব্যাপনশীল পদার্থ নহে, সুতরাং মন অণুপদার্থ। অতএব মনের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। যদি মনই অপ্রত্যক্ষ হইল, তাহা হইলে জ্ঞানসুখাদি মনের গুণসমূহ অপ্রত্যক্ষ হইবে অর্থাৎ চাক্ষুষাদি মানস পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবে না। আমাদের মন ব্যতীত এক ব্যাপনশীল আত্মা আছে, জ্ঞান-সুখাদি উহারই গুণ, মনরূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উক্ত জ্ঞান-সুখাদির অনুভব হয়।

ইন্দ্রিয়গণও আত্মা হইতে পারে না। কেননা, তাহা হইলে কোন ইন্দ্রিয়ের বিনাশে তদিন্দ্রিয়জনিত অনুভবের স্মরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে; বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা দর্শন-শ্রবণ ভিন্ন সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান জন্মে না।

অতএব সুখ-দুঃখাদির অনুভবের নিমিত্ত এক অতিরিক্ত অন্তরেন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। সেই অন্তরেন্দ্রিয়ই মন, এবং মনের সাহায্যে যিনি সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন, সেই কর্তাই জীবের আত্মা।

প্রাণও আত্মা নহে। শাস্ত্র বলে—

আত্মন এব প্রাণো জায়তে যথৈষা পুরুষচ্ছায়া তস্মিন্ এতদাততম্ মনঃকৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে।—শ্রুতি

—আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে; যেমন পুরুষের ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই প্রাণ অবলম্বিত। মনের সংকল্পমাত্রেই প্রাণসকল এই শরীরে আগমন করিয়াছে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক টেট্ (Professor Tait) "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি" সম্বন্ধীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ভৌতিক তত্ত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণপদার্থ কি, জানিলেও জানা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি যে অসম্ভব, তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* অতএব সর্বপ্রকারেই স্থির হইতেছে যে প্রাণ আত্মা নহে, প্রাণ হইতে আত্মা পৃথক্।

আবার চক্ষুরাদির করণত্ব অস্বীকার করিয়া স্বতঃপ্রকাশ জ্ঞান-সমষ্টিকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না। কেননা, জ্ঞানের সমষ্টি বলিলে পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের স্মরণ ও বর্তমান জ্ঞান এই দুইয়ের সমষ্টি বুঝা যায়, কিন্তু পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের স্মরণ কে করিল? আর জ্ঞানসমূহ কাহার নিকটই বা সদৃশ এবং কাহার নিকটই বা বিসদৃশরূপে প্রতীত হইল? অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রিয়ামাত্রেরই কর্তা আছে।

* **But let no one imagine that, should we ever penetrate this mystery, we shall, thereby, be enabled to produce, except from life, even the lowest form of life.—*Recent Advance in Physical Science.* (*P* . 24)**

ক্রিয়ার কারকই কর্তা, সুতরাং জ্ঞানেরও জ্ঞাতা আছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামতি জন ষ্টুয়ার্ট মিলও (John Stuart Mill) উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি। —ন্যায়দর্শন

—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান আত্মার গুণ।

এতাবতা প্রমাণিত হইল, সুখ, দুঃখ, জ্ঞানাদি শরীর বা ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম নহে। অতএব বাধ্য হইয়াই দেহে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১

—সুন্দর পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের সখা। তাঁহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) সুস্বাদু ফল ভোগ করেন, অন্য (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

—শ্রুতি

—একদেব সর্বভূতে গূঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল ও নির্গুণ।

যদি বল, সে আত্মাকে দেখিতে পাই না কেন, কিরূপভাবে তিনি দেহে বর্তমান আছেন? শাস্ত্রেই ইহার উত্তর আছে। যথা—

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়ে ঘৃতম্।
দেহমধ্যে তথা দেবঃ পাপপুণ্যবিবর্জিতঃ॥

কাষ্ঠের ভিতর অগ্নি, পুষ্পে গন্ধ, দুগ্ধে ঘৃত যেরূপ ভাবে আছে, সেইরূপ দেহমধ্যে আত্মা আছেন।

দুগ্ধ হইতে মন্থন করিয়া যেমন নবনীত উত্তোলিত হয়, সেইরূপ সাধনদ্বারা আত্মা দর্শন করা যায়। কাষ্ঠ ভেদ করিলে সেই কাষ্ঠগত বহ্নি যেমন পরিদৃশ্যমান হয় না, সেইরূপ শরীর ছেদন করিলে উহাতে আত্মদর্শন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৌশলক্রমে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তন্মধ্যস্থিত অগ্নি নিষ্কাশিত ও নিরীক্ষিত হয়, সেইরূপ যোগবল আশ্রয় করিলেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। বৃক্ষবীজে প্রকাণ্ড বৃক্ষটি সূক্ষ্ম অবস্থায় নিহিত আছে, স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় না বলিয়া তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেননা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে তাহা দৃষ্ট হয়। চিনিপানায় মিষ্টত্ব দেখিতে না পাইলেও যেমন চিনিপানা পান করিলে তাহার মিষ্টত্ব অনুভূত হয়, সেইরূপ স্থূল দৃষ্টিতে আত্মাকে দেখিতে না পাইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মা সাধনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সাধকের দৃশ্য হন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।—গীতা, ১০।২০

—হে গুড়াকেশ! আমি সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণস্থিত আত্মা।

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াম্।

—কঠোপনিষৎ, ২।২০

—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, মহৎ হইতে মহৎ আত্মা প্রাণিসমূহের হৃদয়ে অবস্থিত।

অতএব আত্মা যে আছে এ কথা নিশ্চিত, কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহা জানিতে পারে না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।

যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥

—গীতা, ১৫।১১

ধ্যানদ্বারা প্রযতমনা বিশুদ্ধচিত্ত যোগিগণই আত্মাকে দেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে দেখিতে পান, কিন্তু যাহারা অবিশুদ্ধচিত্ত সুতরাং মন্দমতি, তাঁহারা শাস্ত্রাভ্যাসাদিদ্বারা সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মার দর্শন পান না।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

—কঠোপনিষৎ, ২।২৩

—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন বা মেধা (গ্রন্থার্থধারণাশক্তি) কিংবা বহু শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা লাভ করা যায় না।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

—কঠোপনিষৎ, ২।২৪

—দুশ্চরিত হইতে অবিরত, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্তমানস-ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারাও (সামান্যজ্ঞানে) আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

অতএব এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, দেহ বা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় অথবা মন, প্রাণ ও জ্ঞানসমষ্টি ইহারা আত্মা নহে, দেহাতিরিক্ত চৈতন্যই আত্মা। যাহারা আত্মজ্ঞানবিমূঢ়, তাঁহারা আত্মাকে কোন অবস্থাতেই দেখিতে পাইবেন না। কেবল অধ্যাত্মযোগদ্বারা—

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।—মুণ্ডক-শ্রুতি

যিনি হিরণ্ময় হৃদয়কোষে অবস্থিত, যিনি দিব্যজ্যোতিঃতে নিজগৃহরূপ হৃদয়কে হিরণ্ময় করিয়াছেন, সেই দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন নির্মল আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাত্মযোগেই জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়। এই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আত্মদর্শন ঘটে। সেই জ্ঞানচক্ষু যাঁহাদের নাই, তাঁহারা কাজে-কাজেই জড়বাদী, না হয় দেহাত্মবাদী হইয়া পড়েন। এই জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের উপদেশবাক্যে যাঁহারা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাদেরই কিয়দংশ আত্মজ্ঞান লাভ এবং আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন হয়।

নতুবা সামান্ত ব্যবহারিক বুদ্ধিতে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। অধ্যাত্ম-যোগ দ্বারা বিবেক লাভ হয়, বিবেকলাভেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়।

দ্বৈতাদ্বৈত-বিচার

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ লইয়া বহুদিন যাবৎ বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল হইয়াছে ও হইতেছে। উভয়বাদীই আপন আপন মত সমর্থনের জন্য বহু যুক্তি-প্রমাণ দেখাইয়াছেন। সেই যুক্তি-প্রমাণানুসারে আর্যশাস্ত্রগুলি বিশ্লেষণ করিলে জানা যায়, কতকগুলি শাস্ত্রে দ্বৈতবাদ, কতকগুলি শাস্ত্রে অদ্বৈতগর্ভস্থ দ্বৈতবাদ এবং কতকগুলি শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রত্যেক বাদের প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাউক।

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।

—কঠোপনিষৎ, ৩।১

—শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে গুহামধ্যে দুইজন প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তন্মধ্যে একজন অবশ্যম্ভাবী কর্মফল ভোগ করেন, অপর একজন তাহা প্রদান করেন।

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু॥

—মনুসংহিতা, ১২।১৩

—অন্তরাত্মা নামে একটি স্বতন্ত্র আত্মা প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের সঙ্গে জন্মে, তাহাই সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

—গীতা, ১৫।১৬, ১৭

—লোকে দুই প্রকার পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, এক ক্ষর অন্য অক্ষর। সকল পদার্থ ক্ষর, আর কূটস্থ (জীবাত্মা) পুরুষ অক্ষর বলিয়া উক্ত হন। কিন্তু অন্য (ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতিরিক্ত) এক পুরুষ আছেন, তিনিই উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা শব্দের বাচ্য। তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই ত্রিলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এই ত্রিলোককে পালন করেন।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলিতে স্পষ্টই দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন হইতেছে।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং ন জানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥

—কুলার্ণবতন্ত্র, ৫।১।১১০

—কেহ কেহ দ্বৈতপক্ষ এবং কেহ কেহ অদ্বৈতপক্ষ প্রতিপন্ন করেন; কিন্তু উভয়েই আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। যাহা আমার প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা দ্বৈত বা সম্পূর্ণ অদ্বৈত এই উভয় ভাব-বিবর্জিত, অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মিশ্রিত ভাবই আমার প্রকৃত তত্ত্ব।

দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপিচাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥

—দক্ষস্মৃতি, ৭।৪৮

দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ইহার মধ্যে শুদ্ধ দ্বৈত কি শুদ্ধ অদ্বৈত এরূপ নহে, দ্বৈতাদ্বৈতই পারমার্থিক। দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত জ্ঞান কিরূপ ?— পরমাত্মা ও আত্মা পৃথক্ বটে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবলীলা করিতেছেন, ইহাই দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিতবাদীরা বলিয়া থাকেন।

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

—যে পরম ব্রহ্মে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, সেই পরম ব্রহ্মই উপাস্য দেবতা।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৪

—প্রণব ধনুস্বরূপ, আত্মা শরস্বরূপ এবং ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ বলিয়া উক্ত হন। প্রমাদশূন্য হইয়া পরব্রহ্মকে বিদ্ধ করতঃ শরের ন্যায় তন্ময় হইবে। লক্ষ্যবস্তুতে শর যেমন সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মে তন্ময় হইবে।

এই শ্লোকগুলিতে দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিতবাদই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিভাসত এবেদং জগন্ন পরমার্থতঃ।

—যোগবাশিষ্ঠ, স্থিতি প্রঃ

এই জগৎ কেবল প্রতিবিম্বমাত্ররূপেই প্রতিভাসমান হয়, পরমার্থতঃ জগৎ বস্তু নহে।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ।
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥

—শ্রুতি

একই আত্মা সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, কেবল জলগত চন্দ্রের ন্যায় বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন। তিনি নিত্য, সর্বব্যাপী, কূটস্থ এবং দোষবর্জিত। তিনি এক হইয়াও কেবল মায়াশক্তিদ্বারা বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন।

জলপূর্ণেষ্বসংখ্যেষু শরাবেষু যথা ভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং তদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে॥

—শিবসংহিতা, ১।৩৬

—বহুসংখ্যক জলপূর্ণ বহু শরাবে এক সূর্য যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুসংখ্যক বলিয়া দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েন, এক আত্মাও সেইরূপ মায়াবচ্ছিন্ন হইয়াই বহুসংখ্যক বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন। অর্থাৎ সূর্যবিম্বের ন্যায় আত্মার দ্বিত্বভাব নাই।

রূপকার্যসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ।
আকাশস্য ন ভেদোঽস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ॥

—শ্রুতি

—একই আত্মাতে অজ্ঞানতাবশতঃ নানা প্রকার ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমনএকই আকাশ, ঘটাকাশ পটাকাশাদিরূপে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বলিয়া নির্ণীত হয়, সেইরূপ ব্যবহারজন্য নানাবিধ জীবসকল কল্পিত হইয়া থাকে।

উপাধিষু শরাবেষু যা সংখ্যা বর্ততে পরম্।
সা সংখ্যা ভবতি যথা রবৌ চাত্মনি সা তথা॥

—শিবসংহিতা, ১।৩৭

—যেরূপ এক সূর্য বহুসংখ্যক শরাবরূপ উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যানুসারে বহুসংখ্যবৎ প্রতীয়মান হয়েন, আত্মাও সেইরূপ বহু উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যানুসারেই বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

—গীতা, ১৮।৬১

—হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল ভূতের এবং সকল প্রাণীর হৃদয়মন্দিরে স্থিত হইয়া যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভূতগণকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন।

এইসকল শ্লোক দৃঢ়ভাবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতেছে।

এক্ষণে কথা এই—এক হিন্দুধর্মশাস্ত্রে এই ত্রিবিধ মতবিরোধের কারণ কি? শাস্ত্রেই তাহার মীমাংসা আছে—

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ।
উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমনুকম্পয়া॥

—শ্রুতি

জগতে উত্তম, অধম ও মধ্যম-ভেদে তিন প্রকার অধিকারী আছে। যাঁহারা উত্তম অধিকারী, তাঁহারা উপাসনা করেন না। যাঁহারা সংসারাসক্ত তাঁহারা অধমাধিকারী এবং যাঁহারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী, তাঁহারা মধ্যমাধিকারী। মধ্যম ও অধম অধিকারী,—কেবল তাঁহাদিগের জন্যই উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে। উপাস্য ও উপাসক না হইলে উপাসনা হইতে পারে না। সুতরাং ধর্মের প্রথম স্তরের সাধকগণের ভক্তি আকর্ষণ ও কর্মযোগে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শাস্ত্রে দ্বৈতবাদমূলক উপদেশ করা হইয়াছে। ভক্তিশাস্ত্রমাত্রেই দ্বৈতবাদে পূর্ণ। মহম্মদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্মও দ্বৈতবাদমূলক। অবিবেকী সামান্য জনগণের নাস্তিকতা নষ্ট করিয়া ভক্তির উৎকর্ষসাধনজন্যই দ্বৈতমতানুসারে উপদেশ দান করিতে হইবে। এইরূপ উপাস্য ও উপাসক-সম্বন্ধানুসারে ধর্মাচরণ দ্বারা চিত্তকে পবিত্র করিতে থাকিলে এমন এক অবস্থা আসে, যে অবস্থায় সাধক আত্ম-কর্তৃত্বের জ্ঞান হারাইয়া ঈশ্বরকর্তৃত্বই অধিকতর অনুভব করিতে চাহেন এবং আপনাকে উপাস্যতে (পরমাত্মাতে) অধিষ্ঠিত অনুভব করেন। কিন্তু এ জ্ঞানও অতি সঙ্কীর্ণ। যথা—

উপাসনাশ্রিতো ধর্মো যস্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
প্রাগুৎপত্তেরজং সর্বং তেনাসৌ কৃপণঃ স্মৃতঃ॥

—শ্রুতি

—উপসনাগত ধর্ম অবলম্বন করিয়া যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাস্য এবং আমরা উপাসক, এইরূপ দ্বৈতবাদে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মবিদ্ যোগিগণ কৃপণ বলেন, কেননা ইহা অতি সঙ্কীর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বের কিছুই জানিতে পারেন নাই। কারণ, এ ভাবে দ্বৈতজ্ঞান আছে, অথচ দ্বৈতজ্ঞানের উপশম করাই বেদান্তের প্রকৃত মর্ম। বহুদিন ধরিয়া সমাধি অভ্যাসের পর নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে অদ্বৈতজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তাই কশ্চিদাচার্য বলিয়াছেন—

অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ
শিবোঽয়ং পূজেয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি।
ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘং
শিবঃ কঃ পূজা কা গুরুরপি চ কঃ কোঽহমিতি চ॥

—তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বে ইনি আরাধ্যদেব শিব, ইনি তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু, আরাধ্যদেবের ইহাই পূজা এবং আমি পূজক, প্রথমতঃ এইরূপ ভেদের গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, আত্মা অদ্বৈত ও গুণাতীত ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান হইবেন। তখন শিবই বা কে, পূজাই বা কি, গুরুই বা কে, আর আমিই বা কে? তখন আর অন্য কোন ভাবের উদয় হইবে না, কেবল তূষ্ণীম্ভাব আসিয়া জীবকে আশ্রয় করিবে।

সংসারী ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ও বিবেকযুক্ত না হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। কারণ, পরাৎপর পরমাত্মা অবিবেকী ব্যক্তির নিকট দ্বৈতভাবেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন। বাল্যকালাবধি দ্বৈতজ্ঞান আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা কঠোর সাধন ও বিবেক ব্যতীত উল্টাইয়া ফেলিবার উপায় নাই। সাধনদ্বারা দ্বৈতভাব ফিরাইয়া অনেক কষ্টে অদ্বৈতভাবে পরিণত করিতে হয়। বস্তুতঃ "সমস্ত বস্তু যে এক", এ জ্ঞান কি সহজে ধারণা করা যায়? এজন্য শাস্ত্রকারগণ তাহার

উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বৈতজ্ঞানকে অদ্বৈতজ্ঞানে আনিবার জন্য সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝাইয়া অবশেষে একত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রথমে সৃষ্টি ও স্রষ্টা বা জগৎ ও ব্রহ্ম এই দ্বৈত-বাদ স্থাপন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া অবশেষে শিবশক্তির একত্র সম্মিলন দেখাইয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া-ছেন। পুনরায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা উপাস্য ও উপাসক, এই দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান দ্বারা অদ্বৈতবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন। পরিশেষে সাকার ও নিরাকার ভাব অবলম্বনপূর্বক দ্বৈতবাদ স্থাপনপূর্বক সাকারকে পুনরায় নিরাকারে লয় করিয়া অদ্বৈত-বাদ দেখাইয়াছেন। ইহা হিন্দুদিগের গভীর গবেষণার ফল, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

হিন্দুধর্ম সর্ববিধ অধিকারীর জন্য উপদিষ্ট হওয়ায় এরূপ মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কেননা, যাঁহার যতটুকু জ্ঞানসঞ্চয় হইয়াছে, যিনি যেরূপ অধিকারী হইয়াছেন, তিনি ততটুকু অভ্রান্ত মনে করিয়া আপন মত-প্রচারে প্রয়াসী। শাস্ত্রে সর্ববিধ অধিকারীর উপযোগী উপদেশ থাকায় তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণের অভাব হয় না। এজন্য দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত-গর্ভস্থ দ্বৈতবাদ হিন্দুশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের উপায় মাত্র। আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে অন্যরূপ বোধ হয়। গীতায় ভগবান্ নিম্নাধিকারী জনগণের সাধনামূলক উপদেশে অর্জুনের নিকট দ্বৈতবাদ দেখাইয়া আবার স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।

—গীতা ১০।১২

—হে গুড়াকেশ! আমি সর্বভূতের অন্তঃকরণস্থিত আত্মা।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

—যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহার চিত্ত সমাহিত এবং যিনি সর্বদা এই ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভূত দর্শন করেন।

সিদ্ধ রামপ্রসাদ শক্তি-উপাসক হইয়াও অদ্বৈতভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাই গাহিয়া গিয়াছেন—

"প্রথমে মূলা প্রকৃতি, অহঙ্কারে লক্ষকোটি।"

বেদ আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা॥

—শ্রুতি

—যে ব্যক্তি সকল ভূতে আত্মদর্শন করেন এবং আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। অন্য আর কোন উপায়ে পরম ব্রহ্ম পাওয়া যায় না।

অতএব এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, অদ্বৈতবাদই হিন্দুশাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। তবে যতদিন সে জ্ঞানে পৌছান না যায়, ততদিন দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতমিশ্রিত জ্ঞানে উপাসনা করা কর্তব্য। এই অদ্বৈতজ্ঞান শাস্ত্রপাঠে বা তর্কদ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল একমাত্র উপাসনার পরিপক্কাবস্থায় নির্বিকল্প সমাধিযোগে তাহা লাভ হইয়া থাকে। অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, অন্য কোন প্রকারে জীবাত্মা পরামুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

বর্ত্তমান কালে অস্মদ্দেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি তাঁহাদের নিজকৃত গ্রন্থে দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতগর্ভস্থ দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে অনেক পরিশ্রম

করিয়াছেন এবং তদনুকূলে হিন্দুধর্মশাস্ত্র হইতে প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া বাহাদুরী দেখাইবার কারণ কি—বুঝিতে পারা যায় না। তুমি ও আমি যে ভিন্ন, এ জ্ঞান স্বভাবজ। দ্বৈতজ্ঞান বুঝাইতে শাস্ত্রকার মুনি-ঋষিগণ যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, এ কথা বালকেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে ?

অভেদপ্রত্যয়ো যস্তু জীবস্য পরমাত্মনা।
তত্ত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভির্মতঃ ॥

—স্মৃতি

জীবাত্মাতে পরমাত্মার অভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। বেদ, তন্ত্রাদি শাস্ত্রেরও এই মত। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি দ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়া জীবকে কোন্ জ্ঞানে লইয়া যাইবে ?—কেহ বা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যটির কর্মধারয় সমাসের পরিবর্তে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া (তস্য+ত্বম্+অসি=তত্ত্বমসি, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে বিভক্তির লোপ হইয়া তস্য শব্দ তৎ হইয়াছে) দ্বৈতবাদ সমর্থন করেন। একটি শব্দকে ব্যাকরণের কল্যাণে নানাবিধ অর্থে পরিণত করা যাইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহা কি প্রকৃত জ্ঞান ? সাধক সাধনায় যাহা উপলব্ধি করেন, তাহাই সত্য। যাঁহারা কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে যান, তাঁহারা ভ্রান্ত। নিজে ভ্রমে পতিত হইয়া নানাবিধ উপায়ে অপরকেও ভ্রমজালে জড়িত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক যাঁহারা সাধক, যাঁহারা উপাসনাশ্রিত ধর্মসাধন করিয়া থাকেন, সাধকাবস্থায় তাঁহারা নিশ্চয়ই দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদানুসারে সাধন করিতে করিতে যখন—"অত্রাত্মব্যতিরেকেন দ্বিতীয়ং নো বিপশ্যতি"—সাধক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে দেখেন না, এই অবস্থাপ্রাপ্তির

নাম প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান। এই অবস্থায় সাধক সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন এবং স্পষ্ট দেখিতে পান যে দ্বৈতবস্তু যাহাকিছু, সেই সমস্তই এক ব্রহ্মশক্তির প্রতিবিম্ব মাত্র। বস্তুতঃ সাধকের সে অবস্থা বর্ণনা করা অতীব সুকঠিন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা (দ্বৈত বা অদ্বৈত) এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিরাট তর্কজাল বিস্তার করেন, তাঁহাদের জ্ঞান মিথ্যা প্রলাপ মাত্র।

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থাদ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥

—মাণ্ডূক্য

নানাবিধ শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায়, অদ্বৈতই পরমার্থ এবং দ্বৈত সেই অদ্বৈতের কার্য। যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখন দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না। যাঁহারা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা ভ্রান্ত; কারণ, শ্রুতিতে উক্ত আছে যে **'একমেবাদ্বিতীয়ম্'**—সেই পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়, সুতরাং অদ্বৈত বৈদিক মত সর্বথা অবিরুদ্ধ।

কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ

পরমেশ্বর ও পরলোক লইয়াই ধর্ম। জন্মান্তর ও পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ কিসের জন্য ধর্ম করিবে? ইহলোকের সঙ্গে-সঙ্গেই যদি মানুষের সকল সম্বন্ধ মুছিয়া যায়, মানুষের সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়, তবে যম, নিয়ম, উপাসনাদির আবশ্যক কি? কঠোর সংযম-তপস্যা-বিধানের প্রয়োজন কি? এতদ্দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জন্মান্তর ও জন্মান্তরীয় কর্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসে হৃদয় বাঁধিয়াই হিন্দুসতীকুল পতিপ্রেম বুকে করিয়া পরলোকে বা পরজন্মে

পতির সঙ্গে মিলনের জন্য জলন্ত চিতায় মৃত পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিতেন। এই বিশ্বাসের বলেই ভারতী যনরগণ বিপন্নার্তিহর; জড়দেহ বলি দিয়া শরণাগতরক্ষণে প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের নিকট সে-সকল কবিকল্পনা আর কাব্যের অলঙ্কার। বর্তমান শিক্ষাবিভ্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষিত সমাজ হইতে যেন এই বিশ্বাস কর্পূরের মত উবিয়া যাইতেছে। যদি জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় কর্মফলভোগ প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জাগরূক থাকিত, যদি আমরা অধ্যাত্মজীবনের কথা, পরলোকের কথা, কর্মফল-জনিত অদৃষ্টের কথা ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতির তলে না চাপিয়া ফেলিতাম, তবে কখনই ইহজীবনে পাপের আগুন জ্বালিয়া, দানবী-দীপ্তিপূর্ণ চাহনিতে বাসনার বসাহুতি লইয়া দাঁড়াইতাম না।

আবার খৃষ্টীয়ান ও মুসলমানের ধর্মও জন্মান্তর স্বীকার করেন না, কিন্তু স্বর্গাদি লোকান্তর স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "মানুষ মৃত্যুর পর পাপ বা পুণ্যানুসারে অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে গমন করে। তবে এমন হইতে পারে যে, পাপ ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে যাহার পরিমাণ অল্প, অগ্রে সেই লোকে বাস করিয়া পশ্চাৎ অনন্ত নরকে বা অনন্ত স্বর্গে যাইবে।" কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও অবিচার আরোপ করা হয়। কেননা, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে। যাঁহাকে "দয়ার সাগর" বলি, তিনি যে এই অল্পকালপরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্ত-কালস্থায়ী দণ্ডবিধান করিবেন, ইহা অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে?

অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্তকালের জন্য স্বর্গ-নরক-ভোগ বিহিত হইতে পারে না। পরব্রহ্মে লীন হওয়াও সম্ভবপর নহে, কেননা স্বর্গ-নরকে জ্ঞান-কর্মাদির সাধনা হয় না। তবে আত্মা কোথায়

যায় ? আবার সংসারপানে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে জগতের কোথাও সমতা নাই। বিবিধ বিষয়-বাসনা-বিজড়িত অনন্ত সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসারে অসংখ্য লোকসকল ইহলোকে কেহ নানা সুখ ভোগ করিতেছে, কেহ দুঃখ-দুর্দশায় কষ্ট পাইতেছে, কেহ আজীবন সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবর্ধিত হইয়া আনন্দে উৎসাহে উজ্জীবিত হইয়া আমোদ সম্ভোগ করিতেছে, কেহ রোগে-শোকে জর্জরিত হইয়া মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছে। কেহ ধনীর গৃহে সুখের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাসুখে বাল্য-যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্ধক্যে সংসার-সাগরের উত্তাল-তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত হইতেছে। কেহ আমরণ বৃক্ষতলবাসী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা উদরপূর্তি করিতেছে। কাহারও দুধে চিনি, কাহারও শাকান্নে বালি, এইরূপ বিবিধ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি ? অনন্ত করুণানিধান ন্যায়বান্ ভগবান্ পক্ষপাতপরিশূন্য। তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, সুখী-দুঃখী সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া সমান স্নেহ বিতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট আত্ম-পর নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে বৈষম্য নাই—পক্ষপাত নাই। তবে সৃষ্টিরাজ্যে এ বৈষম্যের কারণ কি ? কারণ—অদৃষ্ট। এই অ-দৃষ্টপূর্ণ অদৃষ্ট কি ? অদৃষ্ট আর কিছুই নয়, স্ব স্ব পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, "কর্মদোষেণ দরিদ্রতা।" এই কর্মক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে কর্মের অধীন। গত জন্মে মানুষ যেমন কর্ম করিয়াছে, বর্তমান জন্মে সেই কর্মই অদৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ফল প্রদান করিতেছে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

কর্মণা সুখমশ্নাতি দুঃখমশ্নাতি কর্মণা।
জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বর্ততে কর্মণো বশাৎ॥

—মানুষেরা কর্মদ্বারা সুখভোগ করে, কর্মদ্বারাই দুঃখভোগ করে, কর্মবশেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে, কর্মদ্বারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে

এবং কর্মবশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুই বৎসরের কোন একটি শিশুকে রোগ-যন্ত্রণায় বিকৃতাঙ্গ দেখিলে উহা কর্মফল ভিন্ন কোন্ নির্বোধ পাষণ্ড বলিবে যে, ভগবান্ উহাকে কষ্ট দিতেছেন? এই সমস্ত কারণে আর্য-জাতির জন্মজন্মান্তরবাদে দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং এই পূর্বজন্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসহেতু কি পরলোক, কি আত্মা, কি ঈশ্বর—হিন্দুর নিকট এ-সমস্ত বিষয় স্বতঃসিদ্ধ। হিন্দুধর্মের এ বড় সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন যে, এ জগতের কোন পদার্থের একেবারে ধ্বংস নাই। হিন্দুধর্মেরও সেই মীমাংসা। যদি স্থূলদেহের ধ্বংস না হয়, তবে কামনাময় সূক্ষ্ম মানস-শরীরের ধ্বংস হইবে কেন? স্থূলদেহের পদার্থসকল মৃত্যুর পর সমজাতীয় পদার্থে মিলিত হয় মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে যখন স্থূলদেহের বিনাশ হইতে থাকে, তখন সূক্ষ্মদেহও স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমজাতীয় জীবে সমাকৃষ্ট এবং নব জীবনে সমুদ্ভূত হয়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥

—গীতা, ২।২২

—যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ জীব জলৌকার (চিনে জোঁক) ন্যায় উত্তরদেহকে অবলম্বন করিয়া পূর্বের জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

যে যে-জাতীয় পদার্থ, সে সে-জাতীয় পদার্থে মিলিত হয়—ইহাই ভগবানের 'সঙ্কর্ষণ'-শক্তির নিয়ম। অন্যান্য ধর্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম ঈশ্বরকে জীবের পাপ-পুণ্য বিচারের জন্য বিচারাসনে স্থাপিত করেন নাই, ইহাও হিন্দুদিগের যথেষ্ট গৌরবের কারণ।

মানুষ এই দেহেই নানারূপ দেহান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার বাল্যকালে যে দেহ থাকে, যৌবনে কি সে দেহের কিছু থাকে, না যৌবনে এক নূতন দেহের সৃষ্টি হয়? বাহ্য-বিজ্ঞানমতে প্রতিক্ষণ দেহাভ্যন্তরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য চলিতেছে। সেই নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য-প্রভাবে প্রতি দশ বৎসর অন্তর কি মানবের নূতন নূতন দেহান্তর ঘটিতেছে না? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে কৌমারের পরে যৌবন আসিলে মানুষের যে দেহান্তর, যৌবনের পরে প্রৌঢ়েও সেই দেহান্তর এবং প্রৌঢ়ের পর জরায়ও তদ্রূপ দেহান্তর; সুতরাং এই কৌমার যৌবন ও জরায় মানুষের কৌমার-মৃত্যু, যৌবন-মৃত্যু এবং প্রৌঢ়-মৃত্যু ঘটিতেছে, কারণ সেই সেই কালে তাহার পূর্ব-শরীরের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন হইয়াছে। জীব যদি এতবার মৃত্যুর পর জীবিত থাকে, তবে জরা-মৃত্যুর পর, যে জরায় শরীরের ধ্বংসসাধন হয়, সেই শরীর ধ্বংসের পর সেই জীব জীবিত থাকিবে না কেন? অতএব মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদ্যমান থাকিয়া যে নূতন শরীর ধারণ করে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। সুতরাং এই যুক্তিতে জীব বাঁচিয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী জীবের মৃত্যু দেখিয়া মুহ্যমান হন না। মৃত্যুর পর জীবের যে দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়, সেই দেহেরও কৌমার, যৌবন, জরা এবং মৃত্যু আছে। আবার তৎপর-দেহেরও তদ্রূপ উৎপত্তি ও লয়ক্রমে জীবের জন্মজন্মান্তর অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাই ভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

> দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥
>
> —গীতা, ২।১৩

অতএব হিন্দুধর্মমতে জীবাত্মার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার শেষ হয় না। জীবাত্মা স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লিঙ্গদেহে অন্বিত হন। লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ পরিত্যাগ

করেন এবং ঐ লিঙ্গদেহে ভূর্লোক অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবীলোক হইতে অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন। এই স্থানকেই প্রেতলোক বলে। প্রেতলোকে গিয়া পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। তৎপর পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে গমন করেন, সেখানে পুণ্যকর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে, তখন কর্মক্ষয় হইয়া তাঁহার যে সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারকে অদৃষ্ট বলে। সেই অদৃষ্ট লইয়া জীব আবার ঐ পথে জগতে আসিয়া গর্ভ-কটাহে প্রবিষ্ট হইয়া স্থূলদেহ ধারণ করে। সে এক বিচিত্র লীলা—অদ্ভুত কাণ্ড! সংস্কারসূত্রে গ্রথিত হইয়া সেই সকল বাসনাবিদগ্ধ জীবাত্মা যেরূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং যেরূপে দেহত্যাগ করে, তাহা যোগীর নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা। সাধন ব্যতীত সামান্য জড়চক্ষে তাহা দর্শন বা ব্যবহারিক জ্ঞানে অনুভব করা যায় না।

ঈশ্বর দয়াময়, তবে পাপপ্রণোদক কে ?

সংসারে জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সুখী-দুঃখী, হিন্দু-মুসলমান, রাজা-প্রজা, সকলেই পরমেশ্বরকে "দয়ার সাগর" প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি "দয়াময়" কি-না, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? যাহারা দুঃখী, দিবা-রাত্রি রোগ, শোক ও দারিদ্র্য-পীড়নে মুহ্যমান, তাহারাও সকাতরে ভগবান্‌কে "দয়াময়" বলিয়া ডাকিতেছে। বালক যেমন মাতাকর্তৃক প্রহৃত হইয়াও "মা" "মা" বলিয়া কাঁদে, তদ্রূপ কি দুঃখীদিগের "দয়াময়" সম্বোধন ? আর নীরোগ বলশালী ব্যক্তিগণ সুখৈশ্বর্যের খাতিরে কি ঈশ্বরকে "দয়াময়" বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে ? এরূপ "দয়াময়" শব্দ তোষামোদের নামান্তর মাত্র। যে যেরূপ খাটিয়াছে, প্রভু তাহাকে সেইরূপ পারিশ্রমিক দিয়াছেন,

এরূপ অবস্থায় সেই প্রভুকে "দয়াময়" বলিলে অযথা তোষামোদই প্রকাশ পায়। সংসারের সুখ-দুঃখ জীবের স্বোপার্জিত; কেননা যে যেমন কর্ম করিয়াছে, সে তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছে। ইহাতে ভগবানের দয়া ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় কোথায়? বিশেষতঃ সংসারের সুখ-দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, মুহূর্তে ভাসিয়া যায়। তাহার জন্য জ্ঞানী কখনও ঈশ্বরের তোষামোদ করেন না। আমি জানি, যাঁহারা বিষয়সুখে ভগবান্‌কে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের তুল্য দুঃখী, হতভাগ্য জীব আর নাই। বরং দুঃখী-দরিদ্রেরাই ভগবানের নিকটে অবস্থান করেন। ভগবান্ সর্বভূতে সমান দয়া করেন এবং সমদৃষ্টিতে সকলকে দেখিয়া থাকেন। সুতরাং সকলেই পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করিতেছে। তবে তিনি দয়াময় কেন?

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থাতে একটুকু বিশেষত্ব আছে; সেই বিশেষ অবস্থার উপযোগী উপায়সকল অবলম্বন করিলে তবে না তাহার উন্নতি হইবে? এখন সেই সকল উপায় অবলম্বন করিবার এবং তদনুসারে কার্য করিবার বুদ্ধি না পাইয়া কিরূপেই বা তাহা অবলম্বন করিতে শিখিব এবং কিরূপেই বা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা হইতে পারে? আর সেই বুদ্ধি এক অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতীত আর কে দিবেন? অতএব ঈশ্বরই আমাদের শুভবুদ্ধিসকল প্রেরণ করিতেছেন। ভারতের গৃহে গৃহে বিশ্বামিত্র ঋষিপ্রণীত "গায়ত্রী মন্ত্র" এই কথা বিঘোষিত করিতেছে; যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্।

ওঙ্কারকে প্রণব বা নাদ কহে।* ওঁ শব্দের অর্থ সৃষ্টিস্থিতিসংহারাত্মক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ত্রিগুণাত্মক পরব্রহ্ম। যিনি দিবাকরমণ্ডলাভ্যন্তরে

* প্রণবের সবিশেষ তত্ত্ব মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থের যোগকল্পের "প্রণবতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ।

তৎপ্রকাশক আদিত্যদেবস্বরূপ (হৃদয়াকাশে দ্যোতমান বলিয়া তাঁহাকে দেবতা বলে) পরমপুরুষরূপে বিরাজিত আছেন, তিনিই জীবের হৃদয়কমলে জীবাত্মাকারে প্রকাশমান হইতেছেন, এই অভেদজ্ঞানদ্বারা (দেবস্য) দীপ্তি ও ক্রিয়াবিশিষ্ট, (সবিতুঃ) সর্বভূতপ্রসবকারী সূর্যের (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই ত্রিভুবনস্বরূপ (বরেণ্যং) জনন-মরণ-ভীতিবিদূরণার্থে উপাস্য (তৎ ভর্গঃ) সেই ভর্গ নামক ব্রহ্ম-স্বরূপ যে জ্যোতিঃ, তাহাই আমি (ধীমহি) চিন্তা করি। (যো) যে ভর্গ সর্বান্তর্যামী জ্যোতিঃরূপী পরমেশ্বর (নঃ) সংসারী আমাদিগের (ধিয়ঃ) বুদ্ধিবৃত্তিকে (প্রচোদয়াৎ) ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গে নিরন্তর প্রেরণ করিতেছেন।

ভগবান্ অর্জুনের নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—গীতা, ১০।১০

যাঁহারা আমাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি এরূপ বুদ্ধি প্রদান করি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হয়েন।

অতএব ঈশ্বর সুখ-দুঃখ-দণ্ড-প্রদাতা বলিয়া "দয়াময়" নহেন, তিনি প্রতিনিয়ত আমাদিগকে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রযোজক বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাই সন্ন্যাসী-সংসারী, সুখী-দুঃখী সকলেই সমস্বরে তাঁহাকে "দয়াময়" বলিয়া ডাকিতেছেন; ইহাই তাঁহার দয়াময় নামের পরিচয়।

ভগবান্ প্রতিনিয়তই শুভবুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন বটে, কিন্তু অশুভবুদ্ধি তিনি কদাপি প্রেরণ করেন না। অথচ ধর্মশাস্ত্রের স্থানে স্থানে এমন কথা আছে, যাহা প্রথম দেখিলেই মনে হয় যে, ঈশ্বরই পাপ করাইতেছেন। কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই মনে হয় যে; তাহা

প্রকৃত ভাব নহে। এরূপ বিরোধাভাস-স্থলে পূর্বাপর দেখিয়া সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। যদি ঈশ্বর পাপ করাইতেছেন এইরূপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ পাপকারীদিগের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।" (গীতা, ৭।১৫)। তবে পাপে নিযুক্ত করে কে? ঠিক এই কথা অর্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

—গীতা, ৩।৩৬

—হে বার্ষ্ণেয়! লোকে পাপকর্ম করিতে অনিচ্ছুক হইলেও কে তাহাকে পাপকর্মে নিয়োজিত করে?

তাহাতে ভগবান্ বলেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

—গীতা, ৩।৩৭, ৩৯

ইহার ভাবার্থ এই যে, মনুষ্য কাম-ক্রোধের বশীভূত হইয়াই এইরূপ পাপাচরণ করে। কামদ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইলে মনুষ্য প্রকৃত পথ দেখিতে পায় না। এই কারণে ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিয়া কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসকলকে বিনাশ করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য আপনার দোষেই পাপ-আচরণ করে। পাপকর্ম যদি আমরা তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়াই করি, তবে তাহার জন্য আবার আমাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হয় কেন? ঈশ্বর এমন নিষ্ঠুর রাজা নহেন যে, তিনি আমাদিগের দ্বারা তাঁহার মনোমত একটা কার্য

করাইয়া লইয়া পুনরায় তাহারই জন্য আমাদিগকে দণ্ড দিবেন। তবে কোন্ কর্ম ঈশ্বরের অনুমোদিত, আর কোন্ কর্ম অননুমোদিত, তাহা বুঝিতে গেলে আমাদিগের চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক, ধর্মবোধ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিব।

ঈশ্বর-উপাসনার প্রয়োজন

জীবের ঈশ্বর-উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? অনেকে মনে করেন, ঈশ্বর মায়ামুক্ত পুরুষ, মায়াযুক্ত জীবের হিতার্থে যাহা করিতেছেন, তাহা করিবেনই; তিনি সুখ, দুঃখ, স্তব, নিন্দা ও পূজা প্রভৃতির অতীত। যাহা তাঁহার করিবার, তিনি তাহা করিতেছেন, তখন ঈশ্বর-উপাসনার প্রয়োজন কি? আমরা মায়াযুক্ত জীব, বিবেক-বুদ্ধির বলে নীতিপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া যাই, ঈশ্বরের কাজ তিনি করিতে থাকুন, আমাদের কাজ আমরা করিতে থাকি, তোষামোদে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু উপাসনার উদ্দেশ্য তাহা নহে। উপাসনা অর্থে ঈশ্বরচিন্তন। ঈশ্বরচিন্তা কাহাকে বলে? কেবল চক্ষু মুদিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিতে গেলে, অন্ধকার ব্যতীত অন্য কিছুই দেখা যায় না। অধিকন্তু বিষয়চিন্তা শত বাহু সৃজন করিয়া সমস্ত হৃদয়খানা জড়াইয়া ধরে।

স্তুতিস্মরণপূজাভির্বাঙ্মনঃকায়কর্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরের্ভক্তির্ভবেদীশ্বরচিন্তনম্॥

—গরুড়পুরাণ

—স্তব, স্মরণ, পূজাদি এবং কায়মনোবাক্যে কর্ম করিতে যে অচলা ভক্তি, তাহাকে ঈশ্বরচিন্তন বলে।

ঈশ্বরের তুষ্ট্যর্থে তাঁহার স্তব করি না, পূজা করি না। তাঁহাকে চিন্তা করিয়া তৎসারূপ্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার পূজা অর্চনা ও স্তবাদিরূপ উপাসনা করিয়া থাকি। ভ্রান্ত জীবের ভ্রম নাশ করিবার জন্য ঈশ্বরনিরত হওয়া আবশ্যক। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া প্রকৃত ভগবৎচিন্তাপরায়ণ হইতে না পারিলেও স্তব-পূজাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, উৎকৃষ্ট গুণের উদয় হইয়া ক্রমে আত্মপ্রসাদ ও জন্মান্তরে উন্নতি হয়। কিন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া নিরন্তর চিন্তাদ্বারা তৎসারূপ্য লাভ হয়। আর ঈশ্বরচিন্তা না হইলে, সর্বদা বিষয় বা পদার্থাদির চিন্তায় কালাতিপাত করিলে, অবাস্তব বিষয়চিন্তা বাস্তববৎ প্রতীয়মান হয়। তখন জীব বিষয়চিন্তাতেই নিরন্তর মগ্ন থাকে এবং সংসারচিন্তা করিতে করিতে তাহার সংসারত্বপ্রাপ্তিই ঘটে। তাই ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

—যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হয়; আর যে ব্যক্তি আমাকে (ঈশ্বরকে) চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব স্বপ্নমনোরথের ন্যায় অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনাদ্বারা শোভিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাহিত কর।

আবার অর্জুনকে বলিয়াছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

—গীতা, ৮।১৪

—যিনি অনন্যচিত্তে সতত আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।

বুদ্ধদেব ঈশ্বরচিন্তা বাদ দিয়া অনাসক্ত ও কর্মফলশূন্য হইয়া বিবেকের বশীভূত হইয়া কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই কালে বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হইয়াছিল। ঈশ্বরের সকল, ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য আমার সকল—এ প্রকার চিন্তা না করিলে আমিত্ব যাইবে কেন? শিশুসন্তানের পক্ষে তাহার মাতৃস্তন্য যেরূপ, উপাসনার দ্বারা যে অমৃত পান করা যায়, আত্মার পক্ষে তাহাও ঠিক সেই প্রকার। উপাসনার দ্বারা আমাদিগের আত্মা ক্রমশঃ অধিকতর দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠেন এবং অসংখ্য প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়াও উন্নতির পথে যাইতে সমর্থ হন। উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মার যাহা-কিছু প্রয়োজন হয়, উপাসনাদ্বারা অতি সহজে সেই সমস্তই লাভ করা যায়। অধিক কি, উপাসনাই আত্মার সবস্ব। যাহাতে আমরা সর্বদা উপাসনা করিবার অধিকার পাই, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট সর্বদা আমাদের প্রার্থনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে॥

—পঞ্চদশী

—উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, উপাসনা ব্যতিরেকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপত্তির অন্য পথ নাই।

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতিজ্বালা সর্বজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ॥

—আত্মবোধ

আত্মরূপ অরণিকাষ্ঠে সর্বদা ধ্যানরূপ মথন-ক্রিয়া করিলে জ্ঞানরূপ অগ্নি উদিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করে।

এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের উপাসনাদ্বারা আমাদিগের চিত্ত যেরূপ নির্মল-ভাব ধারণ করে, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। যথা—

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নি দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।
তথৈবাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

—অগ্নি যেপ্রকার সুবর্ণে প্রবিষ্ট হইলে সুবর্ণকে বিশুদ্ধ করে (অর্থাৎ খাদমিশ্রণজনিত সুবর্ণের যে মলিনতা তাহাকে বিনাশ করে), পরমেশ্বরও সেইরূপ যোগিদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে তাঁহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা (অশুভ বাসনাদি) বিদূরিত করেন।

কোন কোন দুর্বলাধিকারী (অথচ নিরাকার-পরব্রহ্ম-উপাসক) ব্যক্তির মুখে, "যাঁহার রূপ নাই, আকার নাই, তাঁহার কি ধ্যান করিব" এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপে পরব্রহ্মের স্তব করিয়াছিলেন। যথা—

স্থিতং সর্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরম্।
নিরীহমবিতর্ক্যঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

যিনি আত্মরূপে অলিপ্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, যাঁহার তুল্য বস্তু আর কোথাও কিছু নাই ; সেই নিরীহ, তর্কের অতীত, তেজোরূপে বিদ্যমান পুরুষকে নমস্কার করি।

আবার পরব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করা যাইতে পারে। যথা—

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

—গায়ত্রী

আমরা জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তির চিন্তা করি।

সামান্য উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না। যেহেতু সেই উপাসনা হইতে মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। যেমন মৃদু আঘাতে মর্মভেদ হয় না

বলিয়া মৃত্যু হয় না, কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মর্মভেদ হইয়া মৃত্যু হয়, সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়া মুক্তি হয়।* সমস্ত দিবস অন্যমনস্ক থাকিয়া কেবলমাত্র একবার কি দুইবার মালা-ঝোলা লইয়া বসিলে তদ্দ্বারা মুক্তি হওয়া অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ উপাসনা করা চাই এবং সমস্ত দিন উপাসনার ভাবে মগ্ন থাকা আবশ্যক। একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ গাহিয়াছেন—

উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে উপাসনা করা চাই।

ভোজন আমার আহুতি প্রদান,
শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর,
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রা বিরচণ,
যে ভাবেই বসি সেই ত আসন,
যে চিন্তাই করি, তাঁরি ধ্যান ধরি,
এ জীবন তাঁর যন্ত্র॥

ভোজনে, ভ্রমণে, শয়নে, উপবেশনে—অষ্টপ্রহর উপাসনায় না থাকিলে সিদ্ধির উপায় নাই। এইরূপ উপাসনায় জীবাত্মার মহত্তম কার্য পরমাত্মার সহিত সম্মিলন হয়। জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্মিলনের নাম যোগ। এই যোগসাধনের তিনটি প্রধান উপায়—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

* ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ। (বেদান্তসূত্র ৩।৩।৫১)

কর্মযোগ

যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম (কৃ+মন্)। কায়দ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

—পাতঞ্জলদর্শন, ২।১

—তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্রাদি পাঠ, ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস বা সমুদয় কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ, ইহাকেই ক্রিয়াযোগ বলে।

কর্মপরিত্যাগ সহজ নহে। কায়দ্বারা কর্ম পরিত্যাগ করিলেও মনের কর্মনিবৃত্তি যথার্থ জ্ঞানলাভ না হইলে হয় না। কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কর্মই বন্ধনের কারণ তাহা স্বীকার করি। কিন্তু কর্ম পরিত্যাগ করিলেও কর্ম আমাদের পরিত্যাগ করিতে চাহে না।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

—গীতা, ৩।৫

—কেহ কখনও কর্মত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, কেহ ইচ্ছা না, করিলেও প্রাকৃতিক গুণসমুদয়ই তাহাকে কর্মে প্রবর্তিত করে।

অতএব গুণ যতক্ষণ আছে, আমাদের কর্মও ততক্ষণ আছে; গুণ না গেলে কর্ম যাইবে কেন? সুতরাং কর্ম করিয়া গুণের ক্ষয় করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমশঃ জ্ঞান প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কর্ম করিতে হইলেই আবার কর্মফল সঞ্চয় হইবে, সেই ফলে আবার গুণ হইবে, গুণ হইলেই আবার কর্ম করিতে হইবে। এই গুণ-কর্ম লইয়াই মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের ঘোরা-ফেরা। অতএব কর্ম না করিলে যখন উপায় নাই,

তখন কর্ম করিতে হইবে, কিন্তু সেই কর্ম সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য হইয়া করিবে। সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া অনাসক্তচিত্ত হইয়া কর্ম করাকেই কর্মযোগ বলে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

—গীতা, ২।৪৮

—হে ধনঞ্জয়! আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমচিত্ত হইয়া যুক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান কর।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥

—গীতা, ৩।১৯-২০

—পুরুষ আসক্তিশূন্য হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করে, অতএব আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান কর। জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; লোকসকলের স্বধর্মপ্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম করা উচিত।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

—গীতা, ২।৪৭

—কর্ম করিবারই অধিকার তোমার আছে, কর্মফলে নাই।

এই নিষ্কাম কর্মও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে শোভা পায় না। তণ্ডুলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তুষে আঘাত করা যেমন নিষ্ফল, ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইয়া কর্মের জন্য প্রয়াস পাওয়াও তদ্রূপ বিফল। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

—গীতা, ৩।৯

—ভগবদারাধনার্থ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম করিলে, লোক কর্মবদ্ধ হয়; অতএব হে কৌন্তেয়! ভগবানের প্রীত্যর্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম অনুষ্ঠান কর।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

— গীতা, ৯।২৭

—অর্থাৎ তুমি যাহা কিছু করিবে, তাহা ঈশ্বরে অর্পণ কর। এইরূপে কর্মযোগ অভ্যাস করিয়া কর্মবন্ধন অর্থাৎ ফলকামনাবিশিষ্ট কর্মসমূহের সুদৃঢ় পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইবে। কিন্তু পাঠকগণ! দেখিবেন—"অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ" (গীতা, ৬।১)—"কার্য কর্ম"—কর্তব্য কর্ম অর্থাৎ যে কর্মগুলি না করিলে প্রত্যবায় আছে, এইরূপ কর্ম করিতে শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিতেছেন। যেন স্মরণ থাকে, ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া মন্দ কর্ম করিলে তাহা এই কর্মযোগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। *

কাজ অনেক হউক, কিন্তু মন ভগবানে অর্পণ করা থাকুক, এইরূপে ইন্দ্রিয়গণকে সংযমের দ্বারা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ হইতে স্ববশে আনাই কর্মযোগ এবং সেই সকলের একমাত্র ঈশ্বরোদ্দেশ্য হওয়া কর্তব্য। হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ডে এই শিক্ষাই হইয়া থাকে, কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে জ্ঞানের উদয় হয়।

* নিষ্কামকর্মসাধনার মোটামুটি উপদেশ মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থের 'সাধনকল্পে' 'সাধকগণের প্রতি উপদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ।

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানযোগের সর্বপ্রথম সোপান আত্মজ্ঞান। যিনি কর্মযোগানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নির্মলচিত্ত, শম-দমাদি চতুর্বিধ সাধনশক্তিসম্পন্ন, এতাদৃশ সর্বসদ্‌গুণশালী ব্যক্তি জ্ঞানযোগের অধিকারী।

একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বশঃ।
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্‌॥

—মহাভারত, মোক্ষধর্ম

—বহির্মুখী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখী করতঃ সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে সংযোজনা করার নাম জ্ঞান।

এই জীবজগৎ কেবলমাত্র এক ব্রহ্ম—আর কিছুই নাই। সমস্তই ব্রহ্মময়—তুমি-আমি, চন্দন-বিষ্ঠা, শত্রু-মিত্র, সুখ-দুঃখ, ভেদাভেদ, ধর্মাধর্ম, কিছুই নাই—সকলই ব্রহ্ম—এইরূপ ভাবকেই জ্ঞানযোগ বলে। এই গ্রন্থে জ্ঞান ও তাহার সাধনাই প্রকাশ করিব, সুতরাং এখানে অধিক কিছু বলিলাম না।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

—গীতা, ৪।৩৭

—যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম ভস্মসাৎ হয়।

শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

—গীতা, ৪।৩৩

দ্রব্যময় যাগযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানে সকল কর্মের পরিসমাপ্তি হয়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

—গীতা, ৪।৩৮

—ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই।

কিন্তু এই জ্ঞানযোগসাধনের জন্য ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

—গীতা, ৪।৩৯

জ্ঞানলাভে তৎপর ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবান্ হইলে জ্ঞান লাভ করেন।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

—গীতা, ২।৫৮

—কূর্ম যেমন আপনার অঙ্গসকল আপনার শরীরের অভ্যন্তরে সংহরণ করে, তেমনি যোগীব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে অনায়াসে নিবর্তন করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রকৃত জ্ঞানযোগী ইচ্ছা করিলেই বহির্বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া লইয়া পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিতে পারেন।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।

—পাতঞ্জল দর্শন

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ ম্যানসব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারিলে সংযম নামক প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই সংযম হইতে প্রজ্ঞা নামক আলোক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বুদ্ধি-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

ঐ জ্যোতিকে বা প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্ঞা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহা সাধারণ জ্ঞানের মত নহে, তাহা যোগযুক্ত জ্ঞান। জ্ঞানযোগসিদ্ধ হইলে সাধক বুঝিতে পারেন—আমিই জগতে ছিলাম, মন কিংবা শরীরের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। অজ্ঞানে পড়িয়া প্রকৃতিকে সঙ্গে জড়াইয়া লইয়া মোহে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। আমি যে পূর্ণ, পবিত্র ও চিদ্‌ঘন, আমার সুখের জন্য প্রকৃতির সেবা করিতাম—সে ত এক মহাভুল। কারণ আমিই যে সুখস্বরূপ, আমিই সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্‌ ও সদানন্দস্বরূপ। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সাধক শান্ত, সদানন্দ ও জীবন্মুক্ত হন।

ভক্তিযোগ

যখন কর্মযোগের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইল, জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান হইল, তখন আর ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া থাকিবে কি প্রকারে? কিন্তু নীরস জ্ঞান অথবা নীরস কর্ম করিয়া কাহারও কাহারও হৃদয় এত কঠিন হইয়া উঠে যে, ভক্তির কোমলতা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাঁহারা কর্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়া জ্ঞানযোগে আরোহণ করেন এবং আর একপদ অগ্রসর হইয়া ভক্তিযোগে আরূঢ় হইতে পারেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যথা—

মর্য্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

—গীতা, ১২।২

যাঁহারা মন্নিষ্ঠ হইয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠতম যোগী।

ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শীঘ্রই সংসারসাগরের পারে লইয়া যান। যথা—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

—গীতা, ১২।৬-৭

যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য পরা-ভক্তিদ্বারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেইসকল ব্যক্তিকে অচিরকালমধ্যেই মরণশীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

যাহার দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের কৃপা আকৃষ্ট হয় ও বাসনাসকল পূর্ণ হয়, তাহাই ভক্তি।

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

—শাণ্ডিল্যসূত্র

পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে। জ্ঞান-কর্ম ভুলিয়া, বাসনা-কামনা ভুলিয়া, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া, ধর্মাধর্ম ভুলিয়া, ধনৈশ্বর্য ভুলিয়া, স্ত্রী-পুত্র এমনকি আপনা ভুলিয়া ঈশ্বরে যে ঐকান্তিক অনুরক্তি, তাহার নাম ভক্তি। কেবল চক্ষু মুদিয়া "তুমি করুণাময় দয়ার সাগর" বলিলেই ভক্তি হয় না।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ

—মা! নির্গুণ ভক্তিযোগ কিরূপ শ্রবণ করুন। আমার গুণশ্রবণ মাত্রে সর্বান্তর্যামী যে আমি. আমাতে সমুদ্রগামী গঙ্গাসলিলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না ও ফলানুসন্ধানরহিতা এবং ভেদদর্শনবর্জ্জিতা মনের গতিরূপ যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এইরূপ ভক্তিযোগীর কোনই কামনা থাকে না। অধিক কি, তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব (সাযুজ্য)—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতীত কিছুই চাহেন না। এই প্রকার ভক্তিযোগকে আত্যন্তিক বলা যায়, উহা হইতে পরমপুরুষার্থ আর নাই। মানব ত্রৈগুণ্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরম ধন লাভ করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে সত্য, কিন্তু তাহা আমার ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ধন, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ভক্তির সাধনা রাগমার্গ, সুতরাং যাঁহার যেরূপ অনুরাগ, তিনি ভগবানকে সেইরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের মত সাজাইয়া ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় বিধি-নিষেধ, শাস্ত্র-উপদেশ সমস্তই ভাসিয়া যায়। রাগমার্গের সাধনা ও সাধকের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।*

ভক্তির সাধনায় ক্রমে প্রেমভক্তিব উদয় হয়। তখন সাধক শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্তা বা মধুর প্রভৃতি প্রেমের উচ্চস্তরের মাধুরী-লীলায় বিভোর হইয়া যান। সাধক সর্বত্র ভগবানেরই অস্তিত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি জানেন—

বিস্তারঃ সর্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥
—বিষ্ণুপুরাণ

* মৎপ্রণীত "প্রেমিকগুরু" গ্রন্থে প্রেমভক্তি প্রভৃতির স্বরূপ ও সাধনপ্রণালী অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

—বিশ্বজগৎ সর্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইজন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন।

কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান থাকিতে সাধক প্রেমের অধিকারী হইতে পারে না। পুরাণে হরগৌরীমূর্তি এই জ্ঞান ও প্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আলোক যদি ফানুস (চিম্‌নি) দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়, তবে কিঞ্চিৎ কর্কশ ও অনুজ্জ্বল বোধ হয়, কিন্তু ফানুস দিয়া আচ্ছাদিত হইলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলোক বাহির হয়। জ্ঞানও তদ্রূপ কিঞ্চিৎ কর্কশ, কিন্তু প্রেমের ফানুসে আচ্ছাদিত হইলে ঐ জ্ঞানালোক স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া তৃপ্ত করিবে।

ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইলে সাধক তখন ভক্তির বলে, প্রেমের বলে জগদ্রূপী জগন্নাথকে আপনার সঙ্গে লয় করিয়া থাকেন।

ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত *

হিন্দুধর্ম জাগ্রত হইতেছে। এখন হিন্দুসন্তান হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, হিন্দুধর্ম মানেন, হিন্দুমতে উপাসনা করেন। সকল শ্রেণীর—বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মপথে মতি ও সাধনকার্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে। সুদূর ইউরোপ আমেরিকাবাসীর মধ্যেও অনেকে কতকটা হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ্রেণীর লোক আর এক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

* "শিক্ষিত" শব্দ আমি ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করিতেছি।

দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা প্রকৃত পথে চলেন না। তাঁহারা আপন আপন বিবেক-বুদ্ধির মুন্সিয়ানা চালে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কতক প্রক্ষিপ্ত, কতক অতিরঞ্জিত বলিয়া বাদ দিয়া বাছিয়া বাছিয়া মনোমত একটা ধর্ম খাড়া করিতেছেন। তাহাতে নিজে তো প্রবঞ্চিত হইতেছেনই, আবার অপরকেও প্রতারিত করিতেছেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর ধর্মমত হইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত' ও 'ধর্মতত্ত্ব' নামধেয় দুইখানি পুস্তকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের এই দুর্দিনে ঐরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আবির্ভাব গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে এই দুইখানি পুস্তক প্রচারিত হওয়ায় বিশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এজন্য শিক্ষিতসমাজ তাঁহার নিকট ঋণী। কিন্তু তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশী ব্যক্তিও নিজ মত সমর্থনের জন্য হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবু বহুদিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি এতদ্দেশের সর্ব-সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। জানি, তাঁহার ধর্মমত আলোচনায় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব; তথাপি ন্যায়ের মর্যাদায়, সত্যের অনুরোধে দুই চারিটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।*

---

* লেখক বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়া অন্তরে একটু অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন, সেইজন্য যেদিন প্রবন্ধটি ছাপা আরম্ভ হয়, সেই দিন (১৩১৪ সালের ১৯শে চৈত্র, বুধবার, রাত্রি দেড় ঘটিকার সময়) যোগনিদ্রা (Hypnosis) সাহায্যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "আত্মা" আনয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁহার সহিত যে কথাবার্তা হয়, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রঃ। আপনি কেমন আছেন?

উঃ। সুখে আছি। পৌরাণিক ভাষায় স্বর্গভোগ করিতেছি।

বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্রে যে ভুল করিয়াছেন, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত বিচারেও তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে দুই একজন প্রতিবাদ করিয়াছেন সুতরাং আমি সকল কথার আলোচনা করিতে চাই না। বিশেষতঃ এ গ্রন্থে সেরূপ স্থান নাই। বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু ও প্রতিভাপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁহার প্রতিভাময়ী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ-অনুরাগে ঐশ্বর্যতত্ত্বের অনুভূতি হইয়াছিল। মানবীয় বুদ্ধিবলে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—

প্রঃ। আপনার আর জন্ম হইবে কি?

উঃ। ভোগান্তে জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ। আপনার লিখিত "ধর্মতত্ত্ব" বইখানা পড়িয়া আপনার নিজের ধর্মজ্ঞান ঠিক করিতে পারি কি?

উঃ। না—না, আমি ধর্মোপদেষ্টা গুরু বা ধর্মপ্রচারক নহি। সুতরাং কোন ধর্মমত প্রচারও আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল একশ্রেণীর লোকের হিন্দুধর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি ইংরেজীভাবে মুগ্ধ, ইংরেজী অনুকরণ-লুব্ধ, অপ্রবুদ্ধ এবং পরপ্রবোধন-প্রযোজনে স্বয়ং-সিদ্ধ জয়ঢাকবাহকের ন্যায় ইংরেজী-শিক্ষাক্ষিপ্ত ও পাশ্চাত্যসভ্যতাদৃপ্ত হিন্দুদিগকে জাতীয় ধর্মে তৃপ্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছি, শিক্ষিত গর্দভগণের অভিমানের বোঝা নামাইবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

প্রঃ। তাহারা যে নূতন ভ্রমে পতিত হইতেছে।

উঃ। হউক। জাতীয় ধর্মে অবস্থিত, জাতীয় আচারনিষ্ঠ হিন্দু ভুল বুঝিলেও নাস্তিক পাষণ্ড বা অসম্পূর্ণ পরধর্মলোলুপ হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমিও জানিতাম তত্ত্বজ্ঞ হিন্দু মদ্রচিত "ধর্মতত্ত্ব"কে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। কেবল উচ্ছৃঙ্খল ম্লেচ্ছপদানুসরণকারী শিক্ষিত-আখ্যাধারী হিন্দুগণই আমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারে। আমার বিশ্বাস, যে-কোন হিন্দু একবার জাতীয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে একদিন এমন সময় আসিবে যে, আপনা হইতেই তাহার ভ্রান্ত ধারণা তিরোহিত হইবে। কেননা বিশ্বাস থাকিলে সত্য আপনা হইতেই আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রঃ। যদিও সময়সাপেক্ষ, তথাপি অনুশীলনধর্ম শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি প্রভৃতি এতগুলার অনুশীলন করিতে যাই কেন? যে সকল বৃত্তি নিত্য, তাহার অনুশীলন আবশ্যক বটে; কিন্তু যাহা অনিত্য, তাহার অনুশীলনে জীবনযাপন করিয়া প্রকৃত পথের দূরতা বৃদ্ধি করিব কেন?

তাই শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ গড়িয়াছেন। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে ও অঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। সেইজন্য ভগবান্‌কে আদর্শ মানবরূপে চিত্রিত করিতে অসীম কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আসল কথা তিনি অবতারের সম্যক্ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই। কোন্ দেশের কোন্ অবতারে অলৌকিক কার্যের উল্লেখ নাই? সাধন-জ্ঞানহীন স্থূল মানবী বুদ্ধিতে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে গেলে মানবচরিত্র ভিন্ন অন্য অবস্থা বুঝিতে পারিব কেন? ভগবানের ভাব

উঃ। ধর্মতত্ত্বের শিষ্যবস্তুটিকে স্মরণ করিলেই উত্তর সহজ হইবে। যে পরকাল মানে না, জন্মান্তর স্বীকার করে না, তাহাকে নিত্যতা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আমি পরকাল বাদ দিয়া ইহকালের সুখের উপায় যে ধর্ম, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, মানুষ যাহাতে পাশব প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, আমি তাহারই জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃতি পর্যালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের মনের মত ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে কেহই হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হইবে না। ধর্মকে তাহাদের মুখরোচক করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কর্তন, কুসংস্কার খণ্ডন বা স্থলবিশেষে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে।

প্রঃ। আপনি চৈতন্য, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি অবতারগণের প্রচারিত ধর্মকেও অসম্পূর্ণ বলিয়াছেন।

উঃ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া আমাকে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। তমঃপ্রধান জড়বাদী হিন্দুগণের হৃদয়ে রজোগুণ উদ্রেক করাই আমার উদ্দেশ্য; তাই বুদ্ধ, চৈতন্যের সাত্ত্বিক ধর্ম দূরে রাখিয়া রাজসিক ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছি। যে বালক হাঁটিতে শিখে নাই, তাহাকে দৌড়াইতে উপদেশ দেওয়া সমীচীন নহে। যদিও আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, তবুও ব্যবহারিক জ্ঞানে ধর্মের স্থূলভাব যতদূর বুঝিয়াছিলাম তাহাও "ধর্মতত্ত্বে" ঠিক প্রকাশ করি নাই। আমি মুনি-ঋষিগণের প্রচারিত শাস্ত্রকে ভগবদ্বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় আমার ধর্মবল হীন হইলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিতাম না। আমার উদ্দেশ্য "যেন তেন প্রকারেণ" অনুকরণপ্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট করা। সুতরাং তাহাদের মন বুঝিয়া, কার্য দেখিয়া, তাহাদের মনোমত কাটিয়া ছাঁটিয়া ধর্মকে বাহির করিতে হইয়াছে। যে অধ্যাত্ম জগৎ স্বীকার করে না,

সাধন-জ্ঞান-জ্ঞেয় ; ঋষিগণ সাধনবলে তাহা অবগত হইয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাহা বুঝিতে পারি না, ধারণা করিতে পারি না, যাহা মানবীয় ক্ষুদ্র ধারণার অতীত, যাহা যোগীর যোগলব্ধ জ্ঞানের গোচরীভূত, তাহাই আষাঢ়ে গল্প বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। কাজেই বঙ্কিমবাবু যাহা অলৌকিক, যাহা ঐশ্বরিক, যাহা নূতন, যাহা জ্ঞানাতীত, তাহাই হয় প্রক্ষিপ্ত, নয় অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বিদূরিত করিয়া, তাঁহার মানবী মূর্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ফলকথা, শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়িয়াছেন। পাশ্চাত্যশিক্ষাদৃপ্ত সাধনজ্ঞানহীন ব্যক্তির নিকটই কৃষ্ণচরিত্র আদর্শ ঈশ্বর-চরিত্র হইতে পারে, কিন্তু বিষয়বিতৃষ্ণ যোগজ্ঞানশালী ভক্তের নিকট উহা মানবচরিত্র মাত্র।

তোহাকে আধ্যাত্মিক উপদেশ কি দিব ? কাজেই শারীরিক ও মানসিক ধর্মের চিত্র দেখাইয়াছিলাম।

প্রঃ। আমি আপনার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি, এক্ষণে প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি ছাপা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।

উঃ। প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি প্রচার হইলে সমাজের উপকার হইবে, যাহারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করিয়াও ভ্রান্ত ধারণায় প্রকৃত পথ দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের সাবশেষ উপকার হইবে। যাহারা সংশয়ী, অবিশ্বাসী, তাহারা কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব পাঠে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করিবে। পরে ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্রের ভুল জানিতে পারিলে প্রকৃত পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবে। হিন্দু এখন বাহ্যসম্পদে মুগ্ধ, তাই আমি ষড়ৈশ্বর্যশালী বিষ্ণুকে সম্মুখে ধরিয়া জয়দেবের প্রেমময় কৃষ্ণকে দূরে রাখিয়াছি ; নিবৃত্তিমার্গ তৃণাচ্ছাদিত করিয়া প্রবৃত্তিমার্গ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছি। এই প্রতিবাদে সেই জীর্ণ তৃণ উড়িয়া যাইবে। হিন্দু তখন তৃপ্তির অমল-ধবল-কৌমুদী-বিভূষিত কুসুমাস্তৃত নিবৃত্তিমার্গে পরিচালিত হইয়া আমার উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ উজ্জীবিত ও আলোকিত করিবে। আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানাব না বলিয়া আমি অশান্তি ভোগ করিতেছি। আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তি দূর হইল। আরও জানিলাম, জীবের বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভার অহঙ্কার বৃথা। কেননা তিনি যাহার দ্বারা যে কাজ করাইবেন, তাহাকে সে শক্তি দান করতঃ এইরূপে তোমার-আমার দ্বারা জগতে কার্য করাইতেছেন। আমিই প্রথমে তোমার হৃদয়ে ধর্মবীজ রোপণ করি, সেই বীজে প্রকাণ্ড কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষোৎপত্তি দেখিয়া ও তাহার সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথাস্থানে গমন করিলাম।

অন্যান্য কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পাঠক, তজ্জন্য দুঃখিত হইও না।

বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণচরিত্র আরম্ভ করিবার পূর্বে লিখিয়াছেন, যাহা প্রক্ষিপ্ত, যাহা অতিপ্রাকৃত ও যাহা মিথ্যালক্ষণাক্রান্ত, তাহা পরিত্যাগ করিব। ইহার নাম কি বিচার? অত কথা না বলিয়া সাফ বলিলেই হইত, আমি শাস্ত্র মানিব না, মুনি-ঋষি মানিব না, সাধক-সিদ্ধ মানিব না, আমার মনোমত ধর্ম আমি পালন করিব। একখানি শাস্ত্রের খানিকটা আসল, অন্যটা উপন্যাস; তাঁহার মতসমর্থনের উপযোগী অংশ আসল আর সমস্তই প্রক্ষিপ্ত—কাজেই বাদ। এরূপ গায়ের জোরে কথা বলা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আরও গভীর পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, তিনি আত্মমত প্রচারার্থ অনেক স্থলে শ্লোকের পাঠান্তর সংযোজন করিয়া শাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন; আবার অনেক স্থলে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥—গীতা, ৪।৮

—শ্লোকবাক্যটির অঙ্গ কর্তন করিয়া "ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়" এই স্থলে "ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়" বসাইয়া দিয়াছেন। আবার "প্রচারে" লিখিয়াছেন "সংস্কৃতানভিজ্ঞেরাই—'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়' এই পাঠ ব্যবহার করেন।" বড়ই হাস্যজনক কথা! শঙ্করাচার্য, শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ভারতমাতার সুপুত্রগণ একটি কথাও না ভাবিয়া তাঁহাদের কৃত ভাষ্য ও টীকায় "ধর্মসংস্থাপনার্থায়" পাঠের ব্যাখ্যা করিলেন কেন?* বঙ্কিমবাবু তাঁহার নিজ অনুবাদিত গীতায় উইলসন্ সাহেবকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছেন "উইলসন্ সাহেব মনে করেন, তিনি শঙ্করাচার্য (যাঁহার চারি বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র কণ্ঠস্থ) অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাল

* শাঙ্করভাষ্য। ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সংস্থাপনং সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগম্।
স্বামিকৃত টীকা। এবং ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্মং স্থিরীকর্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ।

বুঝেন।" কিন্তু এখানে অত দূরদৃষ্টি হয় নাই। আমরা পরের দোষটুকু দেখিতে পাই, আর আপন বেলায় অন্ধ হই। মায়ার কি বিচিত্র লীলা!—যাহাকে যেটুকু বুঝিতে দিয়াছেন, সেইটুকু চরম জ্ঞান মনে করিয়া অপরের দোষ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। আর ইহা যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত বঙ্কিমবাবু অনেক স্থলে শাস্ত্রকারগণের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অনেক কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা পড়িলে ভক্তের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে।

ধর্মতত্ত্বে বর্ণিত অনুশীলনধর্ম চরম ধর্ম নহে। উহা হিন্দুধর্মের একটা খণ্ডদেশ মাত্র। তাঁহার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধর্ম গীতোক্ত কর্মযোগ মাত্র। "ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়" ঠিক রাখিলে তিনি তাঁহার মনোমত অনুশীলনধর্ম ও শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র গঠন করিতে পারিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, 'ধর্ম নূতন করিয়া আবার কি হইবে? ধর্ম অনাদি এবং চিরকালই আছে। অতএব ধর্ম-সংরক্ষণ এই কথাই ঠিক।' এইখানেই তিনি কৃষ্ণ-অবতারের উদ্দেশ্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া মনগড়া কথা প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-অবতারের পূর্বেই কর্মযোগ প্রচারিত হইয়াছিল। জনক, অম্বরিষ প্রভৃতি কর্মযোগিগণ নিষ্কাম কর্ম সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের তাহা সংস্থাপন করা প্রয়োজন নাই, কাজেই সংরক্ষণ পাঠ সংযোজিত করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তির মাধুর্যলীলা সংস্থাপন করেন, বঙ্কিমবাবু সে অংশ উপন্যাস ভাবিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

আর কর্মযোগই কি চরম ধর্ম? কর্মের পর জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সাধন না করিলে ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ হইতে পারে না। গীতায় জ্ঞানযোগের ভূয়সী প্রশংসা আছে। যথা—

> ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
>
> —গীতা, ৪।৩৮

—জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই। তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

—গীতা, ৩।১

—হে জনার্দন! যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই (জ্ঞান) শ্রেষ্ঠ হয়, তবে হে কেশব! আমাকে এই মারাত্মক কর্মে কি নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছ?

তখন ভগবান্ বলিলেন—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

—গীতা, ৩।৩

—হে পার্থ! আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, এই লোকে নিষ্ঠা দুই প্রকার। শুদ্ধচেতাদিগের জ্ঞানযোগ, কর্মযোগিদিগের কর্মযোগ। পরে বলিলেন—

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

—গীতা, ৩।৫

লোকে ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণসমূহ তাহাকে কর্মে নিযুক্ত করে। অতএব এই গুণক্ষয়ের জন্য কর্মযোগ আবশ্যক। কিন্তু যাহার গুণক্ষয় হইয়াছে, সে কর্ম করিবে কেন? নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি বিষয়কার্যে কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। বৈদ্যকুলতিলক রামপ্রসাদ ভূকৈলাসের জমিদার-সরকারে চাকরি করিবার কালে সেরেস্তার খাতাপত্রে স্বরচিত গান লিখিতেন। এবংবিধ উচ্চ অধিকারীর নিকট ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনধর্ম বালকের উপদেশ মাত্র। কাম-কামনা-বিজড়িত মানুষের জন্যই কর্মযোগ। যথা—

যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্ম মোক্ষসাধনম্।
ঈশার্পিতেন মনসা ভজেন্নিষ্কামকর্মণা॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জন জ্ঞান, তাহাতে যাঁহার রুচি না হয়, তিনি ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১১।২২

—যদি ব্রহ্মে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া (ফলাদি কামনা না করিয়া) আমাতে সমুদয় কর্ম সমর্পণ কর।

পাঠক! দেখিলেন, কাহাদের জন্য কর্মযোগের ব্যবস্থা? শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা বুঝিতে না পারিয়া উচ্চশ্রেণীর সাধকগণকে সমাজের "গলগ্রহ" ও "স্বার্থপর" বলিয়া বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কর্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা অবিচ্ছেদে ব্রহ্মরসপানে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে যাঁহারা অস্বাভাবিক দোষী মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ আমাদিগের আত্মার শেষ পুরস্কার কি? আত্মার যে অনন্তকাল ব্যাপিয়া উন্নতি হইবে, সে উন্নতি কিরূপ? অনন্ত উন্নতির পথে অনন্তদেবের চিরসহবাস লাভ করা, অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে তাঁহার প্রেমসুধা পান করা, অনিমেষে অনন্তকাল তাঁহার গম্ভীর পবিত্রমূর্তি দর্শন করা এবং নিশ্চিন্ত নির্ভয় হৃদয়ে তাঁহার জয় উচ্চারণ করাই কি আমাদের আত্মার শেষ পুরস্কার নহে? এই জগতে থাকিয়াই আত্মা যদি তাহার স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে, তবে তুমি তাহা না বুঝিয়া অস্বাভাবিক কথা প্রয়োগ কর কেন? বঙ্কিমবাবুর যিশু, শাক্যসিংহ ও

চৈতন্যদেবের উদাসীন গান ভাল লাগে নাই। কাহারই বা লাগিয়া থাকে? মদ্যপায়ীকে মদের গ্লাস ত্যাগ করিতে বলিয়া কে তাহার প্রিয় হইতে পারে? সন্ন্যাসীর নিন্দা গৃহীর নিত্যকার্য। জনকরাজার সভায় শুকদেবের কৌপীনবিভ্রাট অনেক গৃহীই স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন; আর একবিংশতি দিন জনক শুকদেবকে দেখা না দিয়া নানাবিধ পরীক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে না পারিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, একথা কাহারও নিকট শুনি নাই।

আবার নিষ্কাম ধর্ম যাজন করিতে হইলেও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বদরিকাশ্রমে যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। জনকরাজাও মহা হঠযোগী, তিনি তদীয় গুরু অষ্টাবক্রকে কহিয়াছিলেন—

কায়কৃত্যাসহঃ পূর্বং ততো বাগ্বিস্তরাসহঃ।
অথ চিন্তাসহস্তস্মাদেবমেবাহমাস্থিতঃ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ২২।১

—পূর্বে আমি কায়িক কার্যে বিরত হইলাম, পশ্চাৎ বাক্যবিস্তারে বিরত হইলাম, এক্ষণে চিন্তায় নিরস্ত হইয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছি।

পাঠক! দেখুন, কিরূপ কঠোর সাধনা করিয়া জনকরাজা কর্মযোগী হইয়াছিলেন। নিষ্কাম কর্মের মহত্ত্ব আমরাও বুঝি, কিন্তু জানি বলিতে বা লিখিতে যত সহজ, পালন করা তত সহজ নহে। কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষাও কর্মযোগের সাধনা কঠোর। ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত কাঁটা-চামচেধারী কুক্কুটভোজী এবং তদনুকরণকারী উচ্ছৃঙ্খল ম্লেচ্ছ-দাসত্ব-উপজীবিগণের মুখে নিষ্কাম কর্ম-উপদেশ শ্রবণ করিলে কাহার না হাসি পায়? যাঁহারা নিয়মসংযমকে "আত্মপীড়ন" ও যোগসাধনাকে "বেদের ভোজবাজী" বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা কিরূপ নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়—সহজেই অনুমেয়। এই শ্রেণীর একজন প্রসিদ্ধ কবি ও শাস্ত্রপ্রচারক সামান্য চাকরীর লোভে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় কোন রাজাকে রাজ-

করে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এইরূপ কর্মযোগীর চরিত্র অনুসন্ধান করিলে কত গুহ্য রহস্য প্রকাশ পাইবে। পূর্বে কোন নূতন মত স্থাপন করিতে হইলে কত হাঙ্গামা হইত। মহম্মদ, যিশু, বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যদেবকে প্রথমে কত না বিপদ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজ মৃত; ধনে-জনে বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিই বড়, বিশেষতঃ মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রার কল্যাণে আপন মত প্রচারে কোনই বিঘ্ন হয় না। কেবল প্রকৃত জ্ঞানী হাসিয়া মরেন।

একটি সামান্য কথাতেও বঙ্কিমবাবুর বিশ্বাস হয় নাই। তিনি গীতার "বিশ্বরূপদর্শন" অধ্যায়টি অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ বলিয়া প্রক্ষিপ্ত স্থির করিয়াছেন। আমরা জানি, আধুনিক কোন যোগী মহিমাসিদ্ধি করিয়া স্বীয় অঙ্গকে যদৃচ্ছাক্রমে বর্ধিত করিতে পারেন। আর যিনি যোগেশ্বর, তাঁহার বিরাটমূর্তি ধারণ এত অসম্ভব কিসে? একটা গল্প মনে পড়িল—

একদা নারদ বৈকুণ্ঠে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখেন, একটি পাগল ভগবান্‌কে নানাবিধ কুকথায় গালি দিতেছে। নারদকে দেখিয়া বলিল, "ঠাকুর! কেলে ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি কতদিনে মুক্তি পাব?"

নারদ স্বীকৃত হইলেন। কিছু দূরে দেখেন, আর একটি ভক্ত ভগবানের স্তুতি করিতেছে। সেও বলিল, "ঠাকুর! প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিবেন আমি কতদিনে মুক্তি পাইব?" নারদ স্বীকার করিলেন।

যথাসময়ে নারদ বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া ভগবানের কাছে দুইজনের কথাই নিবেদন করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, "প্রথম ব্যক্তি অচিরেই মুক্তি পাইবে, দ্বিতীয় ব্যক্তির এখনও বহু বিলম্ব আছে।"

নারদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বরনিন্দুকের মুক্তি, আর ভক্তের বিলম্ব, এ কিরূপ বিচার?"

ভগবান্ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি প্রকৃত কথা গোপন করিয়া উভয়কে বলিবে যে, ভগবান্ একটি হস্তীকে সূঁচের ছিদ্রে প্রবিষ্ট করাইতে

ব্যস্ত আছেন, কোন উত্তর দেন নাই। তাহা হইলে রহস্য বুঝিতে পারিবে।”

নারদ বিদায় হইয়া ভক্তের নিকটে আসিয়া ভগবদাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। ভক্ত বিষাদিত হইয়া বলিল, “প্রভুর কৃপা হয় নাই, তাই অসম্ভব কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন।”

কিন্তু পাগল নারদের কথা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির। “যাঁর লোমকূপে শত শত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, স্ঁচের ছিদ্রে হস্তী প্রবিষ্ট করান তাঁর বড়ই কাজ! আবার এইজন্য আমার কথার উত্তর দেওয়া হয় নাই!” এই বলিয়া পাগল আরও অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

নারদ এতক্ষণে বুঝিলেন, পাগল প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়াছে, তাই ভগবান্ শীঘ্রই মুক্তি দিতে চাহিলেন। বঙ্কিমবাবুও পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন অথচ তাঁহার অলৌকিক কাণ্ডগুলি “উপন্যাস” স্থির করিয়াছেন। এরূপ ভগবান্ নূতন বটে।

ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনধর্ম পালন করিলে মানুষ পশুত্ব পরিহারপূর্বক মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তাই বঙ্কিমবাবু ভগবান্‌কে আদর্শ মানবরূপে দাঁড় করাইয়াছেন; কিন্তু মনুষ্যত্বই কি আমাদের চরম লক্ষ্য? মনুষ্যত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব লাভ করিতে হইবে। তৎপর দেবত্ব হইতে ঈশ্বরত্ব, সর্বশেষে ব্রহ্মত্ব লাভ করাই পরম মোক্ষপদ। সুতরাং তাহার জন্য দেবতা ও ঈশ্বরের আদর্শ চাই। তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত অনুশীলনধর্মে সমাজের সে অভাব পূর্ণ হইবে কি? বিশেষতঃ এক কর্মযোগ অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই পথচ্যুত হইতে হইবে। এক সময়ে নিষ্কাম কর্ম প্রবল ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা সকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব কর্মের সম্প্রসারণ করিয়া জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে নীরবতাপ্রযুক্ত বৌদ্ধধর্ম নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাই

শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণ করিয়া স্বীয় সার্বভৌমিক জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষার দোষে ও মায়াবাদের প্রভাবে কঠোরতায় পরিণত হইলে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া তাহার সহিত প্রেমভক্তি মিলাইয়া হিন্দুধর্ম মধুর করিয়াছেন। সুতরাং কর্মযোগই একমাত্র সাধকের চরম সাধনা নহে। ক্রমশঃ জ্ঞান ও ভক্তির সাধনা চাই। আশা করি, ধর্মপিপাসু সাধকগণ ক্রমশঃ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন করিবেন।

প্রতিপাদ্য বিষয়

পাঠক! সামান্য জনগণের আচরিত ধর্ম হইতে নিস্ত্রৈগুণ্য সাধকের নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা পর্যন্ত সমস্তই হিন্দুধর্মের দেহ। ইহার মধ্যে একবিন্দু কুসংস্কার বা মিথ্যাচার নাই। একদেশদর্শী বিধর্মিগণের কথা ধর্তব্য নহে। কেননা, তাঁহারা বাহ্য ধনসম্পদে বা বাহ্য বিজ্ঞানে যত বড় হউক না কেন, ধর্মবিষয়ে হিন্দুদিগের অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরে আছেন। সুতরাং তাঁহারা হিন্দুধর্মের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, হিন্দুকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পৌত্তলিক, জড়োপাসক প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন; কিন্তু আপনি হিন্দুধর্ম বুঝিতে চেষ্টা করুন—দেখিবেন এমন সার্বভৌমিক বিশ্বব্যাপক ধর্ম আর নাই। যে হিন্দুসন্তান ঘরের খবর না জানিয়া পরের নিকট ধর্মশিক্ষা করিতে যান, তাঁহাদের দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কি বলিব? তাঁহাদের জন্যই এই খণ্ড লিখিত হইল। কেননা, হিন্দুধর্মের প্রতি নিম্নাধিকারী জনগণের দৃঢ় আস্থা আছে। উচ্চাধিকারী জ্ঞানিগণের

নিকট হিন্দুধর্ম স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত। কেবল মধ্যম অধিকারী জনগণ—তাঁহাদেরও সকলে নহে—কেবল সংশয়ী জনগণ প্রমাণ চাহেন। পাশ্চাত্যবিদ্যার বহুল আলোচনা হওয়াতে সমাজে এই সংশয়ী জনগণের সংখ্যা বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে। এই সংশয়ী জনগণকে হিন্দুধর্মে প্রতিষ্ঠিত করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমি যেমন এই খণ্ডে হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাঁহারাও যেন এই নিয়মে হিন্দুধর্ম গুরুর নিকট বুঝিতে চেষ্টা করেন। ধর্মে অধিকার না হইলে শাস্ত্রপাঠ করিতে গেলে ঈশপের গল্প বলিয়াই বোধ হইবে। কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলে মিথ্যা বা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। কোন তত্ত্বদর্শী হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করতঃ মীমাংসা করিয়া লইবেন। অধিকারানুসারে প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং নিজে যাহা করেন বা জানেন, অন্যের নিকট তাহা না দেখিলে, তাঁহাকে নিন্দা করিবেন না। এমন কি অপর ধর্মের নিন্দা করিতে নাই। যখন যে দেশে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, ভগবান্ তখন সে দেশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম সংস্থাপন করেন। তিনি যে কেবল হিন্দুর দেশেই জন্মিবেন, এমন কথা কি শাস্ত্রে আছে? অতএব অপর ধর্মের নিন্দায় নিজ ধর্মের গৌরব হানি হয়। সেই হিন্দুধর্ম ও সেই হিন্দুশাস্ত্র সকলই আছে। কেবল উপযুক্ত লোকের দ্বারা উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায়, বর্ত্তমান এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুধর্ম আলোচনা করিয়া ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য ও মহান্ ভাব সাধারণকে জানাইতে পারিলে, অল্পকালমধ্যে হিন্দুধর্মের গৌরব দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইবে।

সাধনার তিনটি উপায়—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই কর্মপ্রধান ধর্মে কর্মযোগ বুঝাইতে হইবে না। আর পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি রাগমার্গের সাধনা, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। জ্ঞানযোগ আমার

প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞানের সাধনাই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিব। আশা আছে, মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকলেই এই সাধনায় সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন।

যত প্রকার সাধনা আছে, মুক্তিবিষয়ক সাধনাই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ইহাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে মুক্তি-লাভের জন্য যত্ন করিতে অনুরোধ করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা মুক্তির পথ হইতে দূরে অবস্থিতি করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে মনুষ্যগর্ভজাত গর্দভরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

জাতাস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দভাঃ॥
—যোগবাশিষ্ঠ

ওঁ শান্তিঃ ওম্

দ্বিতীয় খণ্ড

জ্ঞানকাণ্ড

ব্রহ্ম-বিচার

গীত

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

কি ভাবে ভাবিব তবে ভবে ভবারাধ্যা ধনে।
হরি-হর-বিরিঞ্চি আদি যে তত্ত্ব না পান ধ্যানে॥
অজরা অমরা তারা, অন্তহীনা নির্বিকারা,
প্রণবে প্রকাশ ত্রয়ী, ত্রিগুণা ত্রিতাপহরা,
নারী কি পুরুষ তিনি জানিব বল কেমনে॥

নির্গুণেতে নিরাকারা, সগুণে হন সাকারা,
লীলাতে জগদাকারা, ক্রিয়াশক্তি সৃজনে ;—
ইচ্ছাশক্তি হয়ে পালেন জ্ঞানেতে জ্যোতিঃ কেবল,
ত্রিগুণেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি যাঁহারে বল,
ভিন্ন ভাবে ভাবে কেবল তত্ত্বজ্ঞানহীনে॥

শুদ্ধ সত্ত্বে মহত্তত্ত্ব, মলিনেতে অহংতত্ত্ব,
ক্রমে পঞ্চ তন্মাত্রতত্ত্ব, প্রকাশ ভুবনে,
(সেই) সূক্ষ্মভূত পঞ্চদেব, প্রপঞ্চে জগদুদ্ভব,
প্রলয়ে বিলয় সব হবে কারণে ;—

তাঁর মায়াতে জগৎ বাঁধা, রূপ-রসাদি লাগায় ধাঁধা,
'সোঽহং' ভুলে 'অহং' জ্ঞানে সুখ-দুঃখেতে হাসা কাঁদা,
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি, ঠিক রে'খ মনে॥

বিরাজে সে সর্বঘটে, ধার্মিকে শঠে কপটে,
কেহ বা চিত্রিয়া পটে ব্রত সাধনে,
কেহ দেশ-দেশান্তরে, তাঁহারে খুঁজিয়া মরে,
ভাবে না আপন অন্তরে, বসি যোগাসনে ;—
স্থূল সূক্ষ্ম যত দেখ—এক ভিন্ন দুই নাই,
স্বপ্নেতে জীব জগৎ বৃথা খেটে মর ভাই,
সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম জেন নলিনে।

—পুষ্কর, ৮-৫-১৩০৯

জ্ঞানীগুরু

দ্বিতীয় খণ্ড—জ্ঞানকাণ্ড

জ্ঞান কি ?

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥

—গীতা, ১৩।১১

—আত্মজ্ঞানপরায়ণতা ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়োজিত যে মোক্ষ, তাহারই যে আলোচনা, তাহার নাম জ্ঞান এবং তাহারই যে অন্যথাপ্রতিপত্তি, তাহাই অজ্ঞান।

অনাত্মস্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেব নিশ্চয়ং স্ফারং সম্যগ্‌ জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—জগতের প্রত্যেক স্থানে অনন্তকাল পরমাত্মা বর্তমান আছেন এবং এই জগৎ সেই পরমাত্মার আভাসস্বরূপ—এরূপ নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান, তাহাকেই বুধগণ সমীচীন জ্ঞান বলিয়া জানেন।

শাস্ত্রকারগণ একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। নতুবা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রপাঠ করিয়াও যাঁহারা নানাপ্রকার সাংসারিক

বদ্ধভাবের মধ্যে অবস্থিতি করেন, বহুপ্রকার বিদ্যা উপার্জন করিয়াও যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যা উপার্জন করিতে সক্ষম না হন, বিজ্ঞ হইয়াও যাঁহারা আপনার আত্মার মুক্তিসাধনে মূঢ়ের স্থায় অবস্থিতি করেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে মূঢ় ভিন্ন পণ্ডিতরূপে কোথাও বর্ণনা করেন নাই। "মণিরত্ন-মালা" নামক গ্রন্থে মহাত্মা শঙ্করাচার্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন—

বোধো হি কো ?—যস্ত বিমুক্তিহেতুঃ।

—জ্ঞান কি ? যাহা বিমুক্তির কারণ।

পশোঃ পশুঃ কো ?—ন করোতি ধর্মম্।
প্রাচীনশাস্ত্রোঽপি ন চাত্মবোধঃ ॥

—পশু অপেক্ষাও পশু কে ? যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও ধর্মাচরণ ও আত্মজ্ঞান লাভ করে না।

জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ। ভগবান্ শিব বলিয়াছেন—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
সুকৃতৈর্মানবো ভূত্বা জ্ঞানী চেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

—কুলার্ণবতন্ত্র

—হে দেবি! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। ইহা ব্যতীত মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই।* সৌভাগ্যবশতঃ

* ক্ষিতিং বিনা যথা নাস্তি সংস্থিতেঃ কারণং সদা।
তোয়ং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণম্॥
তমোহন্তা যথা নাস্তি ভাস্করেণ বিনা প্রিয়ে।
বিনা অগ্নিপ্রয়োগেন যথা কিঞ্চিন্ন পচ্যতে॥
মাতৃগর্ভং বিনা কান্তে উৎপত্তির্ন যথা ভবেৎ।
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি! তথা মুক্তির্ন জায়তে॥

—তন্ত্রবচনম্

মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহারা জ্ঞানী হয়, তাহারাই মোক্ষসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, অন্যে পারে না।

আরুণেনৈব বোধেন পূর্বতস্তিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥

—আত্মবোধ

—সূর্য যেপ্রকার উদয়ের পূর্বে স্বকীয় কিরণের অরুণতা দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ উদিত হন, পরমাত্মাও তদ্রূপ অগ্রে জ্ঞানচ্ছটাদ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া তদনন্তর স্বয়ং আবির্ভূত হন। ভৃগু কহিয়াছেন,—

তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

—মনুসংহিতা ১২।১০৪

—তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান—এতদুভয়মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষলাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্যাদ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

—গীতা, ৭।১৬-১৭

—হে অর্জুন! পূর্বজন্মকৃত অপেক্ষাকৃত পুণ্যভেদে চারিপ্রকার ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন। প্রথম আর্ত, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসু, তৃতীয় অর্থার্থী, চতুর্থ জ্ঞানী। ঐ চারিপ্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী সর্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বরনিষ্ঠ এবং এক পরমেশ্বরেই তাঁহার অচলা ভক্তি থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানীর একমাত্র আমিই প্রিয় এবং তিনিও আমার পরম প্রিয়পাত্র হন।

এতাবৎ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য, আর সমস্ত গৌণ। আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি —এই মোক্ষোপযোগী প্রশ্নত্রয়ের তত্ত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞান এবং তন্নির্ণায়ক শাস্ত্রই জ্ঞানশাস্ত্র।

জ্ঞানের বিষয়

আত্মা কি, ঈশ্বর কি, জগৎ কি—ইহা জানাই জ্ঞানালোচনা ও মুক্তি তাহার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন-সাধনজন্য আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলি মনোযোগসহকারে পাঠ করা কর্তব্য। দর্শনশাস্ত্রকেই জ্ঞানশাস্ত্র বলে। কেননা, জ্ঞানার্থক দৃশ্‌ ধাতুনিষ্পন্ন "দর্শন" শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ জ্ঞানের করণ বা দ্বার। অতএব জ্ঞানশাস্ত্র বলিলে দর্শনশাস্ত্র বুঝিতে হইবে।

ছয়খানি মূল দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত আছে। যথা—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥

গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাঙ্খ্য, পতঞ্জলির যোগ, ব্যাসের বেদান্ত এবং জৈমিনির মীমাংসা—এই ছয়জন ঋষির ছয়খানি মূল দর্শনশাস্ত্র। আবার উহাদের রচয়িতাগণের শিষ্যোপশিষ্যগণ-বিরচিত বহু দর্শন বিদ্যমান আছে, তাহাও উক্ত নামধেয় শাস্ত্রান্তর্গত। কিন্তু যতগুলি বা যত প্রকারের দর্শনশাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত এক প্রকার না হইলেও তৎপ্রতিপাদ্য "মুক্তি" অংশে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল মুক্তির স্বরূপ ও উপায় নির্ধারণ করিতে গিয়া যে কিছু বাতন্ত্র্য।

এই ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রভাব এতদ্দেশে অধিক। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন চতুর্ব্যূহ, সাঙ্খ্যশাস্ত্রও তদ্রূপ চারিটি ব্যূহে অবস্থিত। চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন রোগ, রোগের কারণ, রোগের আরোগ্য ও ভৈষজ্য এই চারি ভাগে বিভক্ত, সাঙ্খ্যশাস্ত্রও তেমনই দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় এই চতুর্ব্যূহে প্রতিষ্ঠিত। এক কথায় চিকিৎসাশাস্ত্র যেমন মানবদেহের রোগ ও তদারোগ্য লইয়া ব্যস্ত, সাঙ্খ্য-শাস্ত্র তদ্রূপ মানবাত্মার দুঃখ ও তাহার নিবৃত্তিতে যত্নবান্। কেননা—"অজ্ঞাতজ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্"। যাহা লৌকিক প্রমাণের অগোচর, তাহা জানান বা তাহার বোধ জন্মানই শাস্ত্র। সুতরাং দুঃখ কি, এবং বাস্তবিক দুঃখ বলিয়া কিছু আছে কি-না—সাঙ্খ্যকার এ বিষয়ের বিশেষ বিচার বড় করেন নাই কেননা দুঃখ আছে কি-না, তাহা শাস্ত্রবিচারে বুঝিতে হয় না ; দুঃখ সর্বদাই সকল মানুষের অন্তঃকরণে চেতনাশক্তির প্রতিকূল অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে। তারপর, দুঃখনিবারণের কোন উপায় আছে কি-না, ইহাও সাঙ্খ্যশাস্ত্রে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই, কারণ সকলেই জানে, যাহা ক্ষণিকের জন্য যায়, তাহা স্থায়িভাবেও যাইতে পারে। সুতরাং যাহা সকলে বোঝে, সকলে জানে, তাহা লইয়া আলোচনা করা সাঙ্খ্যশাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য নহে। সাঙ্খ্যকার যাহা বুঝাইতে উপস্থিত, তাহা অন্যের অগোচর। যাহার উপদেশ মানব কোথাও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার উপদেশ সাঙ্খ্য প্রদান করিয়াছেন। সাঙ্খ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় মানুষকে জানান। মানুষ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থান জানিতেছে না। তাহাই বুঝাইয়া দিয়া মানুষকে কৃতার্থ করাই সাঙ্খ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ইহা মানবীয় জ্ঞানের অতীত—এ জ্ঞান লৌকিক নহে, অলৌকিক। সাধারণ জ্ঞানে এ সত্য আবিষ্কৃত হয় না।

বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখনিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখ-নিবারণকল্পে মানুষের আকুল আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি। ঐকান্তিক দুঃখ-নিরোধের নামই মুক্তি। ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজালজড়িত অদ্ভুত কথা নহে, প্রাণের অতি নিকটের কথা। জৈমিনিও বলিয়াছেন—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখতৃষ্ণার বিশ্রাম-ভূমি, তাহাই পরমপুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত। এই মোক্ষ বা স্বর্গসুখ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিদ্বারা লাভ হয়; কিন্তু তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিতকাল সুখসম্ভোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই পরিমিতকাল অন্তে আবার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এ সকল দুঃখনিবৃত্তির উপায় নহে; রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে না। সাঙ্খ্যমতে আত্যন্তিক দুঃখমোচন বা স্বরূপপ্রতিষ্ঠার (মুক্তির) উপায় তত্ত্বজ্ঞান। "আমি মহৎ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি—ঐ সকলের কিছুই আমি নহি এবং ঐ সকল আমার নহে, আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন—চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।" এইরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান।

এই তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার জন্য আত্মা ও জগৎ এই বস্তুদ্বয়ের যথার্থ স্বরূপ অন্বেষণ করিতে হয়। আত্মা ও প্রকৃতি (জগদ্ভাবাপন্ন) এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য আত্মা ও জগৎ এই উভয়ের বিচার করা আবশ্যক। আত্মাসম্বন্ধে আলোচনা করিবার আগে, জগৎসম্বন্ধে বিচার করা কর্তব্য; কেননা, জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে। জগতের স্বরূপ চিন্তা করিতে গেলে আত্মার বিষয় চিন্তা করা সহজ হইয়া পড়িবে। এই জগতের

মূলতত্ত্ব চতুর্বিংশতি। তদ্ভিন্ন আত্মাও এক। সমুদয়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। তন্মধ্যে যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টির নাম জগৎ, তাহার ব্যষ্টি—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত,—এতন্নামে খ্যাত। আত্মা ও চৈতন্যপুরুষ ব্যতীত এ সমুদয় বিশ্ব ঐ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত। আধুনিক বিজ্ঞান এই তত্ত্বকে মৌলিক পদার্থ এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ধাতু বলে। তত্ত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যাহা যাহার যোনি বা মূল, তাহাই তাহার তত্ত্ব। যথা—ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব স্বর্ণ ইত্যাদি।

অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দৃঢ়তার সহিত তত্ত্বাভ্যাস করিতে হয়।

সাধন-চতুষ্টয়

তত্ত্বাভ্যাস ধারণা করা সহজ নহে। প্রকৃত অধিকারী না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। আহারশুদ্ধি ত্রিবিধ সংঘাতশুদ্ধি, দেশ কাল ও সৎপাত্রাদির লাভ, সঙ্কল্পত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রতচর্যা এবং গুরুসেবা প্রভৃতিতে এই অধিকার লাভ হয়। ইন্দ্রিয়গণ চপলতা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ পাইতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ব্রহ্মপদ আশ্রয় করিতে পারিলে অতি সহজেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। ভগবান্ ভবানীপতি কহিয়াছেন—

যাবৎ কামাদি দীপ্যেত যাবৎ সংসারবাসনা।
যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্বকথা কুতঃ ?

—কুলার্ণবতন্ত্র

অতএব ইন্দ্রিয়চাপল্য থাকিতে তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। পুষ্করিণী প্রভৃতির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে প্রতিবিম্বসকল সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়সকল স্থিরভাব ধারণ করিলে তবে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পারা যায়। আমাদের মৃত্যুর কর্তা স্বয়ং বলিয়াছেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

—কঠোপনিষৎ, ২।২৪

—যিনি দুশ্চরিত হইতে বিরত হন নাই, শান্ত ও সমাহিত হন নাই, শান্তমানস হন নাই, তিনি কেবল প্রজ্ঞামাত্রদ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হন না।

এই সকল বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন যে, সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সহকারে তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থে ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবেন। অগ্রে সাধন-চতুষ্টয় কি কি, তাহা দেখা যাউক।

(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ

নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক কাহাকে বলে? **নিত্যং বস্ত্বেকং ব্রহ্ম তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বমনিত্যম্, অয়মেব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ**—একমাত্র পরমেশ্বর নিত্যবস্তু, তদতিরিক্ত অন্য সমস্তই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য; এই প্রকার যে নিশ্চয়জ্ঞান, তাহারই নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

(২) ইহামুত্রার্থফলভোগ বিরাগঃ

ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ কাহার নাম?—**ইহস্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম্**—ঐহিক বিষয়সুখ বা মৃত্যুর পর স্বর্গভোগ, এই উভয় প্রকার সুখভোগেই বিন্দুমাত্র আস্থা বা ইচ্ছা না থাকার নাম ইহামুত্রার্থ-ফলভোগ-বিরাগ।

(৩) ষট্‌ক-সম্পত্তিঃ

শমদমাদি ষট্‌ক-সম্পত্তি কাহাকে বলে ?—**শমদমোপরতিতিতিক্ষা-শ্রদ্ধাসমাধানঞ্চেতি**—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয়টিকে ষট্‌-সম্পত্তি বলে।

শম কাহাকে বলে ? "মনোনিগ্রহঃ"—অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তাহারই নিগ্রহের নাম শম। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, শমো মন্নিষ্ঠিতা বুদ্ধিঃ—ঈশ্বরনিষ্ঠ যে বুদ্ধি, তাহারই নাম শম।

দম কাহাকে বলে ? "দমো নাম চক্ষুরাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ"—চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের দমনের নাম দম।

উপরতি কাহাকে বলে ?—"উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মাণাং বিধিনা ত্যাগঃ।"—বিহিত কর্ম্মসকলের সংন্যাসবিধানদ্বারা যে পরিত্যাগ, তাহার নাম উপরতি। "শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ।"—কিংবা শব্দাদি-বিষয়শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনের প্রত্যাহার-পূর্ব্বক ব্রহ্ম-বিষয় শ্রবণাদিতে যে বর্ত্তন, তাহার নাম উপরতি।

তিতিক্ষা কাহাকে বলে ?—"তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব-সহনং দেহবিচ্ছেদ-ব্যতিরিক্তম্।"—যাহাতে শরীরবিচ্ছেদ না ঘটে অর্থাৎ যাহাতে মৃত্যু না হয়, এ ভাবে শীতোষ্ণসুখদুঃখাদি পরস্পর বিপরীত বিষয়সকল সহ্য করা, তাহার নাম তিতিক্ষা।

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে ? "গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।"—গুরু ও বেদান্তশাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা।

সমাধান কাহাকে বলে ?—"চিত্তৈকাগ্রতা।"—পরমেশ্বরেতে মনের যে একাগ্রতা, তাহার নাম সমাধান।

(৪) মুমুক্ষুত্ব

মুমুক্ষুত্ব কাহাকে বলে ?—**মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছা-বত্ত্বম্।**—মুক্তিতে অতি তীক্ষ্ণ ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব।

এইগুলি সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি। এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন। এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মানাত্ম-বিবেক-বিচার প্রশস্ত জানিবে। কিন্তু এই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তির অভাব থাকিলেও যদ্যপি কোন ব্যক্তি এই আত্ম-অনাত্ম-বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার কোন প্রত্যবায় নাই; অধিকন্তু তাহাতে তাঁহার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। *

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-সহকারে আত্মানাত্মবিবেক-বিচার করিবেন। অতএব সাধকের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন জানা আবশ্যক।

(ক) শ্রবণ

ষড়্‌বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণম্।

—বেদান্তসার

—ষট্‌প্রকার লিঙ্গদ্বারা অদ্বিতীয় বস্তুতে—কি-না ব্রহ্মেতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য অবধারণের নাম শ্রবণ।

ষট্‌প্রকার লিঙ্গ, যথা—(১) 'উপক্রমোপসংহার' (২) 'অভ্যাস' (৩) 'অপূর্বতা' (৪) 'ফল' (৫) 'অর্থবাদ' (৬) 'উপপত্তি'।

উপক্রমোপসংহার—প্রতিপাদ্য বস্তুর আদিতে ও অন্তে সেই বস্তুরই প্রতিপাদন করাকে উপক্রমোপসংহার কহে।

---

* সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্তুতীব শ্রেয়ো ভবতি।

অভ্যাস—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের মধ্যে সেই বস্তুকে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস।

অপূর্বতা—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে সেই বস্তুর প্রতিপাদন করাই অপূর্বতা।

ফল—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রয়োজন শ্রবণের নাম ফল।

অর্থবাদ—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা করাকে অর্থবাদ বলে।

উপপত্তি—প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনের যুক্তির নাম উপপত্তি।

এই ছয়প্রকার লিঙ্গদ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই তাৎপর্যনিরূপণের নাম শ্রবণ।

(খ) মনন

বেদান্তের অবিরোধে যুক্তিদ্বারা সর্বদা শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্তনের নাম মনন।

(গ) নিদিধ্যাসন

তত্ত্বজ্ঞানবিরোধী দেহাদি জড়পদার্থের জ্ঞান পরিহারপূর্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধী জ্ঞানপ্রবাহকে নিদিধ্যাসন বলে।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানের সাধক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-সহকারে চিন্তা করিবেন, "আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ—প্রকৃতি আমার দাসীস্বরূপা—আমারই সেবার্থে তাহার সমস্ত আয়োজন। আমি জ্ঞানস্বরূপ, আমি প্রাণস্বরূপ, আমি অস্তিস্বরূপ—তবে আমার উপরে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার গুণ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) বিকাশ করিতেছে মাত্র। অতএব সুখ-দুঃখাদি গুণের ধর্ম হইতে পারে—আমার কি?"

দুঃখের কারণ ও মুক্তির উপায়

জ্ঞানের দ্বারা সময় সময় অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, এ সকলই মিথ্যা—ব্রহ্মই সব, ভেদকল্পনা মূঢ়তা মাত্র। এই জ্ঞান স্থায়ী করিবার জন্য জ্ঞানসাধনার প্রয়োজন। সাঙ্খ্যকার দুঃখকে "হেয়" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

ত্রিবিধং দুঃখং হেয়ম্।—সাঙ্খ্যদর্শন

ত্রিবিধ দুঃখের নাম "হেয়"। ত্রিবিধ দুঃখ কি ?—না, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দুঃখের নাম "হেয়"।

প্রকৃতিপুরুষসংযোগেন চাবিবেকো হেয়হেতুঃ।—সাঙ্খ্যদর্শন

—প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগদ্বারা যে অবিবেক জন্মে, তাহাই হেয়-হেতু। সংযোগ কাহাকে বলে ?

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।

—দৃশ্য ও দ্রষ্টার ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃত্বরূপে উপলব্ধিকে সংযোগ বলে।

আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই সংযোগবশতঃ দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব উভয় শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে; এবং সেই কারণেই এই জগৎ-প্রপঞ্চ বিভিন্ন প্রকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে। এই সংযুক্ত হইবার একমাত্র কারণ অজ্ঞান। জীবে জন্ম-জন্মান্তরের অবিদ্যাসম্ভূত ভ্রমজ্ঞানের সংস্কার আছে। এই সূক্ষ্ম সংস্কার-জ্ঞান পরমাণুজাত জগতে গন্ধাদি মনোহর বিষয় নানারূপে প্রকটিত করে। তাহার সহিত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সংযোগ হওয়ায় সুখ-দুঃখ অনুভব হয়, তাহাতে সুখতৃষ্ণা জন্মে। সুখতৃষ্ণা হইতে চেষ্টা আইসে। মানসিক ও শারীরিক চেষ্টায় কর্মফল উৎপন্ন হয়। কর্মফল হইতে জীবের জন্ম হয়। অতএব জন্মই দুঃখের কারণ। এই দুঃখ প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগে উৎপন্ন হয়। অজ্ঞানই ইহার হেতু।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।

—এই অজ্ঞানের অভাব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়। সাধনাদ্বারা এই সংযোগ নাশ করাই প্রয়োজন, উহাই আত্মার কৈবল্যপদে অবস্থিতি। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ হইতে যে বিষয়জ্ঞান জন্মে, তাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ।

তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানম্।—সাঙ্খ্যদর্শন

—দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে 'হান' অর্থাৎ মুক্তি বলে।

সেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় কি ?

বিবেকখ্যাতিস্ত হানোপায়ঃ।—সাঙ্খ্যদর্শন

বিবেকখ্যাতিই হানোপায়। অর্থাৎ বিবেকই মুক্তির উপায়, যেহেতু প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখোৎপাদন করে এবং প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ বা পার্থক্য বিবেকদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই বিবেকদ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদপ্রাপ্তি হয়। এজন্য যাহাতে পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়, এরূপ কার্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন।

ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্ব-স্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহং-ধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৩২৪

—সাধকের স্বকীয় ব্রহ্মভাবে যে অনবধানতা, তাহা অপেক্ষা অনিষ্টকর আর কিছুই নাই। কারণ অনবধানতা মোহ, মোহ হইতেই অহং-বুদ্ধি, অহং-বুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে দুঃখ উপস্থিত হয়।

অতএব সাধক সাবধানতার সহিত তত্ত্ববিচার করিবেন। সম্যক্ তত্ত্বদর্শন হইতে আবরণ নিবৃত্তি হয়, আবরণ নিবৃত্তি হইতে ভ্রমজ্ঞান নাশ হয় এবং মিথ্যাজ্ঞান নাশ হইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

এতন্ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যগ্‌ রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তুতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৩৫০

রজ্জুস্বরূপ জ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যাজ্ঞান এতৎত্রয় সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়, অতএব পণ্ডিতব্যক্তি বন্ধনবিমুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত পুরুষকে অবগত হইবেন।

বাহির, অন্তর ও বৌদ্ধ জগৎ জয় করিয়া ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করাই জ্ঞানযোগের চরমোদ্দেশ্য, ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব জ্ঞানের সাত প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ণজ্ঞানে পৌঁছিতে সাতটি সোপান আছে। ঐ সাত প্রকার অবস্থাকে ভূমিকা বলে। যথা—

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা ॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পরার্থভাবিনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যগা স্মৃতা ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—প্রথম শুভেচ্ছা, দ্বিতীয় বিচারণা, তৃতীয় তনুমানসা, চতুর্থ সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চম অসংসক্তিকা, ষষ্ঠ পরার্থভাবিনী এবং সপ্তম তুর্যগা। এই সাতটির একটিতে আরূঢ় হইলে জ্ঞানের এক-এক স্তর লাভ হয়।

শুভেচ্ছা—শম-দমাদি সাধনপূর্বক বিবেক ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া মুক্তিলাভের কামনা জন্মানকে শুভেচ্ছা বলে। এই স্তরে আমি জ্ঞানলাভ করিতেছি, ইহাই জানিতে পারা যায়।

বিচারণা—শ্রবণ-মননাদির দ্বারা বিচারশক্তি উপস্থিত হওয়ার নাম বিচারণা। এই স্তরে গেলে বুঝিতে পারা যায়—যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি, জানিবার প্রয়োজন আর কিছুই নাই, কাজেই মনে আর কোন অসন্তোষের কারণ থাকে না।

তনুমানসা—বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক নিদিধ্যাসনদ্বারা সংস্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নাম তনুমানসা। এই স্তরে আসিলে জানিতে পারিব—যাহা সত্য, তাহা বাহিরে নাই; এতদিন অপরের নিকট যে সত্যানুসন্ধান করিয়া ঘুরিয়াছি, সে বৃথা; সত্য আমাদের ভিতরে। এখন নিশ্চয়ই সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

অসংসক্তিকা—"আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হওয়াকে অসংসক্তিকা বলে। এই স্তরে উপস্থিত হইলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়।

সত্ত্বাপত্তি—কোন বিষয়াবাসনা না থাকা, অর্থাৎ সর্ববিষয়ে অনাসক্তির নাম সত্ত্বাপত্তি। এই স্তরে চিত্ত-বিমুক্তি অবস্থা আইসে—তখন চিত্তের বহু দিকে ধাবিত হওয়ার স্বভাব থাকে না।

পরার্থভাবিনী—কেবল পরব্রহ্মেতে চিত্ত লয় করা অর্থাৎ পর-ব্রহ্মাতিরিক্ত ভাবনা না হওয়ার নাম পরার্থভাবিনী। এই স্তরে সাধকের চিত্ত স্ব-কারণে লীন থাকিবে।

তুর্যগা—স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপে চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হওয়ার নাম তুর্যগা। এই শেষ স্তরে সাধক পূর্ণজ্ঞানে উপস্থিত হয়েন। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে, সাধক শান্ত, সদানন্দ ও জীবন্মুক্ত হয়েন।

বশিষ্ঠদেবকর্তৃক সাধকের অবস্থাভেদে এই সাত প্রকার জ্ঞানভূমি প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেরূপ সাধন করিলে যে পরিমাণে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। যোগশাস্ত্রমতে যাহা অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধন, বেদান্তমতে যাহা সাধনচতুষ্টয়, দর্শনশাস্ত্রমতে যাহা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন এবং তন্ত্রশাস্ত্রমতে যাহা তত্ত্বসাধন—তৎসমুদয়ই এ সাত প্রকার জ্ঞান-প্রস্ফুরণের হেতু। এইরূপে জ্ঞানের বিকাশ হইলে আর কোন বিষয়েই অজ্ঞতা থাকে না, সকল বিষয়েরই সম্যক্ জ্ঞান জন্মে। সম্যক্ জ্ঞানের অপর নাম ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানে কিছুই অবিদিত থাকে

না, এজন্য ইহার নাম সম্যক্ অর্থাৎ সমগ্র জ্ঞান। এই সমগ্র, সম্যক্ বা ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিমূল যোগ। যোগবলেই ইহা সম্পাদিত হয়, অন্য আর কোন প্রকারে হয় না। কারণ শাস্ত্রেই উক্ত আছে—

যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো ময্যেকচিত্ততা।—আদিত্যপুরাণ

—যোগাভ্যাসদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগদ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে।

যোগিপুরুষের ঈদৃশ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, নামান্তরে এই জ্ঞানকেই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান-বিভাগ

সাধন-অনুসারে জ্ঞানের সাত প্রকার অবস্থা হইলেও প্রকৃত জ্ঞানের বিভাগ চারি প্রকার মাত্র, যথা—আত্মজ্ঞান, প্রকৃতিজ্ঞান, পুরুষজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান। এই চারি প্রকার জ্ঞানকে এক কথায় তত্ত্বজ্ঞান বলে। আত্মজ্ঞানদ্বারা আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতিজ্ঞানদ্বারা প্রকৃতিতত্ত্ব বা বিদ্যাতত্ত্ব, পুরুষজ্ঞানদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব বা শিবতত্ত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবধারণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞাতা এই তিনটিকে যিনি এক বলিয়া অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই আত্মবিৎ। যথা—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪ উঃ, ১৩৮

—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় কেবল মায়াদ্বারা পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত হইতেছে ; পরন্তু এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব বিচার করিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, আর কিছুই থাকে না। কারণ চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় এবং চিন্ময় আত্মাই স্বয়ং জ্ঞাতা ; যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ। কেননা—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো ন গুণো বা কথঞ্চন।
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাশিবঃ॥—বিজ্ঞানভিক্ষু

জ্ঞান—আত্মার গুণ বা ধর্ম নহে। আত্মা স্বয়ং জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং পূর্ণ মঙ্গলময়।

আত্মতত্ত্ব

প্রথমে আত্মতত্ত্ব অবধারণ করিতে হইবে।

শুক্রশোণিতয়োর্যোগে পঞ্চভূতাত্মিকা তনুঃ।
পাতালস্বর্গপর্যন্তম্ আত্মতত্ত্বং তদুচ্যতে॥—তন্ত্রবচন

শুক্র ও শোণিতযোগে যে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ, তাহার পাতাল হইতে স্বর্গ পর্যন্ত অর্থাৎ আপাদমস্তককে আত্মতত্ত্ব বলে।

পঞ্চভূতাত্মক স্থূলশরীর কাহাকে বলে ? না—

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্মজং মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ॥

—রামগীতা, ২৮

যাহা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক, যাহা সুখ-দুঃখাদির কারণস্বরূপ, যাহা কর্মভোগের আলয়, যাহা উৎপত্তি ও নাশযুক্ত, যাহা প্রারব্ধকর্মজ, যাহা মায়ার বিকারস্বরূপ, সেই অন্নময় শরীরকে স্থূলশরীর বলে।

স্থূলদেহের পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত সমগ্র অবয়বকে চতুর্দশ ভুবন অর্থাৎ সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ বলে। এই সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গযুক্ত চতুর্দশভুবনময় স্থূলদেহটি যে পঞ্চভূতাত্মক, জন্ম-মৃত্যু এবং কৌমার-যৌবনাদি বিকারযুক্ত, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাপন্ন এবং প্রারব্ধকর্ম ও সুখ-দুঃখাদি ভোগের যে আলয়স্বরূপ, এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকৃতরূপে অবগত হওয়ার নাম আত্মতত্ত্ব এবং তত্ত্বস্বরূপ অনুভবকরণজন্য যে ষট্‌চক্রজ্ঞান, তাহাই আত্মতত্ত্বজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়।

সাধন ব্যতীত মায়াবিমোহিত জীবের এই আত্মজ্ঞান সহজে উদয় হয় না; এজন্য যম-নিয়মাদি সাধনান্তর প্রাণায়ামদ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শমদমাদির সাধন করিলে, আত্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। আত্ম-জ্ঞানের বীজ সকল দেহেই নিহিত হইয়া আছে; কিন্তু তাহার সাধন বা অভ্যাস না করিলে প্রস্ফুটিত, বর্ধিত ও প্রকাশিত হয় না, এজন্য সাধন করিতে হয়; সাধন করিলেই আত্মজ্ঞান জন্মে

প্রকৃতি বা বিদ্যাতত্ত্ব

জ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ বিদ্যাতত্ত্ব কাহাকে বলে?

মূলাধারে চ যা শক্তির্গুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে।
সা শক্তির্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

—তন্ত্রবচন

—এই স্থূলশরীরাভ্যন্তরে আধারকমলে যে শক্তিরূপা প্রকৃতি অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার তত্ত্ব গুরুমুখে শিক্ষা করিবেন। সেই শক্তিরূপা প্রকৃতি-দেবীই মুক্তিদাত্রী অর্থাৎ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এজন্য এই শক্তিতত্ত্বকে বিদ্যাতত্ত্ব বলে।

বিদ্যা অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান নাশ হইলে মুক্তিলাভ হয়। এক্ষণে কিরূপে সেই বিদ্যাতত্ত্ব লাভ হইবে, তাহাই দেখা যাউক।

আত্মতত্ত্ব বলিলে যেরূপ পঞ্চ স্থূলভূতের সহিত এই স্থূলদেহের সম্বন্ধ অবগত হওয়া বুঝায়, বিদ্যাতত্ত্বেও তেমনি সূক্ষ্মদেহের সহিত শক্তির কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা অবগত হওয়া যায়। সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে ?

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।

ভোক্তুঃ সুখাদেরপি সাধনং ভবেৎ শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ॥

—রামগীতা, ২৯

—মন, বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ এই সপ্তদশাবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে জাত, স্থূলশরীর হইতে ভিন্ন এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার সাধনস্বরূপ যে দেহ, তাহাকেই সূক্ষ্মশরীর বলে। "তল্লিঙ্গমুচ্যতে" তাহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। বেদান্তশাস্ত্রমতে ইহার নাম "হৃদ্দেশে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ"।

মূলাধারস্থিতা শক্তিই জীবের জীবত্ব; এই শক্তিই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরোৎপত্তির কারণ এবং এই শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। ইনি কুলকুণ্ডলিনীরূপে সর্বজীবে অধিষ্ঠানপূর্বক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। ইনি মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্বরূপে জ্ঞানশক্তি, অহংতত্ত্বরূপে ইচ্ছাশক্তি এবং একাদশ ইন্দ্রিয়তত্ত্বরূপে ক্রিয়াশক্তি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ইনি বিদ্যারূপে বিশুদ্ধ জ্ঞান-প্রকাশিকা মুক্তিদাত্রী মহামায়া ঈশ্বরপ্রসবিনী কুণ্ডলিনীশক্তি এবং অবিদ্যারূপে অজ্ঞানপ্রকাশিকা সংসারাসক্তিকারিণী জগৎপ্রসাবনী আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপশক্তি বলিয়া কীর্তিতা হয়েন।

ইচ্ছাশক্তি—মূলা প্রকৃতিদেবী ইচ্ছাশক্তিরূপে বৈষ্ণবী হইয়া সত্ত্ব-গুণাবলম্বনপূর্বক পরমাত্মচৈতন্যকে বিষ্ণু সংজ্ঞা দিয়া লক্ষ্মীনারায়ণরূপে

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে, ভুবর্লোকে বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হইয়া ক্রিয়াশক্তি-প্রসূত যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহাই পালন করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মার নিবাস হতে উর্ধ্বে সেই স্থান।
অতি ভয়ানক পদ্ম ষড়্দল নাম॥
পদ্মমধ্যে বীজকোষ ভুবর্লোক নাম।
পরম আশ্চর্য স্থান অতি গুণধাম॥
পদ্মোপরি বামে লক্ষ্মী দক্ষে সরস্বতী।
উভয়ের মধ্যে বিষ্ণু অতি শান্তমতি॥
ব্রহ্মার জনিত সৃষ্টি চরাচর যত।
পালন করেন বিষ্ণু শ্রীবাণীসহিত॥

—শক্তি-ভক্তি-তরঙ্গিণী

ক্রিয়াশক্তি—প্রকৃতিদেবী ক্রিয়াশক্তিরূপে ব্রাহ্মী হইয়া রজোগুণাবলম্বনপূর্বক পরমাত্মচৈতন্যকে ব্রহ্মা সংজ্ঞা দিয়া সাবিত্রী-ব্রহ্মারূপে মূলাধার-চক্রে ভূলোকে অবস্থিত হইয়া ক্রিয়াশক্তির দ্বারা পৃথ্বীরূপ ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন। যথা—

বেদমাতা সাবিত্রী লইয়া বামভাগে।
বালকের ন্যায় ব্রহ্মা সৃষ্টি-অনুরাগে॥
সাবিত্রীর সাধন করিয়া বিধিমতে।
করেন প্রজার সৃষ্টি শক্তির বরেতে॥
পৃথিবীমণ্ডল এই ভূলোক নামেতে।
বসতি করেন ব্রহ্মা সাবিত্রী সহিতে॥

—শক্তি-ভক্তি-তরঙ্গিণী

জ্ঞানশক্তি—আবার প্রকৃতিদেবীই জ্ঞানশক্তিরূপে গৌরী হইয়া তমোগুণাবলম্বনপূর্বক পরমাত্মচৈতন্যকে হর বা মহেশ্বর সংজ্ঞা দিয়া

হরগৌরীরূপে মণিপুরচক্রে রুদ্রমূর্তি ধারণপূর্বক স্বর্লোকে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানশক্তিদ্বারা সংসার মোচন করেন। যথা—

বৈকুণ্ঠের উর্ধ্বদেশে পদ্ম মনোহর।
দশপত্র নীলবর্ণ অগ্নির আকার॥
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা রুদ্রের বামেতে।
সংহার করেন সৃষ্টি একই গ্রাসেতে॥
ব্রহ্মার সৃজন কর্ম বিষ্ণুর পালন।
সংহার করেন মহারুদ্র ত্রিলোচন॥
পালন করেন বিষ্ণু যত চরাচর।
ভোজন করিয়া কালী করেন সংহার॥

—শক্তি-ভক্তি-তরঙ্গিণী

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সম্ভূত স্থূল-সূক্ষ্মদেহের যাবতীয় তত্ত্বসকল বিশদরূপে জ্ঞাত হওয়াকে বিদ্যাতত্ত্ব এবং এই জ্ঞানকে বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান বলে। প্রত্যাহার ও ধারণা সাধনদ্বারা এই বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। মতান্তরে এই শক্তিত্রয়কে কেবল এক প্রকৃতি ও এক পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। যথা—

জ্ঞানশক্তির্ভবানীশ ইচ্ছাশক্তিরুমা স্থিতা।
ক্রিয়াশক্তিরিদং বিশ্বমস্য ত্বং কারণং ততঃ॥

—কাশীখণ্ড

পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হইলেন। ইনিই পুরুষ এবং ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া উকার, মকার ও আকার এই তিনটি বর্ণাত্মক (ওঁকার) উমা নাম্নী প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইলেন। পরে এই পুরুষ ও প্রকৃতি শিব ও শক্তি উভয়ে ক্রিয়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিলেন। যিনি এই ত্রিশক্তির স্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম।

পুরুষ বা শিবতত্ত্ব

জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ শিবতত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

সহস্রারস্য মধ্যস্থে সহস্রদলপঙ্কজে।
তন্মধ্যে নিবসেদ্ যস্তু শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তন্ত্রবচন

—শিরস্থিত সহস্রদলকমলে যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন, তিনিই পরমশিব। তাঁহার বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হওয়ার নাম শিবতত্ত্ব।

সহস্রারস্থিত পরমশিবই পরমাত্মা, আত্মাই পুরুষ বা ঈশ্বর-পদবাচ্য। ইনি সর্বজীবদেহে অবস্থানপূর্বক মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হন এবং অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবশব্দে কথিত হন। এই পরমাত্মচৈতন্যই মায়া ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বর ও জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার কারণ হওয়াতে ইহাকে কারণ-শরীর বলিয়া উক্ত করা যায়। কারণ-শরীর কাহাকে বলে? না—

অনাদ্যনির্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্ স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥

—রামগীতা, ৩০

এই কারণশরীর আদিরহিত, অনির্বাচ্য, মায়াপ্রধান, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে ভিন্ন, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কারণ হওয়াতে জ্ঞানিগণ ইহাকে কারণ-শরীর বলিয়া নির্দেশ করেন।

যদিও অবিদ্যাকে কারণ-শরীর বলে, কিন্তু চৈতন্যসংযোগ ব্যতীত কোন শরীরই স্থায়ী হইতে পারে না, এজন্য তন্ত্রশাস্ত্রমতে শিবতত্ত্বই

কারণ-শরীর। যোগের সপ্তমাঙ্গ যে ধ্যান, সেই ধ্যানদ্বারা এই কারণ-শরীর অনুভব হইয়া থাকে ; সাধক ধ্যান-নিমীলিতনেত্রে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন অর্থাৎ আমি কে ইহা আর জ্ঞাত হইবার বাকী থাকে না।

ব্রহ্মতত্ত্ব

বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব একত্র সম্মিলনেই ব্রহ্মতত্ত্ব। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।
তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তন্ত্রবচন

মূলাধার-কমলস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সহস্রারস্থিত পরমশিবের যে সম্মিলন, তাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলে।

প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরুষপক্ষ অবলম্বনপূর্বক কখনই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মভাবের নাম 'ব্রহ্ম'। যথা—

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—ভগবতীগীতা, ৪।১১

—শিবই পরম পুরুষ এবং শক্তিই পরমা প্রকৃতি ; তত্ত্বদর্শী যোগিগণ প্রকৃতি ও পুরুষের একতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবেন। কেননা—

ত্বমেকো দ্বিত্বমাপন্নঃ শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।—কাশীখণ্ড

—সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই শিব ও শক্তিভেদে দ্বিত্বভাবাপন্ন হইয়াছেন'।

বাহ্যজগতের মর্মে মর্মে যে মহতী শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রকৃতি এবং ঐ বাহ্যজগতে যে চৈতন্যস্ফূর্তি স্বপ্রকাশ রহিয়াছে, তাহারই নাম শিব বা পুরুষ। এই চৈতন্য এবং মহতীশক্তিকে সমষ্টি

করিয়া যখন একাসনে উভয়কে একত্র জড়িত বলিয়া অনুভব হইবে অর্থাৎ দুইয়ের একটিকে স্বতন্ত্র করিতে গেলে যখন দুইটিই অদৃশ্য হইবে বলিয়া বোধগম্য হইবে, তখনই ব্রহ্মকে চিনিতে পারিবেন।

সমাধিযোগ ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপবোধ হয় না। সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন অন্য কাহারও ব্রহ্মের স্বরূপবোধ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মে না। যথা—

আত্মানং পরমং বেত্তি যোগযুক্তং সমাধিনা।
যুক্তাহারবিহারশ্চ যুক্তচেষ্টশ্চ কর্মসু॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৩।৩৪

পরিমিত আহার-বিহারসম্পন্ন ও নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কর্মে তৎপর এরূপ যোগিব্যক্তিই সমাধি-যোগদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম সমাধিগম্য, সমাধিযোগ ভিন্ন তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মতা-ভাব কেবল সমাধি-অবস্থাতেই অনুভব হইয়া থাকে। তখন জানিতে পারা যায়, এক ব্রহ্মই চণকবৎ (ছোলার ন্যায়) দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছেন। এই সকল তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য সৃষ্টি ও স্রষ্টা বা জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্তব্য।

ব্রহ্মবিচার

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মবিচারকে মোক্ষদ্বারের অন্যতম দ্বারপালস্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যথার্থ যত্নশীল হন এবং শুভ ইচ্ছার সহিত ধীরভাবে আপনার অন্তরে সর্বদা তদ্বিষয়ক বিচার করিতে থাকেন, তিনি অচিরেই আপনার অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

সমুদ্রস্যেব গাম্ভীর্যং স্থৈর্যং মেরোরিব স্থিরম্।
অন্তঃশীতলতা চেন্দোরিবোদেতি বিচারিণঃ॥—যোগবাশিষ্ঠ

—যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করেন, তাঁহার অন্তঃকরণে সমুদ্রের ন্যায় গাম্ভীর্যগুণ, সুমেরুর ন্যায় স্থিরতা 'এবং চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা সমুদিত হয়।

অতএব প্রতিনিয়ত শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে ব্রহ্মবিচার করিবেন। ইহা বিষয়সুখের ন্যায় আশুপ্রীতিজনক না হইলেও দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস করা কর্তব্য। মহামতি ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকৈব।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সেবয়ৈব
স্বাদ্বী পুনর্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥

—পিত্ত দুষ্ট হইলে জিহ্বায় সিতা অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না, তিক্ত লাগে, কিন্তু আদরপূর্বক ঔষধের ন্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে, তদ্দ্বারা সেই পিত্তদোষ নিবারিত হইয়া ক্রমে তাহাতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার সম্যক্ স্বাদুতা অনুভূত হয়।

এইরূপ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ব্রহ্ম-বিচার ভাল লাগে না, কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য যদি (ভাল না লাগিলেও) যত্নপূর্বক কিছু কিছু করিয়া তাহার সেবা করে, তাহা হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া ক্রমে তাহার মনে ব্রহ্মবিচারে স্বাদুতা অনুভূত হয়।

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা।
ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥—যোগবাশিষ্ঠ

—যাহার চিত্ত গমনকালে, স্থিতিকালে, জাগ্রত অবস্থাতে এবং স্বপ্ন অবস্থাতে সর্বদা ব্রহ্মবিচারাসক্ত না হয়, সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা মৃত বলিয়া অভিহিত করেন।

যাঁহাদিগের মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় আপন মনের মধ্যে বিচার করিতে না পারেন, তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্বল হৃদয়ে কোন গভীর বিষয় কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অতি সামান্য আঘাতেই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সাধকের পক্ষে চিন্তাশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নতুবা যাঁহার মন যথার্থ চিন্তাশীল নহে, যিনি আপনার অন্তরে গভীর বিষয়-সকল বিচার করিতে পারেন না (অথবা করেন না), তিনি রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিলেও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকেন।

যদ্যপি বিশেষরূপে নিজ অন্তরে বিচার না করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় উপদেশ বা বড় বড় লোকের মত জানিয়া কোন সত্যকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলে পরীক্ষার সময় ঝড় আসিলে সে সত্য কখনই আর হৃদয়ে স্থান পায় না। অনেক লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে যে প্রতিদিন নূতন নূতন মতের বশীভূত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণই এই যে, তাঁহারা নিজ অন্তরে সেই গভীর বিষয়ের সম্যক্ চিন্তা করিতে অক্ষম। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব কহিয়াছেন—

অগৃহীতমহাপীঠং বিচারকুসুমক্রমম্।
চিন্তাবাত্যা বিধূনোতি ন স্থিরস্থিতিষু স্থিরম্॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—অকৃতজট অর্থাৎ অবদ্ধমূল হইলেও স্থির স্থানে স্থিত যে ব্রহ্মবিচার-স্বরূপ বৃক্ষ, তাহাকে চিন্তারূপ বায়ুসমূহে চালিত করিতে পারে না।

বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্তয়েৎ।
যোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্॥

—পঞ্চদশী

—বিচার হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা একবার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও উহা কখনও নিবারিত হইবার নহে।

ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র সমস্ত সাংসারিক অনিত্যবস্তুবিষয়ক সত্য-ভ্রমকে বিনাশ করিয়া থাকে।

অতএব যিনি পরব্রহ্মের সাধনাদ্বারা মুক্তিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি কোন শাস্ত্রকে, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া অন্ধ বিশ্বাসী হইবেন না। সৎযুক্তির সহিত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে৷ যাহা সত্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই যত্নের সহিত গ্রহণ করিবেন। যথা—

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরাঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।৮।১০

—মধুকর যেমন সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

যদি পুরাকাল হইতে সকলেই বিচার পরিত্যাগ করতঃ অন্ধবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া শাস্ত্রোপদেশমাত্রেরই অনুগামী হইতেন, তাহা হইলে মুনিঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরের মতের এত বিভিন্নতা ঘটিত না। এ বিষয়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—

নানা মতং মহর্ষীণাং সাধূনাং যোগিনাং তথা,
দৃষ্ট্বা নির্বেদমাপন্নঃ কো ন শাম্যতি মানবঃ?

অতএব কেবলমাত্র শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিবেন না। যুক্তিকেও অবলম্বন করা চাই, কারণ যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম নষ্ট হয়।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥—যোগবাশিষ্ঠ

—বালক যদ্যপি যুক্তিযুক্ত বাক্য কহে, তাহাও আদরপূর্বক অবশ্য গ্রহণ করা উচিত ; আর অযুক্তিকর কথা ব্রহ্মা কহিলেও তাহা তৃণের ন্যায় ত্যাগ করা কর্তব্য।

কিন্তু ব্রহ্মবিচার কর্তব্য জানিয়া যেন কেহ কুতার্কিকতা অবলম্বন না করেন। কারণ তদ্দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া কেবলমাত্র অনিষ্ট-সংঘটনই হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণও এ বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন। যথা—

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্।
—পঞ্চদশী, ৭।২৯,৩০

—যদি স্বীয় অনুভবেতে বিশ্বাস না হয়, তবে কেবল তর্কদ্বারা তার্কিকেরা কি প্রকারে তর্কনিরূপণ করিতে পারিবে? যেহেতু তর্কের সমাপ্তি নাই ; অর্থাৎ এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা এক প্রকার নিশ্চয় করে, তাহা হইতে বুদ্ধিমান্ আর এক ব্যক্তি তাহা খণ্ডন করিয়া অন্য প্রকার নিরূপণ করিতে পারে। অতএব সাধক আপনার হৃদয়ে আপনি বিচার করিবেন এবং যে বিষয়গুলি আপনি সিদ্ধান্ত করিতে না পারিবেন, অথবা যেগুলিতে তাঁহার সন্দেহ হইবে, সেইগুলির মীমাংসাকরণার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন মাত্র। বস্তুতঃ কুতর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না, যেহেতু কুতর্কের দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় দূরে থাকুক, সমূহ অনিষ্ট সংসাধিত হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থী সাধক ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে নিয়ত সৎযুক্তির সহিত ব্রহ্মবিচার করিবেন।

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥

—পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ১৫

—বিচারদ্বারা পরমাত্মবিষয়ক দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যথা—পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান ; তাহার মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান হইলেও যতদিন পর্যন্ত অপরোক্ষজ্ঞান না হইবে, ততদিন পর্যন্ত বিচার করিবে, পশ্চাৎ অপরোক্ষজ্ঞান হইলে আপনা হইতেই বিচারের সমাপ্তি হইবে।

বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ।
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥—পঞ্চদশী, ৯।৩৩

—যদি মরণ পর্যন্ত বিচার করিয়াও আত্মলাভ না হয়, তথাপি তাহা নিরর্থক হইবার নহে। কারণ এ জীবনে না হইলেও পরজীবনে তাহা সম্পন্ন হয়।

প্রকৃত ভক্তিযোগে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যথাসময়ে ব্রহ্মবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মবাদ

আগে ব্রহ্ম কি, তাহাই অবধারণ করিতে হইবে।

যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ সর্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদব্রহ্মলক্ষণৈঃ ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র

—যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ইহা অবস্থিতি করিতেছে এবং সৃষ্টির অব্যক্ত অবস্থায় এ সমস্তই যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিও।

এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপতঃ দেশকালাদিতে পরিচ্ছেদ নাই। সেই পূর্ণপুরুষ পূর্ণভাবে সর্বদা বিরাজিত আছেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

—কঠোপনিষৎ, ২।৩।১২

এই পরমাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা অথবা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল জগতের মূল অস্তিস্বরূপে তাঁহাকে জানা যায় মাত্র। অতএব অস্তিস্বরূপে তাঁহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞানগোচর তিনি কিরূপে হইবেন ?

ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্র পুরাতন বাইবেলে এই বিষয়ের একটি সুন্দর কথা আছে। যথা—

And God said unto Moses, 1 AM THAT I AM; and He said, Thus shalt thou say unto the children of Isreal, I AM hath sent me unto you.—*EXODUS* III. 14.

একদা রাজর্ষি জনক উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিয়াছিলেন—তমালবনে অদৃশ্য সিদ্ধগণ এইরূপ গাথা গান করিতেছেন—

অশিরস্কমাকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥—যোগবাশিষ্ঠ

—যিনি মস্তকাদি অবয়বরহিত, যিনি প্রত্যেক বস্তুতে সমভাবে অবস্থিত, যিনি "আমি আছি" এই কথা অজস্রবার উচ্চারণ করিতেছেন, আমরা সেই পরমাত্মাকে উপাসনা করি।

যাঁহাদিগের শুনিবার শক্তি আছে, বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে পরমেশ্বর প্রত্যেক স্থান হইতে অবিরত উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "আমি আছি" "আমি আছি"। তাঁহারা আরও শুনিতেছেন, বৃক্ষলতাগণ নিঃশব্দে তাঁহারই কথা বলিতেছে, চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহগণ ঘোররবে মহাগগনে তাঁহারই

অস্তিত্বের প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, গর্ভস্থ শিশুও যোড়করে সমস্ত জগদ্বাসীকে সেই পরমেশ্বরের মহান্ সত্তাতে বিশ্বাস করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে। অতএব সেই সকল জ্ঞানাভিমানী অজ্ঞানান্ধ জীবগণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বাহ্য সভ্যতাকে ধিক্, যাহাদের অপবিত্র কর্ণ এরূপ পবিত্রতম গম্ভীর শব্দ শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম যে বেদান্তমূলক, সেই বেদান্তমতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে না। তিনি অনাদি ও অনন্ত। এই ব্রহ্মই যদি একমাত্র অদ্বিতীয় নিত্যবস্তু হন, তবে তাঁহার স্বরূপ কি ? তিনি একমাত্র সত্তাস্বরূপ বলিয়া বৈদিক ঋষি উদ্দালক তাঁহাকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন। এ জগতে সেই সত্তার চৈতন্যরূপের পরিচয় সর্বত্রই। অতএব সেই সত্তা চৈতন্যস্বরূপ। তাই ঋগ্বেদে তিনি চিৎরূপে উক্ত হইয়াছেন। যাহা চিৎস্বরূপ, তাহা অবশ্য আনন্দময়। সুখের অভাবেই দুঃখ। সুখের অনন্ত রূপই নিত্যানন্দ। এ জগতে যে সুখের পরিচয় আছে, সেই সুখ অপরিচ্ছিন্নরূপে অনন্ত হইলেই নিত্যানন্দময় হয়। তাই পরম-ঋষি সনৎকুমার ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ "সচ্চিদানন্দ"।

ব্রহ্ম যদি একমাত্র নিত্যবস্তু হন, তবে আমরা যে পরিবর্তনশীল জগৎ দেখিতেছি, এ জগৎ কি ?—এ সমুদয় তাঁহারই রূপ।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

এ জগৎ সমুদয়ই ব্রহ্ম, যেহেতু—তজ্জ—তাঁহা হইতে জন্মে, তল্ল—তাঁহাতে লীন হয়, এবং তদন্—তাঁহাতে স্থিতি করে বা চেষ্টিত হয়। সুতরাং এই পরিবর্তনশীল জগতের সহিত অনন্ত ব্রহ্মসত্তার সামঞ্জস্য এই যে, জগৎ যদি ব্রহ্মে লীন হয়, তবে তাঁহার সে জগতের লীনাবস্থা আছে। সেই লীনাবস্থাই নির্গুণ বীজাবস্থা। যেমন বীজ বৃক্ষে লীন থাকে, তেমনি এ জগৎ এককালে ব্রহ্মরূপ অনন্ত বীজসত্তায় লীন থাকে।

তাই যদি হয়, তবে ব্রহ্মের সেই বীজাবস্থা অবশ্য জগৎ-রূপ ব্যক্ত ও বিরাট্ অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তাহা স্বরাট্ অব্যক্ত অবস্থা, আর এই জগৎ তাঁহার সেই বীজাবস্থার ব্যক্ত রূপ। এই ব্যক্ত রূপই চেষ্টিত অবস্থা, সুতরাং অব্যক্ত অবস্থা নিশ্চেষ্ট। চেষ্টা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত। সুতরাং নিশ্চেষ্ট অবস্থায় এই ত্রিবিধ চেষ্টা যদি লীন থাকে, তবে সেই অব্যক্ত ও বীজাবস্থায় নিশ্চেষ্টতাবশতঃ তাহা নির্গুণ। অতএব যখন বেদান্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্গুণ, তখন বুঝিতে হইবে, সেই নির্গুণ শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয় এবং সগুণ শব্দের অর্থ সচেষ্ট বা সক্রিয়। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম বলিলে এমত বুঝায় না যে তাঁহাতে গুণের একেবারে অভাব; তাঁহাতে ঐ ত্রিগুণের একেবারে অভাব নহে, গুণ তাঁহাতে অন্তর্লীন মাত্র।

অতএব বেদান্ত যেমন বলিয়াছেন, এ জগৎ এককালে ব্রহ্মে লীন হয়, তেমন আবার বলিয়াছেন, এ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতে অবস্থিত থাকে; এই উৎপন্ন শব্দের অর্থ এমন নহে যে, পূর্বে যে বস্তু ছিল না, সেই বস্তুর সহসা উদ্ভব হইল; ইহার অর্থ, সেই অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার বীজাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আসিলেন। প্রথমে সেই অনন্ত নির্গুণ সত্তা এক অনন্তগুণমাত্রব্যঞ্জক সগুণ সত্তারূপে দেখা দেয়। তাহার নামই মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব ক্রমশঃ বিশ্ববিকাশিনী বা সৃষ্টিকারিণী সূক্ষ্ম-শক্তিসমূহে বিবৃদ্ধ হয়। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার সাত্ত্বিক ক্রিয়াশীলতার নামই সগুণ মহত্তত্ত্ব। এই শুদ্ধসত্ত্ব সগুণ মহত্তত্ত্বই ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। কিন্তু ইনি সগুণ হইয়াও গুণাতীত; কেননা গুণের দ্বারা তিনি ক্রিয়াপর নহেন; গুণ তাঁহাতে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য করিতেছে মাত্র। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ ঈশ্বর—যেমন এক অগ্নি হইতে অগ্ন্যন্তর। দীপ-শলাকায় যেমন অব্যক্ত আলোক নিহিত থাকে, তাহাকে জ্বালিলেই সে যেমন আলো প্রকাশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম অব্যক্ত এবং ঈশ্বর ব্যক্ত। কিন্তু

দীপশলাকায় অব্যক্ত আলোক আপনি ব্যক্ত আলোকরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ সে জলিয়া আলোক হয়; ব্রহ্ম নিত্যবস্তু, তিনি থাকেন, তাঁহা হইতে ঈশ্বর হন।

আসীদিদং তমোভূতং অপ্রজ্ঞাতং অলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যং অবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥—মনুসংহিতা

—বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের যে অবস্থা, তাহা অপ্রজ্ঞাত, অপ্রতর্ক্য, অলক্ষণ (লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ হয় না) এবং বাক্য-মনের অতীত।

সৃষ্টির অতীত সেই অবস্থাকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। এই নির্গুণ নিরাকার বাক্যমনের অতীত সেই ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু অর্থাৎ সৃষ্টি-ইচ্ছুক হইলেন, তখনই তিনি বিকারবান্ ও সগুণ হইলেন। কেননা ইচ্ছা হইলে গুণ হইল এবং যে অবস্থায় ছিলেন, তাহার বিকৃতি হইল। এই যে অবস্থা, ইহাই ঈশ্বর।—অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত হইয়া যিনি নির্গুণ ও নিরাকারভাবে অবস্থিত ছিলেন, সৃষ্টিকরণেচ্ছাযুক্ত হওয়াতে তিনিই সগুণ সাকার হইলেন। তথাপি তিনি নিত্য, এই অবস্থাটুকু ভাবজ্ঞেয়। আবার নির্গুণই সগুণ হইলেন—ইহাও ভাবজ্ঞেয়।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥—মনুসংহিতা

—যিনি পূর্বে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় হইয়া অব্যক্ত ও অচিন্ত্যভাবে অবস্থিত ছিলেন, তিনিই ব্যক্তীকৃত হইয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ স পুরুষবিধঃ।—শ্রুতি

—এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন, তিনি পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় শিরঃপাণ্যাদি অবয়ববিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইলেন।

তবে কি ঈশ্বর আমাদের ন্যায় অবয়ববিশিষ্ট? শাস্ত্র বলেন—
কর্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্ত, শরীরসিদ্ধিঃ স্বত এব জাতা।
ঘটস্য কর্তা খলু কুম্ভকারঃ, কর্তা শরীরী ন চ নাশরীরী ॥—শতদূষণী

যখন সৃষ্টিকার্যে কর্তা পুরুষকে মানা যায়, তখন তাঁহার শরীরসিদ্ধি সহজেই উপলব্ধি হয়। তাঁহাকে সগুণ বলিয়া মানিলে গুণের আশ্রয় না মানিলে চলিবে কেন? লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর বা কারণশরীর বলিতে পার। আশ্রয়-স্থানকেই শরীর বলে।

পূর্বাবস্থোত্তরাবস্থায়াঃ কারণমভ্যুপগমাৎ।—শাঙ্করভাষ্য

পূর্বাবস্থা যদ্রূপ হয়, উত্তরাবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। নাম-রূপময় জগৎ যাঁহা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাঁহার নাম-রূপ না থাকিলে—রূপময় জগৎ কি প্রকারে রূপ ধারণ করিতে পারিত? ব্রহ্ম সগুণ হইয়া প্রথমে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে তিন বিগ্রহরূপে দেখা দিয়াছিলেন। যথা—

একং ব্রহ্ম ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।

এক ব্রহ্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র যে এই ত্রিবিধ মূর্তিকেই তিনি ধারণ করিলেন, তাহা নহে।

সোঽকাময়ত অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়।—শ্রুতি

তিনি কামনা করিলেন, "আমি বহু প্রজা হইব।" তাহাতেই তিনি বহুবিগ্রহ ধারণ করিলেন।

সর্বান্ পাপান্ ঔষৎ। ভয়রতিসংযোগশ্রবণাচ্চ॥—শ্রুতি

—শরীরধারীর ন্যায় কাম-ক্রোধ-ভয় সকলই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেবল সৃষ্টির রক্ষার্থ, পালনার্থ ও সংহারার্থ।

একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্মপ্রবৃত্তিজঃ।
দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি সঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ

—সেই একই দেব বাহ্যকার্য সম্পাদন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেবাদি আবরণে আবৃত হইলেন এবং দেবতা হইয়া দেবতান্তর ভাব গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সাধকভাবাপন্ন জীবের যাহাতে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়, যাহাতে সৃষ্টের জন্মসাফল্য লাভ হয়, তাহা করিলেন। তাহার জন্য

"ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"। ব্রহ্ম আপনাকে বহুবিধরূপে কল্পিত করিলেন।*

অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

—কঠোপনিষৎ, ২।২।৯

—অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকার সেই এক ও সর্বভূতাত্মা বহির্ভাবে নানা রূপ গ্রহণ করিলেন।

অতএব ইচ্ছাময় ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি ও সৃষ্ট পদার্থের জন্য নির্গুণ হইয়াও সগুণ এবং নিরাকার হইয়াও সাকার হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই মহত্তত্ত্বই ঈশ্বরচৈতন্যের উপাধি; এই উপাধি নির্মল জ্ঞানময় সত্তা। এই নির্মল মহত্তত্ত্ব কখন কখন মন বা বুদ্ধি নামেও অভিহিত হন। যেমন ব্রহ্ম মহত্তত্ত্ব ঈশ্বরচৈতন্যরূপে বিবর্তিত হন, তেমনি সেই মহত্তত্ত্ব হইতে যখন আবার বিশ্বশক্তির পরিণাম ঘটে, সেই ঈশ্বরচৈতন্য আবার সেই সমস্ত শক্তির চৈতন্য বা আত্মারূপে দেখা দেন।

এই মহত্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বের শক্তিময় অখণ্ডস্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ডেই অবিশেষ মহত্তত্ত্ব হইতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় বীজোৎপত্তি। এই বিশেষ জাতীয় বীজসত্তাই বৈশেষিকের বিশেষ পদার্থ, পরমাণুবাদীর বিশেষ বিশেষ পরমাণু-জগৎ, বেদান্তীর হিরণ্যগর্ভ, পৌরাণিকের ব্রহ্মা, জাতিবাদীর জাতিসমষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মার কায়া। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীব পর্যন্ত নৈয়ায়িকদের আরম্ভবাদভুক্ত। ঈশ্বর-চৈতন্য এই শক্তিসমূহের আত্মারূপে অবস্থিত হইলে তাঁহাকে কূটস্থচৈতন্য বলে। এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে যখন বিরাট বিশ্ব প্রসূত হয়, তখন এই কূটস্থ-

* কৃদন্ত কল্পনা শব্দের যোগে কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া "ব্রহ্মণঃ" এইরূপ পদ হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের রূপকল্পনা এইরূপ না হইয়া, ব্রহ্ম আপনাকে অনেক রূপে কল্পনা করিয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

চৈতন্য চেতন-অচেতন জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের আত্মারূপে দেখা দেন। প্রতি জীবের অন্তরে অন্তরে কূটস্থচৈতন্য আত্মারূপে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থাই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎ। যাহা শক্তির আত্মস্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত হইলে, সেই কূটস্থচৈতন্য প্রতি চেতন জীবের আত্মরূপে এবং অচেতন জীবেরও আত্মরূপে অবস্থিত থাকেন। যাহা এই জীব-চৈতন্যের উপাধি, তাহাই জীব নামে অভিহিত।

বৈদিক সৃষ্টিকাণ্ড হইতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, প্রথমতঃ-সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বশক্তি নির্গুণ পরমব্রহ্মই উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বশক্তিপূর্ণ; সুতরাং তাঁহাতে জ্ঞানশক্তি ও অজ্ঞানশক্তি দুই পদার্থ এবং সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দুইটিই আছে। লীলা করিবার ইচ্ছাও আছে, অনিচ্ছাও আছে। একটি আছে আর একটি নাই, পরিপূর্ণ পরব্রহ্মে একথাটি খাটিবে না, সুতরাং তাঁহার যে অজ্ঞানশক্তি আছে, তিনি তাহার বিকাশ করেন; ইহা অনুপপন্ন কথা নহে। তাঁহার অজ্ঞানশক্তি নাই বা তিনি অজ্ঞানশক্তির বিকাশ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহাকে অপূর্ণ বলা হয়। অতএব লীলাময় লীলার জন্যই অসদ্ভাবময় অজ্ঞানশক্তি বিকাশ করেন। পরব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত; সুতরাং অজ্ঞানশক্তি তাঁহার সর্বাংশ ব্যাপিয়া আবির্ভূত হয় না, কিয়দংশ ব্যাপিয়াই আবির্ভূত হয়। শ্রুতি সেই কথাই বলিয়াছেন,—

পাদোঽস্য সর্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

—এই সমুদয় ভূত তাঁহার একপাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত, নিত্যমুক্ত ও স্বর্গে অবস্থিত।

ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনের নিকট—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

—গীতা, ১০।৪১, ৪২

—ইহাই বলিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্য সমর্থন করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টিকালে তাঁহার সমুদয় ব্রহ্মসত্তাংশ ব্যাপিয়া অজ্ঞানশক্তি আবির্ভূত হয় না, তাঁহার অমৃত ত্রিপাদ অব্যাহত থাকে। কেবল যাহা চিরকাল সগুণ হইতেছে, সেই অংশমাত্রই সগুণভাব প্রাপ্ত হয়। সেই সগুণভাব-প্রাপ্ত অংশই বা সগুণব্রহ্মই পরমেশ্বরপদবাচ্য।

তিনি আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টি করেন এবং সেই সূক্ষ্মভূত-পঞ্চকের প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও সমস্ত সাত্ত্বিকাংশ মিলাইয়া অহঙ্কার, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সৃষ্টি করেন ; আর সেই ভূতের সাত্ত্বিকাংশ দ্বারা প্রাণ-অপানাদি পঞ্চবৃত্তিক প্রাণের সৃষ্টি করেন।

সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণপঞ্চক ও সাহঙ্কার অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম ভূত-পঞ্চকের আশ্রয়েই থাকে। তাহাতে হয় এই যে, ঐ সপ্তদশটি পদার্থ মিলিয়া দেহের ন্যায় অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন দেহ প্রস্তুত হইয়া পড়ে। সেই দেহে পরমেশ্বরের হিরণ্ময় জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, কারণ ঐ দেহ অতীব স্বচ্ছ। তদ্দ্বারা ঐ দেহ চেতয়মান হয় এবং হিরণ্যগর্ভ নাম প্রাপ্ত হয়। হিরণ্যগর্ভের ব্যবহারিক নাম সাধারণতঃ ঈশ্বর বা নারায়ণ। ইহার অংশই মুক্তজীব বা ব্যষ্টিতে ইনিই তৈজস নাম পাইয়া থাকেন।

আবার ইনিই স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাট্ মূর্তি বা গীতোক্ত বিশ্বরূপ নাম প্রাপ্ত হন। বিরাটের অংশই বৈশ্বানর বা ব্যষ্টিতে স্থূলদেহাভিমানী বদ্ধজীব। এই বিরাট্ প্রজাপতি বা চতুর্মুখ ব্রহ্মাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। বলা বাহুল্য, সূক্ষ্মের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর এবং স্থূলের সৃষ্টিকর্তা বিরাট্ পুরুষ বা পিতামহ ব্রহ্মা।

চৈতন্য তবে চতুর্বিধ—ব্রহ্মচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্য। চৈতন্য এই চতুর্বিধ আকারেই অনন্ত। তিনি অনন্তরূপে এই বিশ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্ব ত খণ্ডিত জীবপূর্ণ, তবে ব্রহ্মচৈতন্য অনন্তরূপে আছেন কি প্রকারে? বিশ্ব সেই খণ্ডিত জীবপূর্ণ হইয়াও অনন্ত, এজন্য অনন্ত ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়াছেন। কেবল স্থূলদর্শীর নিকট বিশ্বের খণ্ডিত রূপ। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বদর্শীর নিকট এ বিশ্বের জীবরূপ সমস্ত খণ্ডিতাকার ধারণ করিলেও তাহা ব্রহ্মব্যতীত অন্যরূপে প্রতীত হয় না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্মে সকল এবং ব্রহ্ম সকলে; তিনি সকলের সব, সবের সকল। সর্বত্রব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে বর্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রকাণ্ড উদরে অর্থাৎ এই মহা-চিদ্‌গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে।—

তত্র ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি সন্ত্যসংখ্যানি ভূরিশঃ।
তান্যন্যোন্যমদৃষ্টানি ফলানীব মহাবনে॥—যোগবাশিষ্ঠ

—মহাবনে যেমন অসংখ্য ফল থাকে, তাহার ন্যায় এই মহা-চিদ্‌গগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে, কিন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড পরস্পর দৃষ্ট হয় না।

তথা বিস্তীর্ণসংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ।—যোগবাশিষ্ঠসার, ১০।১৬

এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ, তাহাই অখণ্ডিত ব্রহ্মের রূপ। এই সমুদয় বিশ্ব সেই বিরাট পুরুষের অবয়ব মাত্র।

চৈতন্যাৎ সর্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ॥—শিবসংহিতা, ১।৮২

—যদি জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; পরন্তু যদি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই আছেন, অপর কিছু নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে এই জগতের অস্তিত্ব আছে কি-না ? এ সম্বন্ধে বেদান্ত বলেন,—

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥—শ্রুতি

স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং আমি স্বপ্ন দেখিতেছি বলিয়া কখনই বোধ হয় না, সেইরূপ মায়াবলে এই অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে এবং আমি যে মায়া-বিমোহিত হইয়া এরূপ দেখিতেছি, তাহা কখনই বোধ হয় না। স্বপ্নকালে যেরূপ সুন্দর প্রাসাদসন্নিবেশ ও অতিশয় সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন অসত্য গন্ধর্বনগর সত্যরূপে দৃষ্ট হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে তাহা অলীকবশতঃ তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞানবস্থায় এই জগৎ সত্যবৎ প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞানোদয় হইলে এই জগতের অস্তিত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এজন্য বেদান্ত-বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য, মিথ্যা, ভ্রমাত্মক ও অলীক বলিয়া জানেন। আবার বেদান্তশাস্ত্রে আছে যে—

পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।—শ্রুতি

যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল অগ্নির স্বরূপ, সেইরূপ সহস্র সহস্র প্রকার জীবসংযুক্ত এই অপরিসীম জগৎ তাঁহার স্বরূপ।

কেহ বলিতে পারেন, তবে এই জগৎকে কি প্রকারে অলীক ও ভ্রমাত্মক বলিতে পারা যায় ? এ কথার মীমাংসা এই যে,—

মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতাঽন্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥—শ্রুতি

মৃত্তিকা, লৌহ, বিস্ফুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্তদ্বারা যে সৃষ্টিপ্রকার শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা জগৎ, জীব ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ—কোন দ্বৈতবাদ প্রতিপাদনার্থ নহে।

যেরূপ এক অপরিচ্ছিন্ন আকাশে ঘটাকাশ, পটাকাশ ও মহাকাশ ইত্যাদি নানারূপে দ্বৈতকল্পনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক আকাশ একই অদ্বৈত মাত্র, এই জগৎ জীব ও পরমাত্মার ভেদও তদ্রূপ জানিবে। অতএব,—

ইদং সর্বং পরমাত্মেতি শ্রুতেঃ।

—শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই; এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মময়।

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন।
ন পৃথঙ্ নাপৃথক্কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥—শ্রুতি

—তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মা আত্মস্বরূপ. নানাপ্রকার নহেন, কিন্তু নানা বস্তুর অন্তর্বর্তীরূপে বিদ্যমান আছেন।

যেরূপ রজ্জু স্বীয় আকারে অবস্থিত থাকিয়াও সর্বপ্রকারে সর্পরূপে কল্পিত হয়, আত্মাও সেইরূপ স্বরূপে অবস্থানপূর্বক অনন্তভাবে কল্পিত হইয়া থাকেন। এজন্য আত্মা প্রকৃতপক্ষে কল্পিত পদার্থ হইতে কোনরূপ ভিন্ন বস্তু নহেন।

অভেদপ্রত্যয়ো যস্তু জগতাং পরমাত্মনা।
সৈব তত্ত্বমতির্জ্ঞেয়া দেবানামপি দুর্লভা॥—বেদান্ত

—পরমাত্মার সহিত জগতের অভেদজ্ঞান অর্থাৎ ঘট-পটাদি যাবদ্বস্তুতে পরমাত্মজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য। অতএব—

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥—শ্রুতি

পৃথিব্যাদি বাহ্য তত্ত্ব ও মনোবুদ্ধি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মপরায়ণ হইবে। সমাহিতচিত্তে "সোঽহং" অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম এবং "ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই" সর্বদা এইরূপ অদ্বৈত ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিবে। পৃথিব্যাদি বাহ্য পদার্থসমুদয় রজ্জুতে সর্প-

ভ্রমের মত সেই পরমাত্মাতে থাকা বশতঃ ভ্রম হইতেছে মাত্র। অনন্ত-চিত্তে তত্ত্ব পর্যালোচনা করিলেই সেই অদ্বৈত আত্মার দর্শনলাভ হইয়া থাকে এবং তখনই আত্মজ্ঞান পরিপক হয়।

প্রকৃতি ও পুরুষ

অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় পরমাত্মাই প্রকৃতি ও পুরুষভেদে দ্বিত্ব-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং স্বপ্রকাশ হইলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়হেতু ব্রহ্মানন্দরস উপভোগজন্য আর অন্য কেহ না থাকায় বহু হইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। যথা—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।
ইত্যুপক্রম্য তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

আরুণি কহিলেন, হে শ্বেতকেতো! সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ কেবল সৎমাত্র ছিল, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, সেই এক এবং অদ্বিতীয় সৎ আলোচনা করিলেন, আমি প্রজারূপে বহু হইব।

ব্রহ্ম বহু হইব বলিয়া আলোচনা করিলেন সত্য, কিন্তু কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহু হইলেন?—না—

সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী।
মায়াচ্ছাদিতাত্মানং চণকাকাররূপিণী ॥
মায়াবল্কলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।
শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা ॥—মহানির্বাণতন্ত্র

— সত্যলোকে আকাররহিত মহাজ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাজ্যোতিঃস্বরূপা নিজ মায়াদ্বারা নিজে আবৃত হইয়া চণকতুল্য স্বভাবে বিরাজিত আছেন। চণক অর্থাৎ ছোলাতে যেরূপ একটি আবরণ (খোসা)-মধ্যে

অঙ্কুরসহ দুইখানি দল (দাল) একত্র এক আবরণে আবদ্ধ থাকে, প্রকৃতি-পুরুষও সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যসহ মায়ারূপ আচ্ছাদনে আবৃত থাকেন। সেই মায়ারূপ বল্কল (খোসা) ভেদ করিয়া শিব-শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টিবিন্যাস হইয়াছে।

প্রকৃতি-পুরুষকে "ব্রহ্মচৈতন্যসহ" বলিবার প্রয়োজন এই যে, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জীবদেহ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা চেতনাবান হয়, ব্রহ্মচৈতন্য পরিত্যক্ত হইলে জীবশরীরে কেবল জড়মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

"আমি বহু হইব" ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সঞ্জাত হইলে ইনি প্রকট-চৈতন্য বা পুরুষ হইলেন ও সেই বাসনা মূলাভীতা মূল-প্রকৃতি হইলেন।

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ মায়া নিত্যা সনাতনী।
যথাত্মা চ তথা শক্তিঃ যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

— পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ সৃষ্টিকার্যের জন্য যোগাবলম্বন করিয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ঐ ভাগদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণ অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও বামার্দ্ধাঙ্গ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মরূপিণী, মায়াময়ী, নিত্যা ও সনাতনী। যেরূপ অগ্নি থাকিলেই তাহার দাহিকাশক্তি থাকে, সেইরূপ যে স্থানে আত্মা সেই স্থানেই শক্তি এবং যে স্থানে পুরুষ সেই স্থানেই প্রকৃতি বিরাজিতা আছেন।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১০

পরমাত্মার মায়াকেই প্রকৃতি বলা যায়। সেই পরমাত্মা যখন মায়াবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহাকে মায়ী বলে। সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মার অবয়বরূপ বস্তুসমুদয়দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥—গীতা, ১৩।২০

—পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখ-দুঃখ-মোহ প্রভৃতি গুণসমুদয় প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥—গীতা, ৯।৮

—স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমি প্রকৃতির বশে অবশ এই সমস্ত ভূতগ্রাম সৃজন করিয়া থাকি।

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥—গীতা, ১৩।২১

—কার্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতিই কারণ এবং সুখ ও দুঃখ ভোগবিষয়ে পুরুষই কারণরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

কার্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।

ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥—ভাগবত, ৩।২৬।৮

—কার্য ও কারণ অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের প্রতি প্রকৃতিই কারণ; আর সুখদুঃখ-ভোগবিষয়ে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে পুরুষ, তিনিই কারণ।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক ব্রহ্ম জগৎরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন বলিয়া "হরগৌর্যাত্মকং জগৎ" বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষযোগে সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার জন্য সেই একমাত্র পরমাত্মায় দ্বৈতারোপ করা হইয়াছে; কিন্তু এই দ্বৈতাভাস মিথ্যা। কারণ—

শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।

শক্তিমান্ হইতে শক্তি কখনও বিভিন্ন হইতে পারে না। যথা—

যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।

নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োর্যথা ॥—বায়ুপুরাণ

—চন্দ্র হইতে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, শিব এবং শক্তিরও সেইরূপ পৃথক্ সত্তা নাই। এজন্য যেখানে শিব, সেইখানেই শক্তি এবং যেখানে শক্তি, সেইখানেই শিব বলিয়া জানিও।

যোগিবর গোরক্ষনাথ বলেন—

কটুত্বং চৈব শীতত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৫।১১৫

—যে প্রকার কটুত্ব, শৈত্য ও মৃদুত্ব জল হইতে ভিন্ন নহে, তদ্রূপ আত্মা ও প্রকৃতি আমার নিকট অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।

জল এবং কটুত্বাদি জল হইতে ভিন্ন হইয়াও যেরূপ অভিন্ন, আত্মা ও প্রকৃতি তদ্রূপ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। তবে সাঙ্খ্য বলেন—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥—সাঙ্খ্যকারিকা

প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধস্থানীয়; পুরুষ অকর্তা, সুতরাং পঙ্গু-স্থানীয়। উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না এবং পঙ্গু চলিতে পারে না, কিন্তু অন্ধের স্কন্ধে পঙ্গু উঠিলে পঙ্গু পথ দেখায়, অন্ধ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষে সংযুক্ত হইয়া একের অভাব অন্যে পূরণ করেন, তাঁহাদের সংযোগের ফলে সৃষ্টি সাধিত হয়।

অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন হইলেও কার্যভেদে তাঁহারা দ্বিত্ব-ভাবাপন্ন হইয়াছেন। এজন্য উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। অর্থাৎ এই গুণত্রয় যখন সমভাবে অন্যূনাতিরিক্তভাবে অবস্থান করে, তখনই তাহা প্রকৃতি-

পদাভিধেয় হয় ; আবার যখন তাহার ন্যূনাধিক্য ঘটনা হয়, একটি প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্যটিকে অভিভূত করে, অল্পে অল্পে তখন তাহার নাশ-পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব ; দ্বিতীয় পরিণামের নাম অহংতত্ত্ব ; তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু ; চতুর্থ পরিণাম জগৎ। স্থূল কথা, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম যাহাকিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ের মূল স্থূলভূত। স্থূলভূতের মূল সূক্ষ্মভূত। সূক্ষ্মভূতের মূল অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের মূল মহত্তত্ত্ব। যাহা মহত্তত্ত্বের মূল, তাহাই প্রকৃতি। জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি, আর প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা জগৎ।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

—প্রকৃতি একা, অজা (জন্মরহিতা,) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী)। প্রকৃতি তুল্যজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী।

অজা বলিবার কারণ এই যে, পরমব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিতে উদ্ভূতা এই মাত্র। যেমন ফুলের গন্ধ। গন্ধ ফুল হইতে জন্মে না, ফুলের প্রাকৃতিক ধর্মেই গন্ধ আছে। তৎপরে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া রূপান্তর হয় মাত্র। প্রকৃতির আদি অন্ত নাই। কারণ প্রকৃতি নিত্য সদ্বস্তু। সতের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। যথা—

নাসদুৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি।—সাঙ্খ্যকারিকা

অসতের উৎপত্তি নাই ; সতেরও বিনাশ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই কথা বলিয়াছেন। যথা—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।—গীতা

অতএব জড়জগতের যে অপরিচ্ছিন্ন নির্বিশেষ মূল উপাদান, তাহাকেই প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে eternal homogeneous matter বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির আর

একটি নাম অব্যক্ত। তাহার কারণ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত (unmanifest) অবস্থায় থাকে। অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থার নাম সৃষ্টি। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।

—প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয় এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়।

অতএব সমস্ত মহাভূতের যে অতি সূক্ষ্মাংশ, অর্থাৎ যে মূল পদার্থ হইতে মহদাদি অণু পর্যন্ত সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি, অবিদ্যা ও মায়া নামভেদে দুই প্রকার। যথা—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।—পঞ্চদশী

—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বসংযুক্ত, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি, সত্ত্বগুণের শুদ্ধির তারতম্যে "মায়া" এবং "অবিদ্যা" এই দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সত্ত্বগুণ যখন তমঃ ও রজঃ এই দুই গুণদ্বারা কলুষিত না হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের শুদ্ধি বা সত্ত্বপ্রধান বলে এবং যখন সত্ত্বগুণ তমঃ ও রজঃ এই গুণদ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের অবিশুদ্ধি বা মলিনসত্ত্বপ্রধান বলে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ব্যষ্টীভূত মলিনসত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানই "অবিদ্যা" এবং সমষ্টীভূত শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই "মায়া"। অবিদ্যা ও মায়াপদার্থ দুইই এক, কেবলমাত্র প্রভেদ ব্যষ্টি ও সমষ্টি। যেমন ব্যষ্টীভূত বৃক্ষসমূহের সমষ্টিকে "বন" বলিয়া নির্দেশ করা যায়, সেইরূপ ব্যষ্টীভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া বলা যাইতে পারে। আর যেমন বন বৃক্ষ হইতে কোনরূপ অতিরিক্ত পদার্থ নহে; সেইরূপ

মায়াও অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে কোনরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। শাস্ত্রে প্রকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে। যথা—

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্বশক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

এক্ষণে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা এবং অজ্ঞান, এই চতুষ্টয়ই সাধারণতঃ একার্থপ্রতিপাদক।

নিস্তত্ত্বা কার্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্যতঃ পুরা॥—পঞ্চদশী

—জগৎকারণ পরমব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌সত্তারহিত যে পরমাত্মশক্তি তাহাকে মায়া বলা যায়। যেমন দাহাদি কার্যদ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তি অনুমিত হয়, সেইরূপ জগৎকার্য দেখিয়া পরমাত্মশক্তির সত্তা অনুমিত হয় মাত্র। বাস্তবিক পরমাত্মা হইতে পরমাত্মশক্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যথা—

ন সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্নহি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়ান্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্॥—পঞ্চদশী

—পরমাত্মশক্তি মায়াকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু আপনিই আপনার শক্তি ইহা বলা অযুক্ত, যেহেতু অগ্নির দাহিকা-শক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না, আবার পরমাত্মা হইতে তাঁহার শক্তি স্বতন্ত্রও নহে।

স্ফুরত্যেব জগৎ কৃৎস্নমখণ্ডিতং নিরন্তরম্।
অহো মায়া মহামোহা দ্বৈতাদ্বৈতবিকল্পনা ॥

—গোরক্ষসংহিতা ৬।৯৩

এই জগৎ অখণ্ডিত নিরন্তর স্ফূর্তি পাইতেছে। এরূপ জ্ঞান মায়ার কার্য, সুতরাং মহামোহাত্মিকা মায়া আশ্চর্য বস্তু। এই মায়াদ্বারা দ্বৈত ও অদ্বৈত কল্পনা হইয়া থাকে। মায়াকে নাশ করিতে পারিলেই অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিপন্ন হয়। যথা—

মায়ৈব বিশ্বজননী নাস্থা তত্ত্বধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু ॥

—শিবসংহিতা, ১।৬৬

—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াই এই মিথ্যাভূত জগতের সৃষ্টি করেন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ বিশ্বজননী নহে। আত্মজ্ঞানদ্বারা যখন মায়া তিরোহিত হয়, তখন এই মিথ্যাভূত জগৎ আর থাকে না।

এই প্রকৃতিতে চৈতন্য অন্বিত না হইলে প্রকৃতির কোন প্রকার কার্য হয় না। প্রকৃতি জড়, আর পুরুষ চৈতন্য ; প্রকৃতি পরিণামিনী, পুরুষ নির্বিকার ; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ (গুণাতীত) ; প্রকৃতি দৃশ্য, পুরুষ দ্রষ্টা ; প্রকৃতি ভোগ্যা, পুরুষ ভোক্তা ; প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ বিষয়ী। প্রকৃতিকর্তৃক আবৃত হইয়া তবে চৈতন্য ক্রিয়াশীল হন, আবার চৈতন্যে অন্বিত হইয়া প্রকৃতি প্রকাশপ্রাপ্ত হন।

জড়ত্ববিপরীত চৈতন্য আত্মার বা পুরুষের স্বরূপ এবং তাহাই জড়ের প্রকাশক। জড় তাহার প্রকাশ্য। অতএব আত্মা বা পুরুষ জড়ের অতিরিক্ত এবং তিনিই জীবের দেহপুরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য। যিনি "আমি", তিনিই আত্মা ; নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে বাস করেন বলিয়া ইনি "পুরুষ" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।—সাঙ্খ্যদর্শন

এই পুরুষ অসঙ্গ। কিন্তু প্রকৃতি যেমন জগদবস্থায় পরিণত, পুরুষও তদ্রূপ এখন সংসারী। প্রকৃতি এখন যে প্রকার স্থূলাস্থূল বহুবিধ আকার ধারণ করিয়াছেন, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুবিধ গুণের উদ্ভব হইয়াছে, পুরুষও এখন ইন্দ্রিয়সহায় হইয়াছেন —প্রকৃতির আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন।

নির্গুণ ব্রহ্ম জগৎলীলা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেই তিনি সগুণ ব্রহ্ম হইলেন এবং ধর্ম ও স্বভাবের সহিত আপনি ঐ গুণত্রয়ে প্রতিবিম্বিত হইলেন। এখনই তিনি সগুণ ব্রহ্ম। তৎপরে মায়া ঈশ্বরকে আপন গর্ভে ধারণ করিয়া, আপনার স্বভাবশক্তি তাঁহাতে আরোপ করিলে গর্ভস্থ ঐশিক তেজ ত্রিগুণময় হইয়া যায়। এই গুণময় ঈশ্বরাংশকে মায়াসংযুক্ত পুরুষ বলে। এই গুণসংযুক্ত পুরুষই জীব, আত্মা ও জীবাত্মা। মায়াতে তিনটি স্বতঃকারণ বিদ্যমান আছে—দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়া। জীবমায়া স্বভাবতঃ সত্ব, রজঃ ও তমো নামক গুণত্রয়ে মণ্ডিত থাকায় ঐ গুণত্রয়-প্রকাশক দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ায় মণ্ডিত হইয়া পড়েন এবং ইহারাই জীবকে আবদ্ধ করিতেছে। পুরুষই জীব হইলেন, তথাপি মায়ার স্বভাব যে ঈশ্বরাংশ জীবত্বে পরিণত হইল, তাহা আর আপনার প্রকাশক ও অভিন্ন ঈশ্বর দর্শন করিতে পারিল না। অতএব জগতের চেতন ও অচেতন সকলেরই আত্মা পুরুষপদবাচ্য।

পুরুষ অনাদি ও অনন্ত। তাঁহার স্বভাব স্বভাবতঃই আনন্দঘন। এই পুরুষের সাহায্যেই পরিণামিনী প্রকৃতি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ বিশ্বসৃষ্টির বীজস্বরূপ। যথা—

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥—গীতা, ১৪।৩,৪

ভগবান্ বলিয়াছেন—হে ভারত! মহৎ প্রকৃতি গর্ভাধানস্থান, আমি তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মূর্তি সম্ভূত হয়, মহৎ প্রকৃতি সেই মূর্তিসমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয়া), আমি বীজপ্রদ পিতা, অতএব এই বিশ্বসংসার প্রকৃতি ও পুরুষ-যোগে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

এষা মাহেশ্বরী সৃষ্টির্দ্বৈতভাবেন সংস্থিতা।—বিশ্বসার-তন্ত্র

এই মহেশ্বরসম্বন্ধিনী সৃষ্টি দ্বৈতভাবে সংস্থিতা আছে বলিয়াই প্রকৃতিপুরুষযোগে সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়।

এজন্য শাস্ত্রের উক্তি এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। এই উভয়াত্মকই অদ্বৈত ব্রহ্ম। প্রকৃতিপুরুষভাব অজ্ঞান দ্বৈতবাদিগণের পক্ষে, অদ্বৈত যোগিপুরুষের পক্ষে নহে। শক্তিমান্ হইতে শক্তি যেমন পৃথক নহে, তদ্রূপ পুরুষ হইতে প্রকৃতির পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ কল্পনা ভ্রমাত্মক। যথা—

সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতম্।
ভূতং দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুমান্ স্ত্রী চ বিভেদতঃ॥

—ভগবতী গীতা, ৪।১২

—হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্বক আমার রূপ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার মধ্যে এক ভাগের নাম পুরুষ এবং অপর ভাগের নাম স্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে আমি স্ত্রীও নহি, পুরুষও নহি।

যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।—শ্বে. উ. ১৫।১০

—যখন যে শরীর আশ্রয় করেন, তখন সেইরূপে প্রকাশ হয়েন।

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে।
সর্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১।১০

—হে নারদ! যোগীন্দ্রগণ স্ত্রীপুরুষমধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা বোধ করেন না। প্রত্যুত, কি পুরুষ, কি প্রকৃতি সমস্তই ব্রহ্মময় ধারণা করিয়া থাকেন।

অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতি ও পুরুষ-জ্ঞান ভ্রমাত্মক। যে পর্যন্ত চিত্ত স্থির না হয়, সেই পর্যন্তই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। সাধনদ্বারা চিত্ত স্থির হইলেই ভ্রমাত্মক দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

চলচ্চিত্তে বসেৎ শক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেৎ শিবঃ।
স্থিরচিত্তো ভবেৎ যোগী স দেহস্থোঽপি সিধ্যতি॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী-তন্ত্র, ৬৩

—হে দেবি! চঞ্চল চিত্তে শক্তি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানে মায়া, এবং স্থির চিত্তে শিব অর্থাৎ যোগদ্বারা চিত্ত স্থির হইলে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থান করে। স্থিরচিত্তে যোগিব্যক্তি দেহস্থ হইলেও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্॥—পঞ্চদশী, ৬।২১১

ঈশ্বর, জীব ও দেহ প্রভৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই জগৎসমুদয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে মায়াকল্পিত স্বপ্নস্বরূপ।

পঞ্চীকরণ

বোধ হয় কাহারও বুঝিবার বাকী নাই যে ব্রহ্ম যখন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় তখনই তিনি ব্রহ্ম, আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা বা বাসনাশক্তিই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহামায়া। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্বত্রগামী ও সর্ববস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহসংসারে

এতদুভয়বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হইলেই তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হইলেন। তাঁহারা সকলেই ত্রিগুণসমন্বিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য সম্পাদন করিতেছেন। এই সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট। দৃশ্য অথচ নির্গুণ এ প্রকার বস্তু জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচ দৃশ্য হন না, পরমা প্রকৃতিরূপিণী মহামায়া সৃজনাদির সময়ে সগুণা, আর সমাধিসময়ে নির্গুণা হইয়া থাকেন। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্যরূপ হন না। তিনি যখন কারণরূপিণী হন, তখনই সগুণা আর যখন পুরুষ-সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাহেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই নির্গুণা হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্দস্পর্শাদি গুণসমুদয় দিবারাত্রই পূর্বপূর্বক্রমে কারণরূপে ও উত্তরোত্তরক্রমে কার্যরূপে পরিণত হইয়া কার্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না।

কাল, চৈতন্য, সদসদাত্মিকা শক্তি—ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ হয়। ঐ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ঐ অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদির প্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ-চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড বলে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। তদনন্তর ঈশ্বর স্বরূপ-চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে এই বিশ্ব বা বিরাটদেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে ও বিশ্বে এইমাত্র প্রভেদ। ঈশ্বরের কারণাবস্থায় পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্যাবস্থায় পরিণতির নাম বিশ্ব। সূর্য যেমন সকলের প্রকাশক, কিন্তু সর্বত্র ব্যাপ্তিসত্ত্বেও আপন

মণ্ডলে রহিয়াছেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ আপনার শক্তিসমূহ হইতে বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রকাশ পাইয়া স্বরূপে আপনাতে রহিয়াছেন।

গুণত্রয়ে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ হয়। অহঙ্কার দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটি পরাহন্তারূপ সংপদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, অপরটি মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিই সেই পরাহন্তা সংপদার্থরূপিণী; তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সেই পরাহন্তারূপা প্রকৃতিকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব প্রকৃতিই জগতের কারণ। অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য, প্রকৃতি তাহাকে ত্রিগুণসমন্বিত করিয়া জগতের কার্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরাহন্তা (সমষ্টিবুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, জ্ঞানিগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ত্ব কার্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ। পরন্তু মহত্তত্ত্বজাত কার্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রাজসাংশ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ-দ্বারা পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। আদি পুরুষ সনাতন, কার্যও নহেন, কারণও নহেন। এই প্রপঞ্চসমুদয়ের কারণ প্রকট ঈশ্বর বা পুরুষ, এবং মায়া আদ্যাশক্তি কার্য। এ সম্বন্ধে আরও একটু বিশদ আলোচনা করা যাউক।

জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তিভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থজনিকা শক্তি জানিতে হইবে। তামস অহঙ্কার-সম্বন্ধিনী দ্রব্যজনক শক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ রূপ, জলের গুণ রস ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ; এই সূক্ষ্ম দশটি পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদিরূপ

কার্যজনিকা শক্তিবিশিষ্ট হয় ; পরে পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি-বিশিষ্ট তামস অহঙ্কারের অনুবৃত্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ু—এই সমুদয় মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলে। এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ করণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়-সকল, আর ইহাদের উপাদানকারণ—ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি বলে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞানশক্তিসমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকার বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু ও ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ মন—ইহাই সাত্ত্বিকী সৃষ্টি।

পূর্বে যে সূক্ষ্মভূতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, পুরুষ (ঈশ্বর) সেই সকলের পঞ্চীকরণক্রিয়াদ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। উদক নামক ভূত সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রকে দুই ভাগে বিভাগ করা হইল। এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্রচতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্ধভাগ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্ধভাগকে পুনর্বার চারিভাগে বিভক্ত করতঃ সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইবে। এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে "আমিই পঞ্চভূতাত্মক দেহ" এইরূপ তদাত্মভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয়। আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণদ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে আকাশে এক, বায়ুতে দুই, এইরূপ ক্রমে ভূতসকলে এক এক অধিক গুণ

দৃষ্ট হয়। তদনুসারে আকাশের এক শব্দগুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই। বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই নির্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের মিলনপ্রক্রিয়ার দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাটমূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, এইরূপ পঞ্চীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল? ইহার উত্তর শাস্ত্রেই আছে,—ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি।—শতপথ ব্রাহ্মণ

ছন্দের দ্বারা এই বিশ্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ছন্দই ত স্বরকম্পন। অতএব ইহারা পরস্পর কম্পনাভিঘাতে এইরূপ হইয়াছিল, আর মূলে সেই পরমা প্রকৃতি ছিলেন। বেদেও উক্ত হইয়াছে—

"পৃথিবীচ্ছন্দঃ। অন্তরিক্ষচ্ছন্দঃ। দ্যৌশ্ছন্দঃ। নক্ষত্রাণিচ্ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। গৌশ্ছন্দঃ। বাক্‌চ্ছন্দঃ। অজাচ্ছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ।"

—শুক্লযজুর্বেদসংহিতা

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র, বাক্য, কৃষি, গরু, ছাগল, অশ্ব—এ সমুদয় কি? ছন্দ বা স্পন্দন ভিন্ন আর ত কিছুই নহে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে স্বরকম্পন—"হংস", ইহাই ত জীবাত্মা। শ্বাস যখন স্পন্দিত হইয়া দেহে প্রবেশ করিতেছে, তখন সঃ; বহির্গত হইবার সময় হং। মানব হইতে সমস্ত পদার্থই এই স্বরকম্পন; স্বরকম্পন রোধ হইলেই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আবার গড়িয়া নূতন স্বরকম্পনের আশ্রয়ীভূত হয়।

স্পন্দনবাদদ্বারা সৃষ্টিরহস্য সহজেই বুঝা যাইবে। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে স্পন্দনবাদদ্বারাই সৃষ্টিরহস্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ অতি শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার ও এতদ্দ্বারা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন এবং ইহার উপরেই ধর্মতত্ত্বকে সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন।* কুম্ভকার যষ্টি-

* *The Religion of the Stars* নামক পুস্তকের *85 Page* দেখ।

দ্বারা কুলালচক্রকে বেগে কাঁপাইয়া দিয়া তদ্দ্বারা মৃত্তিকা আদিকে ঘট-সরাবে পরিণত করে। কুলালচক্রের অতিরিক্ত কম্পনকালে বোধ হয় যেন তাহা ঘুরিতেছে না—কিন্তু বস্তুতঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থামিয়া আসিবার কালে দেখা যায়, তাহা কাঁপিতেছে। এই হেতু বেদান্তদর্শনে "কম্পনাৎ" কম্পন হইতে জগৎ জাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপে জগৎ উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার সত্ত্বগুণে সৃজন, বিষ্ণুর রজোগুণে পালন ও শিবের তমোগুণে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ধ্বংসকার্য হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের গুণে আমাদের এই সৌরজগতে সূক্ষ্ম জীব স্থূলে পরিণত ও অবিদ্যাদিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম করিতে লাগিল।

জীবাত্মা ও স্থূলদেহ

ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিময় সত্তার বিকাশাবস্থাই এই অনন্ত চেতনাচেতন জীব-পূর্ণ জগৎ। যাহা শক্তির আত্মস্বরূপ ছিল, এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত হইলে সেই কূটস্থচৈতন্য প্রতিজীবের আত্মারূপে অবস্থিত থাকেন। এই জীবচৈতন্য জীবাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এবং প্রাণাদি পঞ্চবায়ু মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গশরীরাভিমানী অবিদ্যো-পহিত চৈতন্যই ব্যবহারিক জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ নামে কথিত হইয়া থাকেন। এই জীবই প্রবাহরূপে অনাদি পুণ্যপাপজনিত অদৃষ্টের ফলভোগ করেন এবং লিঙ্গশরীরকে নিমিত্ত করিয়া ইহলোক-পরলোকে গমন ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি অনাদি, অজর, অমর সুতরাং কোন প্রকারে তাঁহার বিনাশ সংসাধিত হয় না। যথা—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
—গীতা ২।২০

ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখনও হন নাই, অথবা হইয়া আবার হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না।

কঠোপনিষদে ঠিক এই কথাই উক্ত হইয়াছে। যথা—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
—২য় বল্লী, ১৮শ শ্লোক

সখা ও শিষ্য অর্জুনকে আত্মা সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।—গীতা,২।২৩-২৫

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না এবং বাতাসে শুকায় না। ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন এবং শোষণীয় নহেন। ইনি নিত্য, সর্বগত, স্থাণু (স্থিরস্বভাব), অচল (পূর্বরূপ অপরিত্যাগী), সনাতন (চিরন্তন, অনাদি, অব্যক্ত, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অচিন্ত্য (মনের অবিষয়) এবং অবিকার্য (কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়) বলিয়া কথিত হন। এই আত্মার আশ্রয়স্থানকে দেহ বলে।

এই দেহ তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম ভৌতিক আবরণকে স্থূলদেহ বা শরীর কহে। দ্বিতীয় সূক্ষ্ম; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিপূর্ণ মনোময় অবস্থা।

তৃতীয় দেহের নাম কারণ ; তথায় কেবল বুদ্ধ্যাদি চৈতন্য ও কর্তব্যশক্তির সহিত জীবাত্মা বাস করেন। এই জীব বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার অংশবিশেষ, তাঁহার ভোগ বা ক্ষয় কিংবা লয় কিছুই নাই। তাঁহার যে তেজ সূক্ষ্ম-দেহের উপর আধিপত্য করে, সেই মনোময় সত্তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ; সেই সত্তাদ্বারা লিঙ্গদেহ চালিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে-সকল শক্তি-সমষ্টি দ্বারা স্থূলদেহ রক্ষিত ও চালিত হয়, সেই শক্তিকে স্থূলের আত্মা ও ভূতাত্মা কহে ; সাঙ্খ্যমতে ইহাই প্রকৃতি। এখন দেখিতে হইবে, প্রধান চেতয়িতা জীব,—তিনি সাক্ষী মাত্র; প্রত্যেক দেহপ্রকাশের সহিত তাঁহার প্রকাশ ; দেহক্ষয়ে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণ ক্ষয়ে তাঁহার ক্ষয় হয় না। তিনি কারণরূপে সচল—স্বাধীন শক্তির সহিত বর্তমান থাকেন। কার্যের প্রেরক ও ভোগকারী ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা অর্থাৎ মনোময় ভাগের তিনি চৈতন্যসত্তা। স্থূলশরীরের কর্তা ভূতাত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তিগণ ঐ ক্ষেত্রজ্ঞতেজে সচেতন হইয়া শরীররূপী ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষেত্রজ্ঞকেই ভোগ করায়। ক্ষেত্রজ্ঞই গুণানুসারে দেহের গঠনমতে সকল কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই স্থূল ও সূক্ষ্মের অধিকারী ক্ষেত্রজ্ঞ উপাদানরূপী মহত্তত্ত্বের ওঁকাররূপী জীব-ভাবীয় পরমাত্মার আশ্রয়ে প্রতি প্রাণীর পুরীতে চেতয়িতা ও ভোগকর্তাভাবে থাকেন। মন, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ভূতশক্তিই এই ক্ষেত্রজ্ঞকে ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। মনাদি যদি কুভাবে অন্বিত হয়, তবে তিনি কুভোগ করেন, মনাদি যদি পুণ্য কার্য করে, তবে তিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন। যেমন আবরণদ্বারা সূর্যের উজ্জ্বল আলোককে হ্রস্ববীর্য করিয়া অন্ধকার করা যাইতে পারে, তদ্রূপ মনাদিতে কুভাব পোষণ করিলে ক্ষেত্রজ্ঞও অজ্ঞান-আবরণে আবৃত হইয়া পরমাত্মার সান্নিধ্য-তেজ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়েন। আবার যখন মনাদিকে পবিত্র করা যায়, তখনই আবরণ উন্মুক্ত হইলে পরমাত্মার তেজ ক্ষেত্রজ্ঞের তেজে মিলিত হইতে পারে।

এই হেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।— অনুমনস্ক গীতা

মনই মনুষ্যের মুক্তি এবং বন্ধনের কারণ। আরও উক্ত আছে—

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনী-তন্ত্র

এই পরমাত্মভাবের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সমীভাব ঘটাইতে যে সকাম অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই পুণ্য, এবং তজ্জন্য যে নিষ্কাম অনুষ্ঠান তাহাই মুক্তির উপায়; আর পরমাত্মা হইতে যে ভোগাবরণে কুভাবে তাঁহাকে আবৃত করা যায়, তাহাই পাপ, অজ্ঞান বা অধর্ম। পাপাচরণ করিলে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মভাব হইতে আবৃত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় যে যাতনাভোগ হয়, তাহাকেই পাপ-যাতনা বা নরক যন্ত্রণা বলে। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফাদি সাধারণ ধর্মের বৈলক্ষণ্য হইলে দেহের ধাতুগত যাতনা হয়, তদ্রূপ মানবের স্বাভাবিক সত্ত্বগুণের বিপক্ষে অর্থাৎ পরমাত্ম-ভাবের প্রতিকূলে কোন অনুষ্ঠান করিলে লিঙ্গদেহে ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ যাতনা কি ইহলোক, কি পরলোক অর্থাৎ স্থূলদেহের স্থিতিকালে বা স্থূলের বিনাশ হইলেও ভোগ হইয়া থাকে। পূর্বজন্মার্জিত কুসংস্কারের অভ্যাসবশতঃ জীব পাতকের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

শাস্ত্রানুসারে দশপ্রকার কুভাবের আবেশে মনের, কায়ের ও বাক্যের যে ব্যভিচার ও কদাচার উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ বা অধর্ম বলিয়া কথিত। ঐ দশপ্রকার কুভাবের মধ্যে মন তিনটি, বাক্য চারিটি ও দেহ তিনটি কার্য করে। যথা—মনের দ্বারা—(১) পরদ্রব্যহরণেচ্ছা ও পরের অনিষ্টচিন্তা; (২) পরলোক নাই, বিষয়ভোগই সর্বস্ব; (৩) ঈশ্বরে অবিশ্বাস ও দেহাভিমান। বাক্যদ্বারা—(১) পরের

যাহাতে কষ্ট হয় এমন ভাবে অপ্রিয়ভাষণ; (২) অসত্যকথন; (৩) পরোক্ষে পরদোষকীর্তন; (৪) প্রয়োজন ব্যতীত কুৎসাকরণ। দেহদ্বারা —(১) বঞ্চনা বা বলপ্রয়োগে পরস্বাপহরণ; (২) অবৈধ প্রাণিহিংসা; (৩) পরদারাদিগমন।

এই দশবিধ মৌলিক কুভাব হইতে কৃত, কারিত এবং অনুমোদিত ভেদে অগণ্য কুকর্ম জীব-হৃদয়ে বিচরণ করে। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান উপস্থিত হইলে—সূর্য যেমন কুজ্ঝটিকাকে নিজ তেজে নিবারণ করেন, তদ্রূপ তদীয় কৃপাতে পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবানের সতত চেষ্টা—তিনি অবিরাম আমাদিগকে উন্নতির পথে, উদ্ধারের পথে, সুখের পথে লইবার জন্য টানিতেছেন। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব আমরা—সততই অনিত্য বিষয়-রসে ডুবিয়া মরিতেছি। লৌহখণ্ডকে চুম্বকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থলে একখানা ইষ্টক ফেলিয়া রাখিলে যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমরাও তাঁহার আকর্ষণের মধ্যে মায়াবাঁধকে রাখিয়া তাঁহার করুণাকর্ষণ হইতে দূরে রহিয়াছি। পুরুষকারের বলে মায়াবাঁধকে ছিন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার করুণা আকৃষ্ট করা যায়।

অদৃষ্ট (সঞ্চিত কর্ম) ও পুরুষকার বড়ই ওতঃপ্রোত সম্বন্ধে গাঁথা-গাঁথি। মানব যথাবিধি পরিশ্রমে ভূমি চাষ করিল, বীজ ছিটাইল; কিন্তু অদৃষ্টশক্তি যথাসময়ে বর্ষণাদি না করায় ধান্য হইল না। আবার কেবল অদৃষ্টশক্তি অনবরত বর্ষণ করিয়াও কিছু করিতে পারে না—মানুষ যদি পরিশ্রম ও যত্নের সহিত চাষ করিয়া ভূমিতে বীজ বপন না করে। অতএব বুঝিতে হইবে, অদৃষ্ট ও পুরুষকার দুইয়ে মিলিয়া কার্য করিয়া থাকে। সেই অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ে একত্র হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে বিষয়বিরাগ জন্মিয়া ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় এবং তাহা হইলে তখন তাঁহার করুণা-বাঁশরীর মোহন স্বর কর্ণগোচর হইয়া থাকে।

স্থূলদেহের বিশ্লেষণ

মায়োপহিত চৈতন্য হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয় এবং এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের এবং স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়। যথা—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১

—প্রথমে সেই জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা হইতে আকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে পুরুষ; অতএব এই পুরুষই অন্নরসময়শরীর-বিশিষ্ট জীবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

ইহাই শুক্র ও শোণিতযোগে পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ। স্থূলদেহ বলিলে এই বুঝায়—

পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্যং জন্মাদিষড়্ভাববিকারং স্থূলশরীরম্।—পঞ্চদশী

—পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চমহাভূতের কার্য ও পুণ্যাপুণ্য কর্মহেতু জন্ম প্রভৃতি ও বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য ও জরারূপ বিকারযুক্ত যে শরীর, তাহার নাম স্থূলদেহ।

পিতামাতার ভুক্ত অন্ন হইতে শুক্র ও শোণিতযোগে এই ষট্‌কোষ-বিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হয়; তন্মধ্যে মাতৃজ, পিতৃজ প্রভৃতি ষড়্‌বিধ ভাব আছে। যথা—

পিতৃভ্যামশিতাদন্নাৎ ষট্‌কোষং জায়তে বপুঃ।
স্নায়বোঽস্থীনি মজ্জা চ জায়ন্তে পিতৃতস্তথা॥

ত্বঙ্‌মাংসশোণিতানীতি মাতৃতশ্চ ভবন্তি হি।
ভাবা স্যুঃ ষড়্‌বিধস্তস্য মাতৃজাঃ পিতৃজাস্তথা।
রসজা আত্মজাঃ সত্ত্বসংভূতাঃ স্বাত্মজাস্তথা॥

—পিতামাতার ভুক্ত অন্ন হইতে এই ষট্‌কোষবিশিষ্ট শরীরের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই সকল পিতা হইতে উৎপন্ন এবং ত্বক্‌, মাংস ও রক্ত মাতা হইতে হইয়া থাকে। এই শরীরসম্বন্ধে মাতৃজ, পিতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বসম্ভূত ও স্বাত্মজ এই ষড়্‌বিধ ভাব আছে।

তন্মধ্যে শোণিত, মেদ, প্লীহা, যকৃত, গুহ্যদেশ, হৃদয়, নাভি, এই সমুদয় মৃদু পদার্থরাশি মাতৃজ ভাব; শ্মশ্রু, রোম, কেশ, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, নখ, দন্ত, শুক্র, ইহারা পিতৃজ ভাব; শরীরোপচিতি অর্থাৎ উৎপত্তিকালে শরীরের স্থূলতা, বর্ণ, ক্রমে শরীরের বৃদ্ধি, অবয়বের দৃঢ়তা, অকার্পণ্য, উৎসাহ, তৃপ্তি, বল, ইহারা রসজ অর্থাৎ সপ্তধাতুর অন্যতম ধাতুজ ভাব; এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান, আয়ু এবং ইন্দ্রিয়, ইহারা আত্মজ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্মজ ভাব।

ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও রমণ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

মন কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ের অন্তরেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটিকে অন্তঃকরণ বলে। তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখ মনের বিষয় এবং স্মৃতি, ভয় ও কম্পনাদি মনের ক্রিয়া; নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তিকে বুদ্ধি, অহং মম ইত্যাকার বৃত্তিকে অহঙ্কার এবং অতীত বিষয়ের স্মরণাত্মক বৃত্তিকে চিত্ত বলে। এই সত্ত্ব নামক অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে তিন প্রকার, সুতরাং পূর্বোক্ত সত্ত্বজ ভাবও তিন

প্রকার। তন্মধ্যে আস্তিক্য, মনোনৈর্মল্য ও মুখ্যরূপে ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্তি ইত্যাদি সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও লজ্জাদি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়,—ইহারা রাজস-সত্ত্বজ ভাব। নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতা ও বঞ্চনা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন—ইহারা তামস-সত্ত্বজ ভাব।

দেহো মাত্রাত্মকস্তস্মাদাদত্তে তদ্‌গুণানিমান্।

এই দেহ মাত্রাত্মক, অর্থাৎ এই দেহ ইহার উপাদান পঞ্চভূত-তাদাত্ম্যেই উৎপন্ন, সুতরাং উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা—এই স্থূলদেহ আকাশ হইতে শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, বক্তৃত্ব, কর্মকুশলতা, লঘুত্ব, ধৈয এবং বল এই সপ্ত গুণ গ্রহণ করে। বায়ু হইতে স্পর্শ, ত্বগিন্দ্রিয়, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, গমন, প্রসারণ, কর্কশতা এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, ধনঞ্জয় ও দেবদত্ত এই বায়ুবিকার এবং লঘুতা—এই একোনবিংশতি গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। অগ্নি (তেজঃ) হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্যামিকাদি রূপ, শুক্লরূপ, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকশক্তি, স্ফূর্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা, কৃশতা, ওজঃ, সন্তাপ, পরাক্রম এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জল হইতে ষড়্‌বিধ রস রসেন্দ্রিয়, ধারণাশক্তি, শৈত্য, স্নেহ, দ্রবত্ব, কর্ম ও শরীরের মৃদুতা এই সমস্ত গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্থিরতা, ধৈর্য, গুরুত্ব, ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্রধাতু উৎপন্ন হয়। ইহারা স্বাত্মজ ভাব।*

ভৌতিক দেহটিকে কার্যক্ষম রাখিবার জন্য নাভিকন্দ হইতে বহুসংখ্যক

---

* স্থূলদেহের ভৌতিক ধর্ম যথা—
অস্থিমাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্লোমানি চ পঞ্চমঃ। পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
শুক্রশোণিতমজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমম্। অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে॥
নিদ্রাক্ষুধাতৃষ্ণাচৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমম্। তেজঃপঞ্চগুণাঃপ্রোক্তাব্রহ্মজ্ঞানেনভাসতে॥

নাড়ী উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত গমন করতঃ তত্তৎস্থানীয় কার্যসকল সম্পন্ন করিতেছে। যথা—

উর্ধ্বং মেঢ্রাদধো নাভেঃ কন্দযোনিঃ খগাণ্ডবৎ।

তত্র নাড্যঃ সমুৎপন্নাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততি ॥—গোরক্ষসংহিতা, ২০

মেঢ্রদেশের উর্ধ্বে ও নাভির নিম্নে খগাণ্ডবৎ যে কন্দযোনি আছে, তাহা হইতে বাহাত্তর হাজার নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত শরীরাভ্যন্তরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী বিদ্যমান আছে। যথা—

সার্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।—শিবসংহিতা, ২।১৩

এই সার্ধলক্ষত্রয় নাড়ী উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্বস্থান ব্যাপিয়া বস্ত্রের টানা-পড়িয়ানের মত ওতঃপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এজন্য এই সকল নাড়ীকে বায়ুসঞ্চাররক্ষিকা বা ভোগবহা নাড়ী বলা যায়। মানবের অস্থিময় দেহের উপর ঐ নাড়ীসকল এরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়া আছে যে, ঠিক যেন অস্থিগুলি জালদ্বারা আবৃত বোধ হয়। যথা—

যথাশ্বত্থদলে যদ্বৎ পদ্মপত্রেষু বা শিরাঃ।

নাড্যস্তেতাস্ব সর্বাসু বিজ্ঞাতব্যাস্তপোধন ॥—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

—অশ্বত্থ বা পদ্মপত্র জীর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে যেরূপ শিরাজাল দৃষ্ট হইয়া থাকে, জীবদেহও নাড়ীসকলদ্বারা সেইরূপ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।*

বায়ু হইতে দেহে দশপ্রকার বায়ুবিকার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রাণই মুখ্যতম। কেননা, এক প্রাণবায়ুর বৃত্তিভেদদ্বারা ঐ প্রাণবায়ুরই বিবিধ নাম সঙ্কল্পিত হইয়াছে।

ধারণং চলনং ক্ষেপঃ সঙ্কোচঃ প্রসারস্তথা। বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
কামঃ ক্রোধস্তথা মোহো লজ্জা লোভশ্চ পঞ্চমঃ। নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে। পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥
—জ্ঞানসঙ্কলনী-তন্ত্র, ২০।২৭

* দেহের এই সকল তত্ত্ব মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থে বিশদভাবে লেখা হইয়াছে।

নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ প্রাণকর্ম সমীরিতম্ ।
অপানবায়োঃ কর্মৈতদ্বিণ্মূত্রাদিবিসর্জনম্ ।
হানোপাদানচেষ্টাদি ব্যানকর্মেতি চেষ্যতে ।
পোষণাদি সমানস্য শরীরে কর্ম কীর্তিতম্ ॥
উদ্গারাদিগুণো যস্ত নাগকর্ম সমীরিতম্ ।
নিমীলনাদি কূর্মস্য ক্ষুতৃষ্ণে কৃকরস্য চ ॥
দেবদত্তস্য বিপ্রেন্দ্র তন্দ্রাকর্মেতি কীর্তিতম্ ।
ধনঞ্জয়স্য শোকাদি সর্বকর্ম প্রকীর্তিতম্ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৪।৬৬-৬৯

অর্থাৎ প্রাণবায়ুই শব্দোচ্চারণ, নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কারণ। এই প্রাণবায়ু কণ্ঠ হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত ব্যাপিয়া আছে এবং নাসিকারন্ধ্র, নাভি ও হৃদয়দেশে বিচরণ করিয়া থাকে। অপানবায়ু গুহ্য, মেঢ্র, কটি, জঙ্ঘা, উদর, নাভি, কণ্ঠ, উরু ও জানুদেশে অবস্থিত আছে,—ইহাদ্বারা মূত্র-মলাদির পরিত্যাগক্রিয়া সম্পাদন হইয়া থাকে। ব্যানবায়ু চক্ষু, কর্ণ, গুল্‌ফ, জিহ্বা এবং নাসিকাদেশে অবস্থিত—ইহা দ্বারা প্রাণায়াম-বিষয়ে কুম্ভক, রেচক ও পূরক ইত্যাদি কার্য হইয়া থাকে। সমানবায়ু শরীর-বহ্নির সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, এবং এই শরীরস্থ দ্বিসপ্তসহস্র নাড়ীর অভ্যন্তরে বিচরণ করে, এই বায়ু ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের রসসকল আনয়ন করতঃ দেহের পুষ্টিসাধন করে। উদানবায়ু পদ, হস্ত এবং অঙ্গসন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া দেহের উন্নয়ন ও উৎক্রমণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

পূর্বোক্ত নাগাদি পঞ্চ উপবায়ু ত্বক্, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা এবং স্নায়ু প্রভৃতি ধাতু আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে নাগবায়ুর উদ্গার ও হিক্কাদি, কূর্মের নিমেষ, উন্মেষ ও কটাক্ষাদি, কৃকরের ক্ষুধা ও পিপাসা, দেবদত্তের আলস্য, নিদ্রা ও জৃম্ভণাদি এবং

ধনঞ্জয়ের শোক-হাস্যাদিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব বায়ুদ্বারা সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অস্থি, মাংস, শিরা, মেদ, মজ্জা ও নাড়ীবিশিষ্ট এই জড়দেহ কেবল এক বায়ুর সাহায্যেই কর্মোপযোগী হয়। এইজন্য এই বায়ুকে জীবরূপে বর্ণনা করা যায়।

এতে নাড়ীসহস্রেষু বর্তন্তে জীবরূপিণঃ।—গোরক্ষসংহিতা, ৩১

অর্থাৎ এই প্রাণবায়ুই নাড়ীসহস্রমধ্যে জীবরূপে বিচরণ করে।

যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥—যোগশাস্ত্র

শরীরে যে পর্যন্ত বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল দেহী জীবিত থাকে। সেই বায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনঃ প্রবিষ্ট না হ'লে মৃত্যু সংঘটিত হয়। এক চৈতন্যের সহযোগে এই জড়দেহে বায়ুই জীব-রূপে সমস্ত দৈহিক কার্য সম্পন্ন করিতেছে। দেহ কেবল যন্ত্রমাত্র এবং বায়ু ঐ যন্ত্রটি চালনা করিবার উপকরণ।

অন্নং পুংসাশিতং ত্রেধা জায়তে জঠরাগ্নিনা।
মলং স্থবিষ্ঠো ভাগঃ স্যান্ মধ্যমো মাংসতাং ব্রজেৎ।
মনঃ কনিষ্ঠো ভাগঃ স্যাত্তস্মাদন্নময়ং মনঃ॥—শ্রুতি

—প্রাণিমাত্রেরই ভুক্ত অন্ন জঠরাগ্নিদ্বারা তিন ভাগে পরিণত হয়; তন্মধ্যে স্থূলভাগ মল, মধ্যভাগ মাংস এবং শেষভাগ মনরূপে পরিণত হয়; তাই মনকে অন্নময় বলে।

অপাং স্থবিষ্ঠো মূত্রং স্যান্ মধ্যমো রুধিরং ভবেৎ।
কনিষ্ঠভাগঃ প্রাণং স্যাত্তস্মাৎ প্রাণো জলাত্মকঃ॥—শ্রুতি

—জলের স্থূলভাগ মূত্র, মধ্যভাগ রুধির এবং শেষভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়; তাহাতেই প্রাণকে জলময় বলে।

তেজসোঽস্থি স্থবিষ্ঠঃ স্যান্ মজ্জা মধ্যসমুদ্ভবা।
কনিষ্ঠা বাঙ্মতা তস্মাত্তেজোঽম্নাত্মকং জগৎ॥—শ্রুতি

—তেজ অর্থাৎ ঘৃতাদির স্থূলভাগ অস্থি, মধ্যভাগ মজ্জা এবং শেষ ভাগ বাগিন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়; তাহাতেই বাগিন্দ্রিয়কে তেজোময় বলে।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিও ধাতুনামে অভিহিত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপে স্থূলদেহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্য সংসাধিত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মে ও জীবে বিভিন্নতা

বেদান্তমতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে না। তাই বেদান্ত বলিয়াছেন—

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, জীব, জন্তু, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে-কিছু বস্তু আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই ব্রহ্ম। কারণ এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিবে? সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন কেবলমাত্র পরব্রহ্ম পূর্ণভাবে সর্বত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, তাই এই বহু হইয়াছেন। সুতরাং এই জগৎও ব্রহ্মবস্তু এবং আমাদের আত্মাও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা। যখন মনুষ্যরূপী অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই মুক্তি।

যদিও সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিল না, এক মাত্র তিনিই পূর্ণভাবে অনন্ত দেশ অধিকার করতঃ বর্তমান ছিলেন; যদিও এই জগতের উপাদানসকলকে তিনি বাহির হইতে আহরণ করেন

নাই, তাঁহার ইচ্ছায় তদীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; যদিও তিনি ইহার সর্বস্ব; তথাচ পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি যাহাকিছু দেখিতেছি, এ সমস্তই যে জড় ও জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম —এ কথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কারণ অনন্তজ্ঞানময় ব্রহ্ম স্ব-ইচ্ছায় এক্ষণে এই মর্ত্যলোকে সংসারতাপে তাপিত হইয়া জীবিকার জন্য সদসৎ কার্যসকল সম্পাদন করিতেছেন, এ কথায় কে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে?

আমার "আমি"ই—ব্রহ্ম—ইহা কঠোর সত্য। কিন্তু মায়াপরিশূন্য আমি ব্রহ্ম; মায়োপাধিক আমিই জীব। জীবে চৈতন্য ও চৈতন্যচালক শক্তি বিদ্যমান আছে। চৈতন্য ঈশ্বর, চৈতন্যচালক শক্তি মায়া। যেমন বাসনার সহযোগে জীব নানারূপী, নানাক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়ার সহযোগে চৈতন্য নানাক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ হইয়াছে। জীব মায়া-অধিষ্ঠিত চৈতন্য, মায়াযুক্ত ব্রহ্ম।

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময়। চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে জড় ও চৈতন্যমধ্যবর্তী উভয়ের সংমিশ্রণে চৈতন্যপ্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বরবাসনা বলে। যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায়। মায়া লয় পাইলেই জগৎ লয় পায়। চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সৎ, এই দুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে যে স্থূল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়া বা প্রকৃতি। অতএব এক চৈতন্যই বাসনাতে পরিবর্তিত। সূর্য যেমন আপন শক্তিতে স্থূল-ভূতরূপে জল বর্ষণ করেন, আবার সূক্ষ্মভাবে উহা গ্রহণ করেন, সেইরূপ ঈশ্বর বাসনাসংযুক্ত হইয়া জীব হন, আবার বাসনাবিমুক্ত হইলে স্বয়ং হন। ঈশ্বর চৈতন্যের আকর। তাঁহার সক্রিয়ভাব বা বাসনা তাঁহাতেই লীন হয় বা হইতে পারে; যে অংশে বাসনা বা জগৎ নাই, সে অংশ

নিত্য ও সর্বাধাররূপে বর্তমান। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন না হইলে এই সকল বিষয় ধারণা হয় না। প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক, বহু নহে। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখ্য ; আত্মা অসংখ্য নহে। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে নানাদেহে ভেদপ্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। একটি দীপ জ্বালিত কি নির্বাপিত করিলে যেমন অন্য দীপ জ্বালিত বা নির্বাপিত হয় না, সেইরূপ একজনের বন্ধনে বা মোক্ষে অন্যজনের বন্ধন বা মোক্ষ হয় না। মন প্রতি শরীরে বিভিন্ন , সুতরাং সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, জন্ম, মৃত্যু, মুক্তি প্রভৃতিও ভিন্ন। অতএব ব্রহ্ম ও জীব এক। যথা—

ঈশ্বরেণৈব জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।
বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ॥ —দ্বৈতবিবেক

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কার্যকারণভাবজন্য জীব ও ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার উপাধি হইয়াছে। কারণভাবজন্য অন্তর্যামী ঈশ্বরোপাধি এবং কার্যভাবজন্য অহং-পদবাচ্য জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও কার্যকারণজন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইয়াছেন। এই দ্বৈত-ভাব নিবারণের উপায় বিবেক। জীবের জ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধচৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট শুদ্ধচৈতন্যই অদ্বৈত ব্রহ্ম। এইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সংসারবন্ধন হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায়। মহাপ্রাজ্ঞ দত্তাত্রেয় কহিয়াছেন—

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন স্বাত্মা হি প্রতিপাদিতঃ।
নেতি নেতি শ্রুতির্ব্রূয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥—অবধূতগীতা ১.২৫

"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্মাকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং "নেতিনেতি" অর্থাৎ ইহা নহে, উহা নহে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাস করিয়া শ্রুতিবাক্যসকল এক পরিশুদ্ধ

আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব আমিই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মই আমি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কারণ, তাহা না হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যসকলের বিরোধ হইয়া যাইবে। শাস্ত্র তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ করিয়াছেন—

তত্ত্বংপদার্থৌ পরমাত্মজীবকাবসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ।
প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনোর্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ॥
—রামগীতা ১২ ২৬

— তৎ পদের অর্থ পরমাত্মা ও ত্বং পদের অর্থ জীবাত্মা। এই "তৎ" ও "ত্বং" পদের যে ঐক্য অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে ঐক্য, তাহাই "অসি" পদের দ্বারা সাধিত হয়। যদি বল, সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাত্মার ঐক্য কি প্রকারে সম্ভব হয়, তজ্জন্য বলিতেছেন "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থস্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষত্ব, সর্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব, অল্পজ্ঞত্বাদিরূপ যে বিরুদ্ধাংশসকল, তাহা পরিত্যাগপূর্বক "ত্বং" পদটি শোধন করিয়া লক্ষণাদ্বারা লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থমাত্রকে গ্রহণ করিলে ব্রহ্ম-চৈতন্য এবং জীব-চৈতন্যমধ্যে কেবল এক চৈতন্য অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং চৈতন্যপক্ষে ঐক্য সম্ভব হয়।

ইত্থমৈক্যাববোধেন সম্যগ্ জ্ঞাতং দৃঢ়ং নয়ৈঃ।
অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং যস্য শোকং তরত্যসৌ॥—শঙ্করবিজয়, ৯।৪৩

ঐক্য শব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিত নয় যে দুই বস্তুর পরস্পর সংযোগদ্বারা ঐক্য করা। তবে কি?—ঐক্য অর্থাৎ একতাভাব; ইহা একই, এরূপ জ্ঞান হওয়া। যে বস্তু পূর্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্তু রহিয়াছে, এ সেই বস্তুই; সেই বস্তু এক এবং এই বস্তু দ্বিতীয়, এরূপ

ভাব নহে। কেবল সেই বস্তুই ভ্রমবশতঃ অন্য বস্তু বলিয়া কল্পিত হইতেছে মাত্র; সুতরাং এরূপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকার্য নহে। এস্থলে ঐক্যজ্ঞান দুই বস্তুর একতা বুঝাইতেছে না; কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, পূর্বে তুমি যা ছিলে—সেই তুমিই এই হইয়াছ। এইরূপ ঐক্যজ্ঞানে যাঁহার প্রতীতি বা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, "সেই ব্রহ্মই আমি", তাঁহার কোনরূপ শোক থাকে না। তিনি সমস্ত সংসারদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন। এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে যে "শোকং তরতি চাত্মবিৎ" অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কোনরূপ শোক থাকে না। অতএব "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যটি দ্বারা এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর ভিন্ন নহে।

জীব ও ব্রহ্ম এক। কিন্তু সে একেও ভেদ আছে; সুতরাং ভেদের অর্থটা আগে বুঝিতে হইবে। ভেদ তিন প্রকার—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। যথা—

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাঙ্কুরৈঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ঃ বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥—পঞ্চদশী

বৃক্ষের স্বীয় পত্র, পুষ্প, ফল ও অঙ্কুর প্রভৃতিগত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগতভেদ। আম্রবৃক্ষও বৃক্ষজাতিভুক্ত, কদম্ববৃক্ষও বৃক্ষজাতিভুক্ত; আম্রবৃক্ষ ও কদম্বাদি বৃক্ষে যে পরস্পর ভেদ, তাহার নাম সজাতীয় (সমানজাতীয়) ভেদ। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষজাতি ভিন্ন প্রস্তরাদি অন্যজাতীয় পদার্থের যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। এখন "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই ঈশ্বরপর শ্রুতিবাক্য ত্রিবিধ ভেদ-শূন্যত্বের পরিচায়ক। ঈশ্বর কিরূপ?—না, "এক" অর্থাৎ স্বগতভেদশূন্য, "এব" অর্থাৎ সজাতীয়ভেদশূন্য এবং "অদ্বিতীয়" অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদশূন্য। স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদপরিশূন্য পরমপদার্থই পরমেশ্বর। তাহাই সৎ, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ। অবিদ্যাপ্রভাবে ব্যবহারিক

দশায় স্বপ্নসন্দর্শনের ন্যায় অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ যে মানুষ সেই মানুষ, তাহার স্বপ্নদৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যার ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এখন আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এই ভেদ ঈশ্বরে ও জীবে কোন্ জাতীয়? ঈশ্বর ও জীবে স্বগতভেদ।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাশম্॥—শ্রুতি

—আত্মা অণু হইতে অণীয়ান্ এবং মহৎ হইতে মহীয়ান্ তিনি ব্রহ্মানন্দে জীবের গুহায় বিরাজিত আছেন। তিনি ভোগ বা কর্ম, ক্ষয় বা বৃদ্ধিরহিত এবং মহিমান্বিত ও ঈশ্বর। তাঁহার প্রসাদে যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে তাহার সকল কলুষ বিনষ্ট হয়।

ইহাতে এই কথাই বলা হইল যে, সেই ব্রহ্ম সর্বজীবেই আছেন। এই ঈশ্বর কিরূপ? মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।
—পাতঞ্জলদর্শন ১।২৪

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সমস্ত সংসারী আত্মা ও সমস্ত মুক্তাত্মা হইতে যিনি পৃথক্ বা স্বতন্ত্র, তিনি ঈশ্বর। ক্লেশ-কর্মাদি জীবে আছে, ঈশ্বরে নাই। ফল কথা, ঈশ্বর জীবের ন্যায় ক্লেশভোগী নহেন, তিনি সর্বক্লেশবিমুক্ত। জীবের ন্যায় তাঁহার ফলভোগ হয় না; তাঁহার সুখ, দুঃখ, জন্ম ও আয়ু ভোগ হয় না; তিনি নিত্য, নিরতিশয়, অনাদি ও অনন্ত। জীবাত্মা যেমন চিত্তের সহিত একীভূত থাকায় বাসনা নামক সংস্কারের বশীভূত, তিনি সেরূপ নহেন; তিনি অচিত্ত, তন্নিমিত্ত তিনি বাসনারহিত। জন্ম

জ্ঞান ও জন্য ইচ্ছায় সহিত তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের ও স্বাভাবিক ইচ্ছার তুলনা হয় না। তিনি এক, অসাধারণ, অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ও দেহাদিরহিত।

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্।—পাতঞ্জলদর্শন, ১।২৫

তাঁহার নিরতিশয় জ্ঞান থাকায় তিনি সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ তাঁহাতে সর্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণ জ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে, জীবে তাহা নাই। তাঁহার স্বরূপ অন্যের বোধগম্য করাইতে হইলে অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সে অনুমান এইরূপ—সকল মানবেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, সকলেই কিছু না কিছু অতীত, অনাগত ও বর্তমান বুঝিতে পারে; কেহ অল্পজ্ঞ, কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ, আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিকজ্ঞও আছে। মনে কর, যাঁহা অপেক্ষা অধিকজ্ঞ আর নাই, তিনিই পরমগুরু, পরাৎপর, পরমেশ্বর। যেমন অল্পতার শেষ সীমা পরমাণু, আর বৃহত্ত্বের চরম সীমা আকাশ, সেইরূপ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অল্পতার পরাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব এবং তাহার আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।—পাতঞ্জলদর্শন, ১।২৬

—তিনি পূর্ব পূর্ব সৃষ্টিকর্তাদেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা। তিনি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, সকল কালেই তাঁহার অস্তিত্ব।

এখন জীবেশ্বরে স্বগত ভেদ। স্থূল কথায়, ব্রহ্ম খাঁটি সোনা, আর জীব খাদমিশান সোনা। কেহ বা অল্প খাদের, কেহ বা অধিক খাদের। অনেক খাদে অল্প মূল্যের স্বর্ণ, অল্প খাদে অধিক মূল্যের স্বর্ণ। কিন্তু খাঁটি সোনাকেও সোনা বলে আর অল্পাধিক যেরূপ খাদ মিশানই হউক, তাহাকেও সোনা বলে। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ভেদ আছে; বর্ণের ও গুণের পার্থক্য আছে। কিন্তু কর্মী যেমন কর্মের বা পুরুষকারের বলে আগুনে গলাইয়া পদার্থবিশেষের সাহায্যে খাদমিশান সোনাকে

পুনরায় পাকা সোনা করিতে পারে এবং তখন খাঁটির সহিত যেমন তাহার কোন পার্থক্য থাকে না, তদ্রূপ জীব যে বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগতভেদসম্পন্ন,—সেই বাসনা-কামনার খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া দূরীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ বলেন, ব্রহ্ম ও জীব কিরূপ? যেমন সমুদ্র ও সমুদ্রোত্থিত বুদ্বুদ। জল ও জলবুদ্বুদে স্বগতভেদ, সুতরাং একই কথা। তবে আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে গাই—

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলে উদয় জলবিম্ব জল হ'যে সে মিলায় জলে॥

অনন্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদি ও অনন্ত। অনন্তবস্তুর সত্তাই স্বীকার্য; তদ্ভিন্ন আর কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার্য হইতে পারে না। কারণ অনন্তসত্তা এক বই দুই হইতে পারে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত। যাহা অনন্তরূপে সর্বব্যাপী, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে আর অনন্তবস্তুর সর্বব্যাপিত্ব থাকে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তুই অবস্থান করিতেছে।

এ কথা যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসত্য। জগৎ আবার অনন্তসত্তা হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদি বল, জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএব জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে। এক ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন। কোনও স্থায়ে

এ যুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পদার্থ, তাঁহারা বস্তুতঃ পরমেশ্বরের অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব ও সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করেন না। যখনই বলিলে, পরমেশ্বর সর্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার করিলে। সুতরাং ব্রহ্ম যদি অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, এই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মের শরীর ও রূপ, তিনি অনন্ত বিশ্বের বস্তুরূপে অবস্থিত আছেন এবং এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে।

যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদি। যাহার আদি আছে, তাহার সীমা ও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না। সুতরাং অনন্তপদার্থ অনাদি। এই অনন্তপদার্থেরই বিকাশ ও দেহ যদি বিশ্ব হয়, তবে এই বিশ্ব অবশ্য অনাদি। এই বিশ্ব, অনাদি ও অনন্ত নারায়ণের রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যাসদেব মহাভারতের শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম, দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ে ব্রহ্মের রূপ এই প্রকার কীর্তন করিয়াছেন—

পর্বতসকল তাঁহার অস্থি, মেদিনী মেদ ও মাংস, সমুদ্রচতুষ্টয় রুধির, আকাশ উদর, সমীরণ নিঃশ্বাস, তেজ অগ্নি, স্রোতস্বতীসকল শিরা এবং চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার নেত্রদ্বয়রূপে পরিণত হইল এবং তাঁহার মস্তক আকাশমণ্ডলে, পদদ্বয় ভূমণ্ডলে ও হস্তসমুদয় দিঙ্মণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল।

ভগবদ্গীতায় ব্যাসদেব বাসুদেবের বিরাট্ বিশ্বমূর্তির এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥
দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥

অর্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্ ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা- দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য- মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥

গীতা, ১১।৯-২০

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে পৌরাণিক ভাষায় নারায়ণের বিশ্বরূপ এই প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রমতে শুদ্ধ যে নারায়ণ অনাদি ও অনন্ত এমত

নহে, যে বিরাট বিশ্ব নারায়ণের রূপ ও দেহ, সেই বিশ্বও অনাদি ও অনন্ত। বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত এবং এই সংসারও অনাদি ও অনন্ত। এই সংসারস্থ জীবস্রোত সেই অনাদি ও অনন্ত দেবের স্থূলশরীর মাত্র। এই সংসারে জীবস্রোত অনন্তপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। উহার আদি অনুমান কল্পনা মাত্র। ন্যায় ও প্রমাণে উহা সাব্যস্ত হয় না। জীবস্রোতের আদি দেখিতে গেলে আমরা অনন্তবংশপরম্পরায় উপনীত হই, উহার আদি খুঁজিয়া পাই না। সংসারের জীবস্রোত অবলম্বন করিয়া যত উর্দ্ধে উঠি না কেন, অবশেষে অনন্তদেশে মিলাইয়া যাই। তখন কাজেই বলিতে হয়, সংসার ও জীবস্রোত অনাদি। উদ্ভিদ্-জীব দেখ, তাহাও অনাদি। কোন্ বৃক্ষের তুমি আদি খুঁজিয়া পাও? বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতেছে, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ জন্মিতেছে। বৃক্ষ ও বীজ চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রথম বীজ কল্পনা করিলে প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিতে হয়, তদ্রূপ প্রথম বৃক্ষের কল্পনা করিলে প্রথম বীজের কল্পনা করিতে হয়। মনুষ্যের আদি কোথায়, তাহাও মনুষ্যের নিকট ঘোর প্রহেলিকা। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে জীব জরায়ুতে বর্তমান, জরায়ুর পূর্বে জীব শোণিত-শুক্রময় বীজে বর্ত্তমান। এই শোণিত-শুক্র জৈবিক পদার্থে পরিপূর্ণ। সেই জৈবিক পদার্থের মিলন ও মিশ্রণে জীবের উৎপত্তি। সুতরাং জীবের পূর্বে জৈবিক পদার্থ বিদ্যমান; সেই জৈবিক পদার্থ ও কোষ-সমুদয় পিতামাতার শরীরে বর্তমান। আমি নিজে যেরূপে উৎপন্ন, আমার পিতামাতাও সেইরূপে উৎপন্ন। আমি পিতামাতার আত্মজ। আবার আমার পিতামাতা তাঁহাদের পিতামাতার আত্মজ ও আত্মজা। শরীর হইতে শরীরের উৎপত্তি। শারীর পদার্থ ভিন্ন শারীর পদার্থের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। উদ্ভিদের যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, মনুষ্যেরও তেমনি মনুষ্য হইতে বীজ, বীজ হইতে মনুষ্য। আজ যেরূপে মনুষ্য উৎপন্ন, শতবর্ষ পূর্বে, সহস্র বৎসর পূর্বেও সেই

প্রকারে উৎপন্ন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই, হইতেও পারে না। সুতরাং মনুষ্যের আদি ধরিতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনন্ত-পর্যায় আসিয়া পড়ে। অনন্ত মনুষ্যশ্রেণী বংশপরম্পরায় জন্মিয়া আসিতেছে। এই বংশপরম্পরার শেষ নাই। দশ সহস্র বৎসর পূর্বে মনুষ্যের উৎপত্তি যদি হঠাৎ শূন্য হইতে সম্ভব হয়, তবে আজও হইতে পারে। কিন্তু আজ ত কোন জীবকে হঠাৎ শূন্য হইতে জন্মিতে দেখি না। এ সম্ভাবনার কথা কেবল কল্পনা মাত্র—মূর্খের কল্পনা। প্রাকৃতিক নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহা মনুষ্যের দৃষ্টান্তে সত্য, তাহা অন্যান্য জীবেও সত্য। সুতরাং জীব অনাদি। এই জীবসমূহ সেই অনন্তদেবের অনন্ত বিশ্বে লীন হইয়া আছে। অনন্তদেবের শরীরে জীবদেহ কিরূপে লীন হইয়া আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আমি মনুষ্যের দৃষ্টান্ত লইয়া এই তত্ত্বের আলোচনা করিব। যাহা মনুষ্যজীবে খাটে, তাহা সর্বজীবে খাটে।

যাহাকে আমি আমার দেহ বলি, সেই দেহের সীমা কোথায়? কই, স্থূলদেহ ত আমার সীমা নহে। আমি যে অনন্তদেশে লীন হইয়া রহিয়াছি! মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যেমন মহাসাগরের অঙ্গ, আমিও তেমনি অনন্তদেশের মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপ মাত্র। আমার বাহিরে চারিধারে আকাশ, আমার অভ্যন্তরে দেহময় আকাশ। বাহিরের আকাশ আমার দেহের ভিতরে-ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমার স্থূলদেহ ছিদ্রময়, অস্থি ছিদ্রময়, নাড়ীসকল ছিদ্রময়। দেহের প্রতি অংশ, অংশেরও প্রতি অংশ এবং তাহারও অণুসমুদয় ছিদ্রময়। দেহের এমন পরমাণু নাই, যাহা ছিদ্রময় নহে। তবে আকাশ আমার কোথায় নাই? আকাশ আমার দেহের সর্বত্র বর্তমান। সেই আকাশই ত অনন্ত আকাশে আসিয়া মিশিয়াছে। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে, আমি অনন্ত আকাশে মিশিয়া আছি।

আমি বায়ুসাগরবেষ্টিত। এই বায়ুসাগরমধ্যে আমি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। শুদ্ধ দ্বীপ নহে, বায়ু এই দ্বীপের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট। বায়ুই এই দ্বীপের অঙ্গ। আমার দেহের কোন্ স্থানে বায়ু নাই? সেই বায়ু কি বাহিরের বায়ুর সহিত মিলিত নহে? বাহিরের বায়ুর শেষ কোথায়? কে জানে অনন্তদেশ কি পদার্থে পরিপূর্ণ? যে বায়ুসাগর অথবা তৎসম পদার্থ অনন্তদেশ ব্যাপিয়া আছে, যাহা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া তোমার দেহ স্পর্শ করিতেছে, সেই বায়ু দেহাভ্যন্তরিক সমুদয় আকাশদেশ পূর্ণ করিয়া তোমাকে অনন্ত বায়ুসাগরের সহিত মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি লোমকূপ দিয়া দেহাভ্যন্তরে গিয়া, গাত্রের প্রতি ছিদ্র ও অণুছিদ্র পূর্ণ করিয়া, প্রতি অস্থির ছিদ্রদেশে প্রতি নাড়ীর আকাশদেশে অবস্থিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দেহমধ্যে কত তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতেছে। বায়ুস্রোত যে কেবল শরীরের বাহিরে অবস্থান করিতেছে এমত নহে, দেহের অভ্যন্তরেও তাহার কার্য চলিতেছে; বায়ুস্রোত যে কেবল অনন্ত বায়ুসাগরে প্রবাহিত এমত নহে, দেহজগতের আভ্যন্তরিক আকাশেও তাহা প্রবাহিত। বায়ু আমাদের শরীরকে অনন্তদেশের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। তাহা শুদ্ধ নাসিকার রন্ধ্র দিয়া যে দেহাভ্যন্তরে যাইতেছে এমত নহে, দেহের সর্বদেশ দিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে এবং দেহকে অনন্তদেশের সহিত একত্র করিয়া রাখিয়াছে। এই বায়ুই শরীরের প্রাণ; জীব বায়ুতে নিয়ত অবস্থান করিয়া জীবিত রহিয়াছে। জীবের চারিদিকে যেমন অনন্ত আকাশ, তেমনি অনন্ত বায়ুসাগর; জীব বায়ুসাগরে মিশিয়া রহিয়াছে। রস ও অগ্নি এই বায়ু-দ্বারাই দেহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। জীব বায়ুময়, বায়ু তাহাতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে।

বাহ্যজগতে শুদ্ধ আকাশ ও বায়ুরাশির দ্বারা যে আমরা অনন্তের সহিত মিশিয়া আছি এমত নহে, অগ্নি এবং রসও আমাদিগকে অনন্তের

সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। বাহ্যজগৎও অগ্নিতেজোময়, আমাদিগের শরীরও অগ্নিময়। অগ্নি আমাদিগের সমুদয় দেহকে জীবিত ও উষ্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরের অগ্নি আমাদিগের গাত্রকে কখনও শীতল, কখনও উষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। যে অগ্নি বাহিরে বর্ত্তমান, সেই অগ্নিই দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত। কেবল স্থানবিশেষে অবান্তর কারণবশতঃ তাহার আধিক্য ও অনাধিক্য ঘটিতেছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এই অগ্নিকে জ্বালিতেছে ও উহার উষ্ণতা বাহিরে আনিতেছে। বাহিরের উত্তাপ গাত্র দিয়া দেহমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, প্রবিষ্ট হইয়া দেহাগ্নিকে রক্ষা করিতেছে। দেহের তাপ আবার গাত্র দিয়া বাহিরের সহিত মিশিতেছে। বাহিরের অনন্তদেশে যেমন অগ্নি কোথাও লীনাবস্থায়, কোথাও স্ফুরিতাবস্থায় রহিয়াছে, শরীরমধ্যেও তদ্রূপ রহিয়াছে। বাহ্যজগতের প্রভাবে তাহা কখনও উদ্দীপ্ত, কখনও বা ঈষৎ আবির্ভূত হইতেছে। দেহের প্রতি পরমাণুতে অগ্নি সমাশ্রিত। সেই লীন অগ্নি কভু উদ্রিক্ত, কভু আবার বিলীন হইতেছে। জীব অগ্নিময় হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। জীবের দেহাভ্যন্তরে প্রতিক্ষণে যে সৃষ্টিকাণ্ড চলিতেছে, যাহাদ্বারা অন্নের ও রসের পরিপাক হইয়া তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে, সেই সৃষ্টিব্যাপার অগ্নি ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টি অগ্নিময়, ব্রহ্মাণ্ড অগ্নিময়, অগ্নি ব্রহ্মাণ্ডময় ও অনন্তদেশে বিস্তৃত—আকাশে, মেঘে, বিদ্যুতে, সূর্য্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে সবত্র পরিব্যাপ্ত। একই অগ্নি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

শুদ্ধ আকাশ, বায়ু ও অগ্নিই কি জীবকে অনন্তের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে? জল এবং রসও তাহাকে অনন্তের সহিত একত্রীভূত করিয়াছে। মনুষ্যের দেহাগার রসে পরিপূর্ণ, বায়ুও রসে পরিপূর্ণ। যে রস বায়ুকে সিক্ত করিয়া শীতল করিতেছে, সেই রস সেই বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিতেছে। শরীরের উত্তাপ এই রসে

কিয়দংশ প্রশমিত হইয়া মন্দীভূত হইতেছে। শরীর বহির্দেশীয় রসে প্লাবিত হইয়া অনন্ত জগতের রসে মিশিয়া রহিয়াছে। বায়ুতরঙ্গ সেই রস দেহের অন্তরে-অন্তরে, শিরায়-শিরায়, কূপে-কূপে, অস্থিতে-অস্থিতে প্রবাহিত করিতেছে। বায়ু আপনি যেমন দেহের সমস্ত আকাশদেশ পরিপূর্ণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক বাহ্যরস লইয়া শরীরেরও সকল পরমাণু সিক্ত করিয়া দিতেছে। আমরা যেসমস্ত পানীয় গ্রহণ করি, তাহা পরিপাককার্যে ব্যবহৃত হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কিন্তু শরীরের সমস্ত রস কোন্ উপায়ে আহৃত হয়? সেই রস কি বাহ্য জগতের বায়ুসঞ্চারিত রস নহে? অতএব যে রস অনন্ত জগতের বায়ুর অন্তরে-অন্তরে প্রবিষ্ট ও সংবিদ্ধ হইয়া আছে, সেই রস আমাদের শরীরে অনুবিদ্ধ হইয়া জগতের রসের সহিত শরীরকে রসসিক্ত করিয়া অনন্তের রসের দ্বারা শারীরিক পরমাণুপুঞ্জকে রসপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। শরীরের জল, শ্লেষ্মা, পিত্ত, স্বেদ ও শোণিত শুদ্ধ যে পানীয় দ্বারা অনুপ্রাণিত রহিয়াছে, এমত নহে; অনন্ত আকাশের রসেও তাহা পরিবর্ধিত ও প্রশমিত হইতেছে। শরীরস্থিত ত্বগাদি ইন্দ্রিয়সমুদয় বাতাত্মক প্রাণদ্বারাই পরিবর্ধিত হইয়া থাকে। ফলতঃ জল, বায়ু ও অগ্নি নিরন্তর জীবগণের শরীরে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ যে তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছে এমত নহে, মনুষ্যদেহকে অনন্তদেশের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছে।

জল, বায়ু অগ্নি ও ব্যোম, এই চতুর্ভূতদ্বারা মানবদেহ কেমন অনন্তের সহিত একাকার হইয়া আছে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পঞ্চম ভূত ক্ষিতির কথা। যদি আমাদের পৃথ্বীতল অনন্তের অংশমাত্র হয়, যদি পৃথিবীদেশ সচ্ছিদ্র আকাশময় হয়, যদি সচ্ছিদ্র আকাশময় ভূমণ্ডল বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যদি অগ্নি ক্ষিতিতলের স্তরে স্তরে সংবিদ্ধ ও বিলীন থাকে, তবে এই কঠিন মেদিনীমণ্ডল তাহার কঠিন সত্তার

সহিত অনন্তদেশে মিশিয়া রহিয়াছে না ত কি ? আমাদের দেহযষ্টিও যে সেই পৃথ্বীদেশের অংশ মাত্র, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ? যদি এই দেহ ক্ষিতিরই অংশ হয় এবং ক্ষিতি যদি অনন্ত বিশ্বের অংশ হয়, তবে আমাদের শরীর যে অনন্ত বিশ্বের অংশ নয়, কে বলিতে পারে ? আর ভূমণ্ডল যদি বিশ্বের সহিত এক হয়, যদি অনন্ত বিশ্ব ভূমণ্ডলকে এক সঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়া থাকে, তবে এই মনুষ্যদেহরূপ ভূমণ্ডলের অংশও অনন্তদেশের সহিত মিশিয়া আছে। ভূমণ্ডলে পঞ্চভূত ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। মানবদেহ যেমন ইন্দ্রিয়াত্মক পঞ্চভূতের ঘনীভূত মূর্তি, ভূমণ্ডলও সেইরূপ অনন্তদেশের এক ঘনীভূত মূর্তি। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রাজ্যে ও অনন্ত আকাশে এইরূপ কত কোটি কোটি ঘনীভূত মূর্তি আছে কে বলিতে পারে ? যেমন অনন্ত বিশ্বের ইয়ত্তা নাই, তেমনি গগনদেশের জ্যোতিষ্করাজিরও ইয়ত্তা নাই। অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে এই সমস্ত ঘনীভূত মূর্তি স্থাপিত ও ভ্রাম্যমাণ হইয়া রহিয়াছে। অনন্ত দেশের যে অংশ পৃথ্বীতলের নিকটবর্ত্তী, সেই অংশে যে সূক্ষ্মভূতসমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই ঘনীভূত হওয়াতে পঞ্চভূতাত্মক পৃথিবী ও তদুপরিস্থ পঞ্চভূতাত্মক প্রাণিপুঞ্জ সৃষ্ট হইয়াছে। এই পঞ্চভূতসমুদয় পৃথ্বীদেশের পঞ্চীকৃত ভূতরাশি হইতে বিকীর্ণ হইয়া যে অনন্তদেশের কতদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছে, কে বলিতে পারে ? সেই সীমার পরও যে এইসমুদয় ভূত আবার কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? এই পঞ্চভূতসমুদয় আবার কি আকারে পরিণত হইয়া কোন্ লোকে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কেবল অনন্তদেবই জানেন। এই সমস্ত লোকমণ্ডলে দেবতারা আবার কি প্রকার সূক্ষ্মাকারে গঠিত তাহাই বা কে জানে ? সে যাহা হউক, অনন্তদেশ যাহাদ্বারাই পরিপূর্ণ থাকুক না কেন, এই ভূমণ্ডল যখন তাহার কণামাত্র, তখন সেই কণায় ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জ যে অনন্তদেশের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাতে আর

সন্দেহ নাই। নিজে ভূমণ্ডলই যখন অনন্তের কণামাত্র, ভূমণ্ডলের প্রাণিপুঞ্জ আবার যখন সেই ভূমণ্ডলের কণামাত্র, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেই প্রাণিপুঞ্জ অনন্তদেশের অনন্ত ক্ষুদ্রতম কণা। আবার সমগ্র মানবকুল কি ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র অংশ নহে? মানবজাতি যখন ভূমণ্ডলস্থ প্রাণিপুঞ্জের অতি ক্ষুদ্র কণা, তখন কি আর পরিমাণ হয়, সেই মানবকুল অনন্তের ক্ষুদ্রতম কণার কণা মাত্র! অনন্তের সহিত তুলনায় এ কণার পরিমাণ হয় না। যাহার পরিমাণ হয় না, তাহা পরমাণুবৎ—তাহা যে অনন্ত বিশ্বের সহিত এক অঙ্গে মিলিয়া থাকিবে তাহাতে আর সংশয় কি? সমগ্র মানবকুলের আমি কত কোটি অংশ? আমার দেহস্থিত একটি পরমাণু আমার বিশাল দেহের যত অংশ, আমি সমস্ত মানবজাতির হয়ত তত অংশ হইবার সম্ভাবনা। সে স্থলে আমি অনন্তদেশের কোথায়? যখন সমগ্র মানবজাতি অনন্তের কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, তখন আমার স্থান যে অনুমানেও পরিমাণ হয় না! আমি কেবল বলিতে পারি, **আমি অনন্তের কোথায়?** আমার প্রতিধ্বনি অমনি বলে, **আমি অনন্তের কোথায়?** বাস্তবিক অনন্তের মধ্যে যে আমি কোথায় লীন হইয়া আছি, কল্পনায়ও তাহা ধারণা হয় না। অনন্ত হইতে সম্ভূত আমি অনন্তধামের যাত্রী এবং অনন্তে আমি লীন হইয়া যাইব।*

এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থা মাত্র। অনন্ত আকাশ, অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল; ভগবান্ সেই অনন্তদেশে ও অনন্তকালে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ক্রমে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন। যিনি নিজে অনন্ত, তাঁহার রূপও অনন্ত। তবে কেন আমাদের চক্ষে এ বিশ্ব খণ্ডিত আকারে পরিচ্ছিন্ন

---

* যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যজীব অবস্থিত, সেই ভূমণ্ডল যে অনন্ত আকাশে অবস্থিত, তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে হইলে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের মোক্ষপর্বাধ্যায় দেখ।

দেখায় ?—বিজ্ঞানচক্ষুর অভাবে। মনুষ্য রজস্তমোগুণান্বিত হইয়া স্থূলদর্শী হইয়াছে। সেই স্থূলদর্শনে সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায়। স্থূলদর্শনে অনন্তের প্রতীতি হয় না। বাহ্যবিজ্ঞান সেই অনন্তের আভাসমাত্র দেয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানে মানুষের সে অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, সেই অন্তর্দৃষ্টিতে সম্যক্ দর্শন উৎপাদিত হইলে অনন্তের পূর্ণ প্রতীতি ও প্রত্যক্ষ হয়। বেদবেদান্ত এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই জ্ঞানচক্ষু বা দেবনেত্র। স্থূলদর্শনে জগতের সমস্তই পরিচ্ছিন্ন দেখায়, এজন্য মানুষের সুখ-দুঃখ বোধ হয়। এই সুখ-দুঃখ আর কিছুই নহে, সেই অনন্ত নিত্যানন্দের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানমাত্র। পরিচ্ছিন্ন বলিয়া খণ্ডিত সুখ ও সুখের অভাব দুঃখ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে কেন? যেহেতু অনন্তের জ্ঞান নাই; অনন্তের জ্ঞান হইলে সেই অনন্ত সুখস্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে তোমাতেই সেই অনন্ত সুখ-জ্ঞান উপলব্ধ হইত। কারণ তুমি ত অনন্ত ছাড়া নহ। তোমাতে অনন্ত সুখ-জ্ঞান হইলে, আর সুখ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এই সুখ পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে কিসে?—বিষয়ভোগে। বিষয়ভোগে লিপ্ত হইলে রিপুগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় সুখ অনবরতই দুঃখদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। এই সুখ-দুঃখের সমত্ব জ্ঞান না জন্মিলে সতত চিত্তপ্রসাদ জন্মে না। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের এবং রিপুগণের সংযমসাধনদ্বারা বিষয়ামোদ হইতে চিত্তকে চিরদিনের জন্য ফিরাইতে পারিয়াছেন, যাঁহারা মায়ামমতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা সকল কর্ম নিষ্কামভাবে করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, যাঁহারা বিষয়সুখ-কামনা পরিত্যাগ করিয়া প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগে তাঁহাতেই আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই অনিত্য সুখ-দুঃখের সমত্ব জ্ঞান হয়। সেইরূপ সুখ-দুঃখের সমত্বজ্ঞান সাধন করিবার পন্থাই হিন্দু-ধর্ম-সাধন-প্রণালী। তাই হিন্দুধর্মের সাধন-প্রণালী মানুষকে নিত্য

চিত্ত-প্রসন্নতায় উপনীত করিয়া তাহাকে আনন্দধামে লইয়া যায়, তাহাই মানবাত্মার মুক্তি। কিসের মুক্তি? পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান এবং পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি বা ভেদদৃষ্টি হইতে মুক্তি। এই মুক্তি সাধিত হইলে আর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বা পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি থাকে না; তখন মানুষ অনন্তজ্ঞানে ও অনন্তসুখে উপনীত হন। সাধক সেই সময় স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন—

স্বয়মন্তর্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিপ্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥—আত্মবোধ, ৬১

—যে প্রকার অগ্নি প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে প্রকাশ করতঃ আপনিও প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবস্তু সমস্ত পদার্থের অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া অখিল সংসারকে প্রকাশন করতঃ স্বয়ং প্রকাশিত রহিয়াছেন।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেষামেব বস্তুতঃ।
তথৈব ভাতি সদ্রূপো হ্যাত্মা সাক্ষিস্বরূপতঃ ॥

—আত্মজ্ঞাননির্ণয়

—যেরূপ আকাশ এই চরাচর বস্তুসমূহের বাহ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া সমুদয় পদার্থের আধাররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি সত্তারূপে ইহার অন্তর্বাহ্যে অবস্থিতি করিয়া আকাশাদি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

সমাধি অভ্যাস

ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিনিয়ত তত্ত্ববিচার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে তত্ত্ববিচার কি? আমি

কে, কোথা হইতে এখানে আসিয়াছি, এবং পরে কোন্ স্থানে যাইব, এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। বিচারদ্বারা এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসা করাকেই তত্ত্ববিচার বলে। যথা—

কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ
কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা
তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্ ॥—বিবেকচূড়ামণি, ৫১

—বন্ধন কি? কি প্রকারে বন্ধন উপস্থিত হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহার স্থিতি হয়? সেই বন্ধন হইতে মুক্তিই বা কি প্রকারে হয়? আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি? জীবাত্মা কি? পরমাত্মা কি? জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদবিচারই বা কিরূপ? ইত্যাদি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্মে কথমস্ত্যপায়ঃ।
জানেন কিঞ্চিৎ কৃপয়ৈব মাং ত্বং
সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব ॥—বিবেকচূড়ামণি, ৪২

—এই সংসার-পারাবার আমি কি প্রকারে পার হইব, আমার গতি কি হইবে? যাহাতে আমার ভবদুঃখ মোচন হয়, তাহার উপায় কি? আমি অজ্ঞ, আমার কিছুই জ্ঞান নাই। প্রভো, আপনি কৃপা বিতরণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।

এইরূপ প্রশ্ন কোন সদ্গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সংসার-দুঃখের নিস্তারোপায়স্বরূপ বলিবেন—

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু ॥—বিবেকচূড়ামণি, ৪৭

—বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে সমীচীন জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানদ্বারা আত্যন্তিক সংসারদুঃখের মোচন হয়। অর্থাৎ

শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধ্যাননিষ্ঠচিত্তে বিচার করিলে জ্ঞানোদয় হয় এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তত্ত্ববিচার করা কিরূপ? এই কথার উত্তর শাস্ত্রেই আছে—

কিমিদং বিশ্বমখিলং কিং স্যামহমিতি স্বয়ম্।
বিচারনিরতৈস্ত্বেতদসদেব ভবেজ্জগৎ ॥—যোগবাশিষ্ঠসার, ৫

—এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই বা কি এবং আমিই বা কি? এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে এই জগৎ অসৎ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

সংসারদীর্ঘরোগস্য সুবিচারমহৌষধম্।
কোঽহং কস্য চ সংসারো বিচারেণ বিলীয়তে ॥—যোগবাশিষ্ঠসার, ৭

—বিচারদ্বারা সংসাররূপ চিরকালব্যাপী সুদীর্ঘ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। আমিই বা কে এবং কাহারই বা সংসার, এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞানবিজৃম্ভিত এই সংসার এককালে লয় প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে তুমি ইহা নহ, উহা নহ এবং এই জগৎপ্রপঞ্চ যাহা দেখিতেছ, ইহার কিছুই তুমি নহ, তুমি সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মা; তুমি কেবল মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া এইরূপ হইয়াছ। যথা—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥—গীতা

তুমি প্রকৃতির গুণদ্বারা সমাবৃত হইয়া "আমি" "আমি" জ্ঞানে আপনাকে সকল প্রকার ক্রিয়াকর্মের কর্তা বলিয়া অভিমান করিতেছ। তুমি বাস্তবিক নিষ্ক্রিয়, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, উদাসীন এবং সৎস্বরূপ; "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য যে, যদি আমি ব্রহ্ম হইলাম, তবে আমি সক্রিয় ও জীবভাবে স্থিত, আর ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও সৎস্বরূপে স্থিত—এরূপ বিরুদ্ধভাব পরস্পরের মধ্যে কেন হয় ? ইহার উত্তর এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিরোধ কেবল উপাধিজন্য হয়, প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। যথা—

তয়োর্বিরোধোঽয়মুপাধিকল্পিতো
ন বাস্তবঃ কশ্চিদুপাধিরেষঃ।
ঈশস্যমায়া মহদাদিকারণং
জীবস্য কার্যং শৃণু পঞ্চকোষম্ ॥ —বিবেকচূড়ামণি, ২৪৫

— পরমাত্মা ও জীবাত্মার এই যে বিরোধ, তাহা শুদ্ধ উপাধিদ্বারা কল্পিত মাত্র। বাস্তবিক তাহাতে কোন বিরোধ নাই। মহৎ আদির কারণ মায়া ঈশ্বরের উপাধি এবং অবিদ্যার কার্য পঞ্চকোষ জীবের উপাধি।

এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ
সম্যক্ নিরাসেন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটক-
স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা ॥—বিবেকচূড়ামণি, ২৪৬

—মায়া ও পঞ্চকোষ এতদ্দ্বয় নিরাকৃত হইলে, ঈশ্বর এবং জীবরূপ যে উপাধিদ্বয়, তাহাও সম্যক্‌রূপে নিরাকৃত হয়, সেরূপ রাজ্যজন্য রাজা ও গদাজন্য যোদ্ধা-উপাধি ঘটে, কিন্তু রাজ্য ও গদা রহিত হইলে রাজা ও যোদ্ধা উভয়েই তুল্য হয়, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবরূপ উপাধি-রহিত হইলে উভয়ে তুল্য হন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র থাকেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে এই উপাধির নিরাকরণ করিয়া কেবল সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইবে। বেদান্তশাস্ত্রে "অধ্যারোপ" ও "অপবাদ" ন্যায় দ্বারা উপাধিসকলের নিরাস ও সম্বন্ধত্রয়দ্বারা "তত্ত্বমসি" পদের ঐক্য করা হইয়াছে। প্রাগুক্ত ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি-পুরুষ উদ্ভূত হইয়া যে জীবজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে

যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাদ্বারা মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাস করিয়া এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতএব সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন সাধক ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিনিয়ত এইরূপে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু সমাধিযোগ ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপবোধ হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মভাব কেবল সমাধি অবস্থাতেই অনুভূত হইয়া থাকে। সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন অন্য কাহারও ব্রহ্মের স্বরূপবোধ হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মে না। যথা—

সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈর্নির্বিকল্পৈর্দেহাত্মাধ্যাসবর্জিতৈঃ॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ৩।৮

যাঁহারা শত্রু ও মিত্রে সমদর্শী, সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বের অতীত, সঙ্কল্পবিকল্পরহিত, আত্মাভিমানহীন, তাহারাই সমাধিযোগদ্বারা এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

বীতরাগভয়ক্রোধৈর্মুনিভির্বেদপারগৈঃ।
নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ॥—শ্রুতি

—যাঁহাদিগের রাগ, ভয়, ক্রোধাদি সর্বপ্রকার দোষ বিদূরিত হইয়াছে এবং যাঁহারা বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, সেই বিবেকী মুনিগণ নির্বিকল্পক অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারেন। সেই আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপশম হয়। রাগদ্বেষাদিশূন্য বেদার্থতৎপর যোগীরাই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন। তদ্ভিন্ন যাহাদিগের চিত্ত রাগদ্বেষাদি দোষে কলুষিত, তাহারা কখনই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে অধিকারী নহে। কেননা—

ভ্রান্তিজ্ঞানং স্থিতং বাহ্যে সম্যগ্ জ্ঞানঞ্চ মধ্যগম্।
মধ্যাৎ মধ্যতরং জ্ঞেয়ং নারিকেলফলাম্বুবৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৫।১২৩

বাহ্য জগৎ কেবল ভ্রান্তিজ্ঞানে পূর্ণ। তাহা অতিক্রম করিয়া অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হইলে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাকে মধ্যম জ্ঞান বলে। সেই মধ্যম জ্ঞানকে অতিক্রম করিলে মধ্যতর জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞানই যোগিগণের জ্ঞেয়। যেরূপ নারিকেলফলের বাহ্যদৃশ্য অতি নিকৃষ্ট অর্থাৎ কেবল ছোবড়া, ঐ ছোবড়া ছাড়াইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে প্রকৃত ফলটি দৃষ্ট হয়, তৎপরে সেই ফলটি ভাঙ্গিলে উহার সারাংশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানও এইরূপ। অতএব রিপু ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে পরিদৃশ্যমান জগতের মর্মভেদ করিতে পারা যায় না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত অধিকারী হইয়া কি করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে? উত্তর—সমাধি অভ্যাস করিলে। যথা—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥—গীতা ১৩।২৫,২৬

—কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানযোগদ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন, কেহ বা আত্মাদ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন অর্থাৎ সমাধিদ্বারা সন্দর্শন করেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা সাংখ্যযোগদ্বারা অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর ভেদজ্ঞানদ্বারা আত্মাকে সন্দর্শন করেন। অপর ব্যক্তিরা কর্মযোগদ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপূর্বক উপাসনাদ্বারা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ বা আত্মাকে অবগত না হইয়া অন্য আচার্য-সন্নিধানে উপদেশবাক্য শ্রবণ-পূর্বক তাঁহার উপাসনা করেন। এই সকল শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরাও মৃত্যুকে অতিক্রমপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভের বহুতর উপায় থাকা সত্ত্বেও তাহা কেবল সমাধিগম্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে কেন? তাহার মীমাংসা এই যে, সকল লোকের প্রকৃতি সমান নহে বলিয়া

যোগবিষয়ে সকলে অধিকারী হইতে পারে না। সুতরাং যে যেরূপ যোগ্য হইবে, সে সেইরূপ মত অবলম্বন করিবে। এইজন্য বহুতর উপদেশ উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল উপদেশ কেবল চরম পথে লইয়া যাইবার সোপানস্বরূপ। অনেক জন্ম-জন্মান্তর ক্ষেপণ করিলে তবে চরম পথে পৌঁছিবার উপযুক্ত হয়। এজন্য উক্ত হইয়াছে যে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥—গীতা, ৭।১৯

—মনুষ্য স্বীয় স্বীয় অধিকারনিষ্ঠ ক্রিয়াদিদ্বারা অনেক জন্ম ক্ষেপণ করিয়া প্রতি জন্মে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে করিতে শেষ জন্মে আত্মজ্ঞানী হইয়া "বাসুদেবই অর্থাৎ পরমাত্মাই এই চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ড" এইরূপ জ্ঞানে আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে ভজনা করেন; সুতরাং এরূপ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ।

এই সকল উপদেশের মর্মকথা এই যে, প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিতে কখনই নিবৃত্তিমার্গে আসা যায় না এবং নিবৃত্তি না হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, সুতরাং নিবৃত্তির আবশ্যক। বলপূর্বক নিবৃত্তি হয় না, ভোগ পূর্ণ হইলে নিবৃত্তি আপনি হয়। যেরূপ ক্ষুধা থাকিতে ভোজনের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ হয় না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ; সেইরূপ ভোগের অবসান না হইলে ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি হয় না, ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল কামনা ও কর্মদ্বারা ভোগাভিলাষ স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা যাবৎ না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাবৎ শুভ বা অশুভ যে সকল কর্ম করা হইয়াছে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।*

প্রারব্ধং নিশ্চয়াদ্ ভুঙক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নির্বীর্যং ক্রিয়তে তথা ॥—শ্রুতি

প্রারব্ধকর্মের ভোগ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে এবং অনারব্ধ কর্মসকল

* অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্ ।—স্মৃতি

জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হয় অর্থাৎ নির্বীর্যতাহেতু তাহাতে আর অঙ্কুর হয় না। যেমন, "ইষুচক্রাদিদৃষ্টান্তাৎ নৈবারব্ধং বিনশ্যতি"—বাণ পরিত্যাগ করিলে তাহার প্রতি ধানুষ্কের এবং বেগে চক্র ঘুরাইয়া দিলে তাহার প্রতি কুম্ভকারের আর কোনরূপ অধিকার থাকে না ; তদ্রূপ (জ্ঞানলাভ মাত্রেই) প্রারব্ধকর্মের নাশ হয় না। যথা—

এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥—পঞ্চদশী, ৭।২৪৫

—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেও প্রারব্ধকর্মের ভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমে ক্রমে হয় এবং ভোগকালে কখনও কখনও আপনার মর্ত্যত্ব জ্ঞান হয়।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥—গীতা, ৫।১১, ১২

—চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মযোগীরা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া শরীর, মন, বুদ্ধি ও মমত্ববুদ্ধিহীন ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করেন। যোগিগণ পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ হইয়া কর্মফলত্যাগানন্তর মোক্ষলাভ করেন ; কিন্তু কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি ফলপ্রত্যাশী হইয়া অবশ্য বদ্ধ হয়।

প্রারব্ধকর্ম যে ভোগ ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, তাহার বিস্তর উদাহরণ শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—

দশমোঽপি শিরস্তাড়ন্ রুদন্ বুদ্ধা ন রোদিতি।
শিরব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ॥
দশমামৃতিলাভেন জাতহর্ষো ব্রণব্যথাম্।
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্ ॥—পঞ্চদশী

—যেমন দশম ব্যক্তি তাহার সঙ্গীর মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া রোদন করতঃ খেদে স্বীয় শিরোদেশে আঘাত করে এবং পশ্চাৎ উপদেশদ্বারা

অবগত হইলে রোদনে নিবৃত্ত হইয়া হৃষ্ট হইলেও তাহার শিরোবেদনার হঠাৎ শান্তি হয় না, ক্রমে শান্তি হয়; তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানীর জীবন্মুক্তি লাভ হইলেও প্রারব্ধকর্মবশতঃ সাংসারিক সুখদুঃখাদির সহসা আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়।

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।

—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে হঠাৎ সেই সর্প দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাতে রজ্জুজ্ঞান হইলেও সেই হৃৎকম্পাদি সহসা নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব-সাধকব্যক্তি প্রারব্ধকর্ম ভোগ করিবেন এবং অনারব্ধ কর্ম নিষ্কামভাবে সাধন করিয়া যাইবেন। তাহা হইলে প্রারব্ধকর্মভোগ ক্ষয় হইলেই আর কোনরূপ ফলভোগের আশঙ্কা না থাকা প্রযুক্ত আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ হইবে না। কারণ অনারব্ধ কর্মবীজসকল নিষ্কাম সাধন ও জ্ঞানবলে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ঐ দগ্ধ বীজ হইতে আর অঙ্কুরোৎপাদন হইবে না। যথা—

বীজান্যগ্ন্যপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥—শ্রুতি

—অগ্নিদগ্ধ বীজে যেরূপ অঙ্কুর হয় না, সেইরূপ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশাত্মক কর্মে আত্মার পুনরায় জন্ম হয় না।

ভর্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্যকরাণি চ।
বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যা সত্ত্ববোধাৎ ন কার্যকৃৎ॥—পঞ্চদশী

যেমন কোন বৃক্ষবীজ অগ্নিদ্বারা ভর্জিত হইলে তাহার আর অঙ্কুর হয় না, তদ্রূপ বিষয়ের অসত্তাবোধহেতু জ্ঞানীদিগের ইচ্ছা আর কার্য করিতে সমর্থ হয় না।

"প্রারব্ধকর্মজন্য যাহা ভোগ হয় তাহা হউক, এক্ষণে আর এরূপ কোন কামনাপূর্ণ কর্মের অনুষ্ঠান করা হইবে না—যদ্দ্বারা পুনরাগমন

করিতে হইবে”—এইরূপ স্থির করিয়া সাধক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান-পূর্বক সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে প্রতিনিয়ত তত্ত্ব-বিচার করিবেন। সুখাসন কাহাকে বলে?—না, সাধকগণের অনায়াস-সাধ্য উপবেশন মাত্র। যথা—

অনায়াসেন যেন স্যাৎ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্ বিজানীয়াৎ যোগিনাং সুখদায়কম্॥

যেরূপে অবস্থানপূর্বক অজস্র ব্রহ্মচিন্তা করা যায়, সেই সুখদায়ক উপবেশনকে আসন বলিয়া জানিও।

সাধক সুখাসনে উপবেশন করিয়া অজস্র তত্ত্ববিচার ও ব্রহ্মচিন্তা করিবেন। তাহা হইলে ক্রমশঃ মূলাধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইয়া সহস্রারে গমনপূর্বক পরমশিবের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইয়া দিব্যকুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই সময়ে সাধকও ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিতে করিতে সমাধিস্থ হন।

বেদান্তমতে সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্বিকল্প। যথা—

জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্।—বেদান্তসার

—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি।

আর—

জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়াদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্।—বেদান্তসার

—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্বিকল্প সমাধি।

নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সমাধিভঙ্গ হইলে পর সাধক অন্তর্বাহ্যে আর ভ্রান্তিদর্শন করেন না। তখন সমস্তই পূর্ণব্রহ্মরূপে দর্শন করেন এবং তখনই ব্রহ্মজ্ঞানের উপভোগ হইয়া থাকে। এতদবস্থায় সাধকগণের যে জ্ঞান তাহাই—

ব্রহ্মজ্ঞান।

সমাধি অভ্যাসের পরিপক্কাবস্থায় এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে তখন সাধককে বলা যাইতে পারে যে—

বর্ণধর্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥

—অজ্ঞানবোধিনী

—তুমি বর্ণধর্ম, আশ্রম, আচার এবং শাস্ত্ররূপ যন্ত্রে যোজিত ছিলে। এক্ষণে পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরী (সিংহ) যেরূপ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া নির্গত হয়, তুমিও সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া নির্গত হইলে। তোমার বর্ণাশ্রম নাই, ধর্মাধর্মও নাই।

যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে, ততদিনই মনুষ্য বেদবিধির দাস হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রমাভিমানশূন্য হইলে তিনি সেই বেদের মস্তকে অবস্থান করেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ।
প্রামাণ্যং কর্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে॥

—অজ্ঞানবোধিনী

—যতদিন প্রমাণদ্বারা দেহের আত্মভ্রম না নিবৃত্ত হয়, ততদিনই কর্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতীত হয়। যখন তোমার "আমি দেহ নহি" এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন আর তোমার কোনরূপ কর্মেই কর্তৃত্ব নাই। কেননা—

ব্রহ্মজ্ঞানপদং জ্ঞাত্বা সর্ববিদ্যা স্থিরা ভবেৎ।

—ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমপদ লাভ হইলে সর্বশাস্ত্রই স্থির ও নিশ্চেষ্ট হয়। অতএব—

ততো ব্রহ্মাত্মবস্ত্বৈক্যং জ্ঞাত্বা দৃশ্যমসত্তয়া।

অদ্বৈতে ব্রহ্মণি স্থেয়ং প্রত্যগ্ ব্রহ্মাত্মনা সদা ॥—শঙ্করবিজয়, ১।৭৮

ব্রহ্মাত্মবস্তুর ঐক্য জানিয়া দৃশ্য বস্তুসকল অসত্যজ্ঞানে ও প্রত্যগ্ ব্রহ্মরূপে অদ্বৈতজ্ঞানে সেই পরব্রহ্মে স্থিত হইবে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।১১

—তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অদ্বৈতজ্ঞানের নামই তত্ত্ব এবং সেই জ্ঞানই কখন ব্রহ্ম, কখন পরমাত্মা এবং কখন বা ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এজন্য অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই সত্য, তদ্ভিন্ন দ্বৈতাদি জ্ঞান মিথ্যা এবং ভ্রমসঙ্কুল। যথা—

অদ্বৈতমেব সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমসৎ সদা।

শুদ্ধঃ কথমশুদ্ধঃ স্যাৎ দৃশ্যং মায়াময়ং ততঃ ॥

শুক্তৌ রৌপ্যং মৃষা যদ্বৎ তথা বিশ্বং পরাত্মনি।

বিদ্যতে চ সতঃ সত্ত্বং নাসতঃ সত্ত্বমস্তি বা ॥—শঙ্করবিজয়,৯।৫১-৫২

যেরূপ শুক্তিতে রজতজ্ঞান মিথ্যা, সেইরূপ পরমাত্মাতে জগৎজ্ঞান মিথ্যা। কেবল অদ্বৈতজ্ঞানই সত্য আর দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা। কারণ শুদ্ধ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অশুদ্ধ অসৎরূপ জগৎ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অতএব এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময় ও কেবল ভ্রমমাত্র। বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু আদৌ নাই।

বাধ্যত্বাদ্বৈব সদ্দ্বৈতং নাসৎ প্রত্যক্ষভানতঃ।

ন চ সৎ সদ্বিরুদ্ধত্বাদতোঽনির্বাচ্যমেব তৎ ॥

যঃ পূর্বমেক এবাসীৎ সৃষ্ট্বা পশ্চাদিদং জগৎ।

প্রবিষ্টো জীবরূপেণ স এবাত্মা ভবান্ পরঃ ॥—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৩ ৫৪

—দ্বৈতবস্তু বাধ্যনিবন্ধন সৎ নয়, প্রত্যক্ষভানজন্য অসৎও নয় এবং সতের বিরুদ্ধ বলিয়া সৎও নয়। সুতরাং ইহা অনির্বাচ্য অর্থাৎ সৎ বা অসৎ ইহাকে কিছুই বলা যায় না। কারণ, যে এক সৎ ছিলেন, তিনিই পশ্চাৎ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। অতএব সেই পরমাত্মাই তুমি।

সচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্মৃতাত্মতয়া পরম্।

জীবভাবমনুপ্রাপ্তঃ স এবাত্মাসি বোধতঃ।

অদ্বয়ানন্দচিন্মাত্রঃ শুদ্ধঃ সাম্রাজ্যমাগতঃ ॥—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৫

—তুমিই সচ্চিদানন্দ। তুমি যে "পরমাত্মা" তাহা বিস্মৃত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। জ্ঞান হইলে সেই অদ্বয়ানন্দ চিন্মাত্র শুদ্ধ আত্মাই যে তুমি, তাহা বুঝিতে পারিবে এবং সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবে।

কর্তৃত্বাদীনি যান্যাসংস্ত্বয়ি ব্রহ্মাদ্বয়ে পরে।

তানীদানীং বিচার্য ত্বং কিংস্বরূপাণি বস্তুতঃ ॥—শঙ্করবিজয়, ৯।৫৭

—তুমি অদ্বয় ব্রহ্ম, তোমাতে যে কর্তৃত্বাদি ন্যস্ত ছিল, তাহা এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া দেখ যে, সে সকল বস্তু যথার্থপক্ষে কিরূপ।

বস্তুতো নিষ্প্রপঞ্চোঽসি নিত্যমুক্তস্বভাবতঃ।

ন তে বন্ধবিমোক্ষৌ স্তঃ কল্পিতৌ তৌ যতস্ত্বয়ি ॥—শঙ্করবিজয়,৯।৫৮

—বস্তুতঃ তুমি নিষ্প্রপঞ্চ ও নিত্যমুক্ত, তোমাতে বন্ধ বা মোক্ষভাব নাই ; সে সকল তোমাতে কল্পিতমাত্র।

শ্রুতিসিদ্ধান্তসারোঽয়ং তথৈব ত্বং স্বয়া ধিয়া।

সংবিচার্য নিদিধ্যাস্য নিজানন্দাত্মকং পরম্ ॥

সাক্ষাৎকৃত্বাপরিচ্ছিন্নাদ্বৈতব্রহ্মাক্ষরং স্বয়ম্।

জীবন্নেব বিনির্মুক্তো বিশ্রান্তঃ শান্তিমাশ্রয় ॥

—ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত বাক্য জানিবে। অতএব তুমি স্বীয় বুদ্ধি-দ্বারা বিচার ও নিদিধ্যাসন করতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বৈত, অক্ষর, পরম নিত্যানন্দ স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া জীবন্মুক্ত, বিশ্রান্ত ও শান্তিপ্রাপ্ত হও।

এরূপ অবস্থায় সাধকের যে জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান। সেই ব্রহ্মজ্ঞান এইরূপ—

মনোবাক্যং তথা কর্ম তৃতীয়ং যত্র লীয়তে।
বিনা স্বপ্নং যথা নিদ্রা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥—জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র, ৫৯

—মন, বাক্য ও কর্ম এই তিনটি বিষয় যে জ্ঞানে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান। স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রা যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, উহা ঠিক সেইরূপ অর্থাৎ সুষুপ্ত্যবস্থার ন্যায়।

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবর্জিতঃ।
বালভাবস্তথাভাবো ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥—জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র, ৬০

—যে জ্ঞানে জীব নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রাবর্জিত হয় এবং বালকের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হয়, সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

ভগবান্ ব্যাস শুকদেবকে বলিয়াছিলেন—

ভূমিষ্ঠানীব ভূতানি পর্বতস্থো বিলোকয়।—মহাভারত

—এক্ষণে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া পর্বতস্থ ব্যক্তির ন্যায় ভূতলস্থ লোকদিগের সহিত নির্লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন কর।

জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের সাধনা

বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক বেদান্তবাক্যের বিচার মুখ্য অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যেসকল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্দ্যবশতঃ এবং

বিষয়ানুরাগরূপ প্রতিবন্ধকহেতু অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সেই সকল ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারেরসঙ্গে সঙ্গে গুরুর উপদেশানুসারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যোগাভ্যাস করিবে। যদিও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানকেই শাস্ত্রে যোগ বলে, তথাপি ব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, বিচারদ্বারা যাহারা তাহাতে অসমর্থ হয়, তাহারা চিত্তসংরোধদ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্যতালাভে প্রয়াস পাইয়া থাকে। এজন্য সচরাচর লোক যোগ-শব্দে প্রাণসংরোধকেই নির্দেশ করে।* বেদান্তমতে এই যোগ পঞ্চদশ অবয়ববিশিষ্ট। ইহাই বেদান্তোক্ত রাজযোগ। রাজ-যোগের পঞ্চদশ অঙ্গ, যথা—

যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্‌স্থিতিঃ॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥

—বেদান্তরত্নাবলী, ২।১০২-১০৩

—যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্‌স্থিতি, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মজ্ঞান ও সমাধি এই পঞ্চদশ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিয়া যথানিয়মে কার্যানুষ্ঠান করিলেই আত্মজ্ঞান-লাভার্থী আপন শ্রেয়ঃসাধন করিতে পারে। অতএব গুরুর উপদেশানুসারে এই যোগ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে।

* যোগ শব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণসংরোধ উভয়ই বুঝায় বটে, কিন্তু প্রাণসংরোধই যোগশব্দে রূঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যোগ ও জ্ঞান এই দুইটি উপায়ই সমান ও সমফলপ্রদ। তবে বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়জ্ঞান অসাধ্য; তাহারা প্রাণসংরোধ-যোগ অভ্যাস করিবে। অতএব যাহারা বেদান্তমতে ব্রহ্মবিচার বা পঞ্চদশাঙ্গবিশিষ্ট রাজযোগসাধনে অক্ষম, তাহারা মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" ও এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত প্রাণসংরোধ-যোগ অভ্যাস করিয়া আত্মজ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইবে।

এক্ষণে পঞ্চদশাঙ্গ যোগের লক্ষণ নিরূপণ করা যাউক।

যম—"আকাশাদি দেহান্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে শব্দাদি স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবারিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ ইন্দ্রিয়নিবারণই যম বলিয়া কথিত হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়সকল বিনাশী ও অতিশয় দুঃখপ্রদ, এইরূপ দোষদর্শনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবারিত করিতে পারিলেই যমসাধন হয়।

নিয়ম—"আমি অসঙ্গ ও নিরিন্দ্রিয় পরব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানপ্রবাহ অর্থাৎ সর্বদা উক্তপ্রকার বিশ্বাস রাখিয়া পূর্বসংস্কার ত্যাগপূর্বক ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতে যে মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহার নাম নিয়ম। এই নিয়মসাধন দ্বারা পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়।

ত্যাগ—চিন্ময় ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা ঘটপটাদি পদার্থসকলের নাম-রূপের কল্পনা পরিত্যাগপূর্বক যে উপেক্ষা, তাহাকে ত্যাগ বলা যায়।*

মৌন—অন্য বাক্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই ব্রহ্মে বাক্যবিন্যাসকে মৌন বলিয়া থাকে। "আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ"—সর্বদা এইরূপ মনন করাকেও মৌন বলা হয়। যাঁহারা বাক্যসংযমকে মৌন বলেন, তাঁহারা বালকের বা বোবার বাক্যহীনতাকে কি বলিবেন? প্রকৃত পক্ষে বাজে কথা ছাড়িয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানই মৌন।

* আত্মতত্ত্ববিৎ মহাত্মাগণ এইরূপ ত্যাগকে যথার্থ ত্যাগ বলেন। নতুবা লেংটী পরিয়া বা লেংটা হইয়া বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেই তাহাকে ত্যাগ বলে না। মনের আসক্তি পরিহার করাকেই ত্যাগ বলা যায়। যে সকল পরদোষানুশীলনকারী ব্যক্তি সন্ন্যাসীকে আংটী বা জামা-জোড়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া ভ্রূভঙ্গী করেন, তাঁহারা এই কথাটি মনে রাখিবেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য মণিরত্নমালায় লিখিয়াছেন, 'ত্যাগ কি? আসক্তি পরিহার।'

দেশ—যে দেশে আদি, মধ্য ও অন্তে জন থাকে না, সেই দেশকে নির্জন দেশ বলে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে জনশূন্য দেশই যোগসাধনের উপযুক্ত।

কাল—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আধার অখণ্ডানন্দস্বরূপ অদ্বয়কেই কাল শব্দে নির্দেশ করা যায়। এই কালই যোগের প্রধান অঙ্গ।

আসন—যাঁহাতে সর্বভূত প্রসিদ্ধ আছে এবং সিদ্ধ মহাত্মারা সমাধি আশ্রয় করিয়া যাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকেই আসন বলিয়া জ্ঞান করিবে।

মূলবন্ধ—যিনি আকাশাদি সর্বভূতের আদিকারণ, চিত্তবন্ধনের কারণস্বরূপ, অজ্ঞানের মূল, ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত, এক লক্ষ্যে চিত্তানুরাগের কারণ, তিনিই মূলবন্ধরূপে উক্ত হন। এই মূলবন্ধ রাজযোগিদের সেব্য।

দেহসাম্য—কেবল শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় দেহকে সরলভাবে রাখিলে দেহের সাম্যাবস্থা হয় না; সর্বভূতে সমদৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মে যে দেহের লয়, তাহাই দেহের সাম্যাবস্থা।

দৃক্‌স্থিতি—দৃষ্টিকে জ্ঞানময় করিয়া সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টিদ্বারা এই জগৎকে ব্রহ্মময় অবলোকন করিবে। এই দৃষ্টিকে পরম উদারদৃষ্টি বলে। দৃষ্টির এইরূপ অবস্থাকে দৃক্‌স্থিতি বলে।

প্রাণসংযম—চিত্তাদি সর্বভাবকে ব্রহ্মস্বরূপে চিন্তা করিয়া সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধকে প্রাণসংযম বা প্রাণায়াম বলে।* প্রাণায়াম ত্রিবিধ, যথা—রেচক, পূরক ও কুম্ভক। এই প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞানই রেচক-প্রাণায়াম; "এক ব্রহ্মই সর্বময়" এইরূপ

---

* পাতঞ্জলমতে প্রাণ ও মনের নিরোধকে প্রাণায়াম বলে। যাঁহারা ব্রহ্মের নিঃসন্দেহ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই সকল জ্ঞানীব্যক্তিরা উপরোক্তমত প্রাণায়াম করিবেন এবং যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অনধিকারী, তাহারা প্রাণবায়ুর সংযমরূপ প্রাণায়াম করিবে। যথা—

অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্। —বেদান্তরত্নাবলী

অদ্বৈতজ্ঞান পূরক-প্রাণায়াম বলিয়া অভিহিত হয়; এবং "সকলই ব্রহ্মময়" এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান হইয়া যে বৃত্তিনিরোধ হয় অর্থাৎ বিষয়াদি উপেক্ষা করিয়া সর্বপ্রকারে বৃত্তিসকল সেই ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে থাকে, তাহাই কুম্ভক প্রাণায়াম।

প্রত্যাহার—ঘটাদি কার্য শব্দাদি বিষয়ে আত্মানাত্মত্ব অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল বিষয়ের আত্মানাত্মত্ব নিশ্চয় করতঃ চিন্ময় পরমাত্মাতে যে মনোনিমজ্জন অর্থাৎ সর্বপ্রকারে সেই চিন্ময় পরমাত্মাতে যে মনস্থাপন তাহাকেই প্রত্যাহার বলে।

ধারণা—যে যে বিষয়ে মন গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মের সত্তা জানিয়া সেই সকল বিষয়ের নাম-রূপাদি উপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানে মন স্থাপন করার নাম ধারণা।

আত্মধ্যান—সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া দেহানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মরূপে যে অবস্থান তাহাকেই আত্মধ্যান বলে।

সমাধি—অন্তঃকরণ হইতে সর্বপ্রকারে বিষয়ানুসন্ধান নিরাকরণ-পূর্বক নির্বিকারচিত্তে সর্বতোভাবে আপনাকে ব্রহ্মরূপে স্মরণ করিবে এবং সর্ব প্রপঞ্চভাব পরিত্যাগ করিবে। "সেই ব্রহ্ম আমার ধ্যেয়, আমি তাঁহার ধ্যান করি" এইরূপ দ্বৈতভাবও রাখিবে না, সর্বদা সর্বপ্রকারে ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান করিবে। এই প্রকার ব্রহ্মানুস্মরণকে সমাধি কহে।

এই সমাধির নামই তত্ত্বজ্ঞান। অখণ্ডানন্দকর ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষফল প্রদান করে। অতএব যাবৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থানাত্মক সমাধি না হয়, তাবৎ গুরুর আজ্ঞানুসারে প্রোক্ত প্রকারে যোগসাধন করিবে। কখনও যোগসাধনে অনাদর করিবে না; যেহেতু সমাধি-সাধনকালে নানা-প্রকার বিঘ্ন বলপূর্বক আগমন করিয়া থাকে। অনুসন্ধানরাহিত্য, আলস্য,

ভোগস্পৃহা, নিদ্রা, কার্যাকার্যের অবিবেচনা, বিষয়ানুরাগ, রসাস্বাদ অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানে কিঞ্চিৎ রসবোধ হইলে "আমি ধন্য হইয়াছি" বলিয়া সাধন-কার্যে অনাদর এবং রাগ, দ্বেষ ও উৎকট বাসনাদ্বারা চিত্তের বৈকল্য ইত্যাদি নানাবিধ বিঘ্ন সমাধি-সাধনের প্রতিকূল আচরণ করে। অতএব যোগিগণ এই সকল বিঘ্ননিবারণার্থ অবহিতচিত্তে সর্বদা যোগ-সাধনে তৎপর থাকিবেন। পরমজ্ঞানী শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥

—বেদান্তরত্নাবলী,।২।১২৯

বৃত্তি অর্থাৎ মানসিক অনুরাগই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। যাহার বিষয়াদিতে মনের অনুরাগ হয়, সেই ব্যক্তি চিরকাল বিষয়ে বদ্ধ থাকে এবং যাহার মন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচিন্তনে নিযুক্ত হয়, তাহারই মোক্ষ হয়।* যাহার চিত্তবৃত্তি ঘটনাদি-আকারবিশিষ্ট ভাবরূপে অনুগত হয়, তাহার মনে সেই সকল ভাবপদার্থই প্রকাশ পায়। যাহার অন্তঃকরণ শূন্যবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহার চিত্ত শূন্যময় হয় এবং চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে অনুগত হইলে পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করে। অতএব যাহাতে পূর্ণ-ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হইতে পারে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেরূপে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবেন। ব্রহ্মে আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে কেবল মৌখিক বাগ্-বিস্তারে কোনরূপ ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যাহারা ব্রহ্মবৃত্তিকে পরি-ত্যাগ করে, তাহারা বৃথা জীবন ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছে। সেই সকল মনুষ্য নরাকৃতি পশু মাত্র।

মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্বদা ব্রহ্মতৎপর হইয়া এই রাজযোগ সাধন করিবেন। যাঁহারা সর্বসম্পৎপ্রদায়িনী ব্রহ্মবৃত্তিকে জানেন এবং জানিয়া

* মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥—অমৃতবিন্দু গীতা

সেই বৃত্তিকে বর্ধিত করেন, তাঁহারাই সৎপুরুষ (সাধু) ও ধন্যজন্মা। তাঁহাদিগকে ত্রিভুবনে বন্দনা করিয়া থাকে। যথা—

যে হি বৃত্তিং বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে॥

—বেদান্তরত্নাবলী, ২।১৩১

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে ব্রহ্মবিৎ পুরুষ হইতে পূজনীয় আর কেহ নাই।

ব্রহ্মানন্দ

প্রকৃত ব্রহ্মগতপ্রাণ সাধক সাধারণ মনুষ্যমণ্ডলী হইতে অনেক উচ্চস্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি যেস্থানে বাস করেন, তথায় রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃত্যু-দুঃখ-দারিদ্র্য এ সকল কিছুই নাই। তিনি পৃথিবীতে থাকিলেও ব্রহ্মলোকবাসী, রুগ্ন হইলেও বলবান্ ও সুস্থ, দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি মহৈশ্বর্যবান্ এবং ভিখারী অবস্থাতেও রাজচক্রবর্তী। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

শ্রীমাংশ্চ কঃ ? যস্য সমস্ততোষঃ।
কো বা দরিদ্রো হি ? বিশালতৃষ্ণঃ॥—মণিরত্নমালা

—ধনী কে ? যিনি সদা সন্তোষযুক্ত। দরিদ্র কে ?—যাহার আশা অধিক।*

বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ মর্ত্যজীবগণের এত উচ্চে অবস্থিতি করেন যে, প্রাকৃতব্যক্তিরা তাঁহার সে উচ্চতার পরিমাণ নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে

* তুলসীদাস বলিয়াছেন—

গোধন, গজধন, বাজীধন, ঔর রতনধন খান্।
জব আওত সন্তোষধন, সব ধন ধূলি সমান॥

তাঁহার নিন্দা করে এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অণুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে না। তিনি স্বীয় করতলস্থ শান্তিরূপ মহাখড়্গদ্বারা তাহাদিগের সকল আক্রমণকেই ব্যর্থ করিয়া থাকেন। যথা—

ক্ষমাবশীকৃতো লোকঃ ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ॥ —মহাভারত

—ক্ষমাদ্বারা লোক বশীভূত হয়, ক্ষমাদ্বারা কি না হয়? শান্তিরূপ খড়্গ যাঁহার হস্তে আছে, দুর্জন ব্যক্তি তাঁহার কি করিতে পারে?

বস্তুতঃ অজ্ঞান মনুষ্যগণ তখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারুক আর নাই পারুক, স্বর্গস্থ দেবতাগণের নিকট তিনি সে অবস্থায় সর্বদা পূজিত হইয়া থাকেন।

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তু-
স্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্॥
—মহাভারত

—যিনি অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রূক্ষবাক্য প্রয়োগ করেন না এবং অতিমাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয়বাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্যনিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না এবং হন্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছাও করেন না, তাঁহাকে এ সংসারে দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন।

বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মাবিষ্ণ্বিন্দ্রশঙ্করাঃ॥—যোগবাশিষ্ঠ

ব্রহ্মবিচারদ্বারা নিজ স্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মার প্রকাশ যাঁহার মধ্যে হয়, তদ্রূপ ব্যক্তির দয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেন।

সাধক পরমাত্মার সহিত আপনার হৃদয়ের যথার্থ যোগ স্থাপন করিতে পারিলে অমরত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আপনাকে অমর বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ সাধক যখন আপনাকে চিরদিনের মত আপনার ইষ্ট-দেবতার চরণে বিক্রয় করিয়া নিত্য আনন্দের অধিকারী হন, তখন তিনি স্পষ্ট দেখিতে পান যে, তাহার সে প্রেম ও সে আনন্দ অনন্তকালব্যাপী, কস্মিন্‌কালে কোন জগতে ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিনি যাঁহার সহবাসে যে আনন্দ ও প্রেম সম্ভোগ করিতেছেন, মৃত্যুর পরে পরলোকে যাইয়াও তিনি তাঁহার নিকট থাকিবেন এবং সেই প্রেমই সম্ভোগ করিবেন। সুতরাং মৃত্যু তাঁহার নিকট প্রকৃত মৃত্যুরূপে অগ্রসর হয় না, অর্থাৎ উহা তাঁহার পক্ষে আর তখন ইহ-পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়মান হয় না। উহা তখন তাঁহার পক্ষে সাপের নির্মোক (খোলস) পরিত্যাগের ন্যায় বোধ হয় মাত্র। ইহাকেই সাধকের অমরজীবন, অনন্তজীবন বা নবজীবন লাভ করা বলে। যে ভাগ্যবান্ সাধক এই অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি আসন্ন মৃত্যু বা দীর্ঘজীবন এতদুভয়কেই সমভাবে দেখেন। যথা—

> ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
> নৈবোদ্বিজতে মরণে জীবনে নাভিনন্দতি ॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পূজিত হইয়াও প্রীত হন না, নিন্দিত হইয়াও কুপিত হন না। তিনি মৃত্যু আসন্ন দেখিয়াও উদ্বিগ্ন হন না এবং দীর্ঘজীবনেও আনন্দ প্রকাশ করেন না।

সংসারসুখাসক্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতানিবন্ধন ধন এবং পুত্র প্রভৃতি সাংসারিক অনিত্য বস্তুসকলকেই প্রকৃত সুখের আকর বিবেচনা করিয়া শান্তিশূন্য হৃদয়ে চিরজীবন তাহাদিগেরই সেবা করিয়া থাকেন।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা সেই সমস্ত ক্ষণবিনাশী বস্তুকে নিতান্ত দুঃখপূর্ণ ও অশান্তিকর জানিয়া সে সকলের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

অধিকন্তু সংসারী ব্যক্তিগণ ভ্রান্ত-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যাহাকে নিতান্ত রসহীন ও কঠোর জীবন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা শান্তিপ্রদ ও ও পরমানন্দপূর্ণ জানিয়া সেই সাধকের জীবনকে প্রাণগত যত্নের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যথা—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥—গীতা ২।৬৯

—অজ্ঞানী প্রাণিসকলের পরব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা রাত্রিতুল্য হয় (অর্থাৎ তাহারা তদ্বিষয়ে কিছুই দেখিতে পায় না), কিন্তু সংযমী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সেই ব্রহ্মনিষ্ঠাতেই জাগ্রত থাকে ; আর যে বিষয়সুখেতে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধি লিপ্ত, তত্ত্বজ্ঞানী মুনিদিগের তাহা রাত্রিতুল্য হয় (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ বিষয়সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না)।

বিষয়-সুখের উল্লেখ করিয়া পরম ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসঙ্কাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ॥—ভাগবত, ৭।৭।৪৫

—এ সমস্ত রাজ্য, সম্পত্তি এবং দেহ সমুদয়ই নশ্বর, এবং বাস্তবিক অনর্থ অথচ অর্থবৎ প্রতিভাত হইতেছে (সুতরাং অতি তুচ্ছ)। এ সমুদয়-দ্বারা পরমানন্দরসের সাগরস্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার কি হইবে?

তিনি আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥—ভাগবত, ৭।৯।৪৫

—দদ্রু প্রভৃতি চর্মরোগসকল হস্তদ্বারা কণ্ডূয়ন করিলে প্রথমতঃ সুখানুভব হইলেও পরিণামে যেপ্রকার দুঃখ অনুভূত হয়, স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য-সুখেরও সেই প্রকার দুঃখে অবসান। কামুক পুরুষেরা

পরিণামে সে সুখে তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া বস্তুতঃ বহুতর দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ধীরব্যক্তি কণ্ডূতির ন্যায় জানিয়া কামাভিলাষ সহ্য করিয়া থাকেন।

বৈষয়িক সুখ সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে সুখও দুঃখমধ্যে পরিগণিত হয়। রামচন্দ্র বলিয়াছেন—

ইয়মস্মিন্ স্থিতোদারা সংসারে পরিপেলবা।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপি নূনং ন শর্মদা॥—যোগবাশিষ্ঠ

—এই সংসারে অতি সুন্দর মহতী যে শ্রী (ঐশ্বর্য) সে কেবল মোহের কারণমাত্র, নতুবা সুখের কারণ কখনই হয় না।

দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—

শোকমোহভয়ক্রোধরাগক্লৈব্যশ্রমাদয়ঃ।
যন্মূলাঃ স্যুর্নৃণাং জহ্যাৎ স্পৃহাং প্রাণার্থয়োর্বুধঃ॥—ভাগবত

—ধন এবং প্রাণ মনুষ্যদিগের শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ, দীনতা এবং শ্রমাদির মূল। পণ্ডিতব্যক্তি এই দুই পদার্থের স্পৃহা পরিত্যাগ করিবেন।

মহামতি বেকন (Bacon) বলিয়াছেন—I connot call riches better than the baggage of virtue. পঞ্চদশীকর্তা লিখিয়াছেন—

অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥—পঞ্চদশী

—প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, অর্থের উপার্জনে নানা ক্লেশ, পরিরক্ষণে নানা দুঃখ, এতদ্ব্যতীত অর্থ নষ্ট হইলে মহাশোক এবং ব্যয় হইয়া গেলেও অত্যন্ত দুঃখ হইয়া থাকে; অতএব যাহার আয়, ব্যয়, স্থিতি, তিনটিতেই সুখ বা শান্তি নাই, সেই ক্লেশকরী অর্থে ধিক্। অতএব—

আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্॥—অষ্টাবক্রসংহিতা

—বিষয়বাসনা হইতেই সকলে দুঃখভোগ করে, অথচ এই গূঢ় উপদেশ কেহই জানে না। যিনি এই উপদেশদ্বারা নির্বৃত্তিলাভ করেন, তিনিই ধন্য।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥—মহাভারত

—কি কামনার পূর্ণতাজনিত পার্থিব সুখ, কি স্বর্গীয় মহৎ সুখ, ইহারা তৃষ্ণাক্ষয়জনিত বিশুদ্ধ সুখের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহে।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের আনন্দ উপভোগ সম্বন্ধে অষ্টাবক্র ঋষি বলিয়াছেন—

আত্মবিশ্রান্তিতৃপ্তেন নিরাশেন গতার্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়তে তৎ কথং কস্য কথ্যতে॥
সুপ্তোঽপি ন সুষুপ্তৌ চ স্বপ্নেঽপি শায়িতো ন চ।
জাগরেঽপি ন জাগর্তি ধীরস্তৃপ্তঃ পদে পদে॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ১৮।১৩ ১৪

যিনি নিয়ত পরমাত্মাতে বিশ্রামপূর্বক তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, যিনি সমুদয় আশা অর্থাৎ ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি কোন বিষয়েই কষ্ট অনুভব করেন না, তিনি অন্তঃকরণমধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি সুষুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও সুপ্ত নহেন, নিদ্রিত থাকিয়াও নিদ্রিত নহেন, জাগরিত থাকিয়াও জাগরিত নহেন, তিনি (নিয়ত পূর্ণ আনন্দ অনুভব করিয়া) কেবল পদে পদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং **"ন হি তৃপ্তেঃ পরং ফলম্"**—তৃপ্তি অপেক্ষা ফল নাই। **শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—**

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥

—ভাগবত, ১১।১৪।১২-১৩

—যিনি কোন বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে সুখ অনুভব করেন, বিষয়ীদিগের সে সুখ কোথায়? কেননা, "আশা বলবতী কষ্টা নৈরাশ্যং পরমং সুখং"—আশাই বলবতী কষ্ট এবং আশাত্যাগই পরম সুখ। সুতরাং যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট, তাঁহার সমুদয় দিকই সুখময়।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা ভীষ্মকে শম্পাক নামক এক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন—

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকম্॥
আকিঞ্চন্যে চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ম্।
নিত্যোদ্বিগ্নো হি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতো যথা॥
নাস্যাগ্নি র্ন চাদিত্যো ন মৃত্যু র্ন চ দস্যবঃ।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরাশিষঃ॥ —মহাভারত

রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা এই উভয়কে তুলাদণ্ডের উভয় দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, অকিঞ্চনতা অপেক্ষা রাজ্যসুখ অনেকাংশে নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ উহাদের মধ্যে এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজা কিংবা ধনবান্ ব্যক্তি সর্বদাই কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন; কিন্তু আশাবিহীন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগনিবন্ধন অগ্নি, সূর্য, দস্যু বা অন্য কোন বস্তু হইতে কিছুমাত্র ভয় বা দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।

মহারাজ রামকৃষ্ণের সাংসারিক সুখের নিতান্ত অপ্রতুলতা ছিল না; কিন্তু যখন তিনি পরমার্থরসের আস্বাদন পাইয়াছিলেন, তখন স্পষ্টাক্ষরে

বলিয়াছিলেন যে, "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।"*

যে ব্যক্তির চরণ পাদুকাবৃত, তাহার নিকট যেমন সমস্ত ভূমিই চর্মাবৃত বোধ হয়; সেই পূর্ণপুরুষদ্বারা মন পরিপূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ সুধারসদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ পরিতৃপ্ত ভূপতির সুখের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সুখের তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

যুবারূপী চ বিদ্যাবান্নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্॥
সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ তমশ্নুতে॥—পঞ্চদশী, ১৪।২১-২২

—যুবাপুরুষ, রূপবান্, বিদ্বান্. নীরোগশরীর, বুদ্ধিমান্ ও বহুসৈন্য-বিশিষ্ট হইয়া বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবী শাসন করতঃ সমুদয় মানুষানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত ভূপতি যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, তত্ত্বজ্ঞানী সতত তাহা উপভোগ করেন।

নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে।
দুঃখমাসীদ্ভাবিনাশাদতিভীরনুবর্ততে॥
নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতস্তদানন্দোঽধিকোঽন্যতঃ।
গন্ধর্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ॥—পঞ্চদশী ১৪।২৬-২৭

---

* সাধকাগ্রগণ্য রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
কে কাঁদে মা তোর ধন বিহনে?
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ রাখবো হৃদি-পদ্মাসনে। ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারীর উপযুক্ত শিষ্য 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধিকারী সাধক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত একটি গান আছে—

পয়সা হ'লে ভাই যদি হরি মেলে,
কণ্ঠ কি কাঁদিত হরি হরি বলে।
সে নয় পয়সার ধন, শ্রীনন্দের নন্দন সচন্দন তুলসী দিলে।

—পূর্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়েরই কামনার অভাববিষয়ক সুখ সমান হইলেও রাজ্যরক্ষার সাধনসঞ্চয়জন্য ও ভবিষ্যদ্বিনাশের ভয়জন্য রাজার দুঃখ হয়; কিন্তু বিবেকীর সে উভয়ই হয় না, অতএব তাঁহার আনন্দকে অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

ন তথা ভাতি পূর্ণেন্দু র্ন পূর্ণঃ ক্ষীরসাগরঃ।

ন লক্ষ্মীবদনং কান্তং স্পৃহাহীনং যথা মনঃ॥—যোগবাশিষ্ঠ

—পূর্ণিমার চন্দ্র তেমন দীপ্তি পায় না, পরিপূর্ণ ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ-লহরী তেমন দীপ্তি পায় না, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ব্যক্তির মুখ তেমন দীপ্তি পায় না, মানবের মন স্পৃহাশূন্য হইলে যেমন দীপ্তি পায়।

ন চ ত্রিভুবনৈশ্বর্যাদ্রকোষাদ্রত্নধারিণঃ।

ফলমাসাদ্যতে চিত্তাৎ যন্মহত্তোপবৃংহিতাৎ॥—যোগবাশিষ্ঠ

—মহাচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির নিজ চিত্ত হইতে যে ফল লাভ হয়, অপর ব্যক্তির রত্নপূর্ণ ভাণ্ডার এবং ত্রিভুবনের ঐশ্বর্যলাভেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

কল্পান্তপবনা বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবা।

তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ॥

—কল্পান্ত-পবন বহিতে থাকুক, কিংবা সপ্তসমুদ্র একত্ব প্রাপ্ত হউক, অথবা দ্বাদশ সূর্য জগৎকে সন্তপ্ত করুক, মনোহীন নিঃস্পৃহ ব্যক্তির কিছুতেই ক্ষতিবোধ নাই।

সংসারের সুখমাত্রেই দুঃখমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারের কোন পদার্থেই নাই; কিন্তু সাধকগণ যে পথে গমন করেন, তথায় নিরবচ্ছিন্ন সুখই বর্তমান। অধিক কি, সাধকগণ যে মুক্তি লাভের জন্য সর্বদা যত্ন করেন, দুঃখের আত্যন্তিক অভাব হওয়াই তাহার স্বরূপ। যথা—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।—ন্যায়দর্শন, ১।১।২২

—দুঃখের যে অত্যন্ত বিমোচন, তাহাই অপবর্গ বা মুক্তি।* সুতরাং ব্রহ্মানন্দ মুক্তির নামান্তর মাত্র, বিষয়সুখের সহিত কোনও অংশে তাহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব সকলেই ব্রহ্মানন্দলাভের জন্য স্ব স্ব অধিকার অনুযায়ী যথাসাধ্য সাধনভজন করিয়া হৃদয়ে সুখের চিরবসন্ত আনয়ন ও মানব-জীবনের পূর্ণত্ব সংসাধন করিবেন।

ব্রহ্ম-নির্বাণ

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার ব্রহ্মভাব প্রকাশ করাই সর্বপ্রকার সাধনার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মনির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় সমাধি। অন্যান্যগুলি তাহার উত্তেজক কারণ মাত্র।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ
নির্বাণং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।

গুণ অর্থাৎ প্রকৃতিদেবী যখন পুরুষত্যাগিনী হন, অর্থাৎ যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত হন না, পুরুষকে বা চিৎস্বরূপ আত্মাকে কোন প্রকার আত্মবিকৃতি দেখাইতে পারেন না, পুরুষ যখন নির্গুণ হন, অর্থাৎ যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্মচৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত হয় না, আত্মা যখন চৈতন্যমাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, আত্মার যখন বিকারদর্শন হয় না, তখন ঐরূপ নির্বিকার হওয়াকেই নির্বাণমুক্তি বলে।

* মুক্তি তৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও তাহার সাধন মৎপ্রণীত "প্রেমিকগুরু" গ্রন্থের জীবন্মুক্ত-খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

বিলীন ভাবকেই নির্বাণ বলা যাইতে পারে। এতন্মতে ব্রহ্মনির্বাণ অনাস্বাদিত মধুবৎ অর্থাৎ যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন মধুর আস্বাদ একটা 'কি জানি কি', নির্বাণ বা নিবিয়া যাওয়াও তাই। ফলকথা, যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যে আত্মা অজর, অমর, তাহা নিবিয়া যাইবে কি প্রকারে? ঈশ্বর আনন্দঘন। জীব প্রকৃতির বন্ধন ছেদন করিয়া গুণাদিবিবর্জিত ও কেবল হইয়া যখন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, দুঃখ তখন আর তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। তখন তিনি এক অভূতপূর্ব শান্তি ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি সকলেতেই ঈশ্বরের অবস্থান দেখিয়া সকলেরই মঙ্গলসাধনে রত হন। তখন তাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং মোহরূপ হৃদয়গ্রন্থিসকল ভাঙ্গিয়া যায়। ক্রমে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মে এত মগ্ন হইয়া যান যে তাঁহার পার্থিব সুখ-দুঃখ, পার্থিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব ভাব নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। যথা—

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥—গীতা,৫।২৪-২৬

—যে ব্যক্তি আত্মাতেই সুখী এবং যে ব্যক্তি আত্মারাম হইয়া আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আর যাঁহার আত্মাতেই দৃষ্টি, সেই যোগী ব্যক্তিই উক্ত প্রকারে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা নিষ্পাপ, যাঁহাদিগের সংশয়চ্ছেদ হইয়াছে, যাঁহাদিগের চিত্ত বশীভূত এবং যাঁহারা ভূতসকলের হিতার্থে রত, সেই মহাত্মারাই ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষলাভ করেন। কাম-ক্রোধ হইতে বিমুক্ত জ্ঞানযোগী সন্ন্যাসিগণের জীবিতাবস্থা

ও মৃতাবস্থা উভয়াবস্থাতেই ব্রহ্মনির্বাণতা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ তাঁহারা জীবন্মুক্তরূপে বিরাজ করেন।

কর্মসন্ন্যাসযোগেই এতাদৃশ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকালে সাধক জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভ করেন। যথা—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥—গীতা, ৬।২৮

—যোগী ব্যক্তি বিগতপাপ হইয়া আত্মাকে সর্বদা যোগযুক্ত রাখিলে অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আত্যন্তিক সুখ ভোগ করেন।

ব্রহ্মের সহিত আত্মার সংস্পর্শ হয়, একথা আর্যভূমি ভারতের মুনিঋষি ব্যতীত আর কে আমাদিগকে প্রথম শুনাইতে পারিয়াছিল? এই ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখে ও আনন্দে আমাদের সমুদয় পার্থিব ভাব বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাই আমাদের প্রকৃত ব্রহ্মনির্বাণ। কিরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন? ভগবান্ বলিয়াছেন—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা, ১৮।৫১-৫৩

—যিনি বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৈর্যদ্বারা সেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করেন; যিনি শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ ও রাগ-দ্বেষ দূর করেন; যিনি নির্জনসেবী ও লঘুভোজী হইয়া কায়, মন ও বাক্য সংযত করিয়া নিত্য বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক ধ্যানযোগপর হন; যিনি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগপূর্বক মমতাশূন্য ও শান্ত হন; তিনিই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে নির্বাণ অর্থে যদি নিবিয়া যাওয়া হয়, তবে কে নিবিয়া যাইবে? বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যানাশ এব চ।
যদ্ যৎ সম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থাপরিবর্জনম্।
অনাস্থৈব হি নির্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ॥—যোগবাশিষ্ঠ

—যে যে বস্তু সৎরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ, তাহাই মনোনাশ এবং অবিদ্যানাশ। এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ, তাহাই নির্বাণ।

অতএব অবিদ্যাজনিত মন নিবিয়া যাওয়াকেই নির্বাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য "মণিরত্নমালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ।

কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয়?—মনের চঞ্চলতা। যথা—

মনোলয়াত্মিকা মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করি।

—কামাখ্যাতন্ত্র, ৮ম পটল

—হে শঙ্করি! যে অবস্থায় মনের লয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া জানিও।

মুক্তির চরম অবস্থাকেই ব্রহ্মনির্বাণ বলা যাইতে পারে। যখন সাধক শান্ত্যাদিযুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে অবলোকন করেন, তখন সেই ব্যক্তি পরমজ্যোতিঃস্বরূপে অদ্বৈতব্রহ্মরূপে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন। ইহাকেই ব্রহ্মনির্বাণ বলে।

ইষ্টে নিশ্চলসম্বন্ধো নির্বাণমুক্তিরীদৃশী।—কামাখ্যাতন্ত্র, ৮ম পটল

যখন সাধক ব্রহ্মসত্তাসমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সত্তা পর্যন্ত হারাইয়া বসেন, অর্থাৎ ক্রমে যখন তাঁহার—"নির্বাণস্তু মনোলয়ঃ"—বুদ্ধি, মন ব্রহ্মধ্যানে একেবারে লয়-বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সে অবস্থাকে নির্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তি বলে।

মুক্তিসম্বন্ধে গৌতম লিখিয়াছেন—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরাপায়ে
তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।—ন্যায়দর্শন ১।১।২

—দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অববর্জন বা অভাবরূপ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নামই অপবর্গ বা মুক্তি। অপিচ—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।—ন্যায়দর্শন, ১।১।২২

—দুঃখের যে অত্যন্ত বিমোচন, তাহাই অপবর্গ বা মুক্তি।

কপিলদেব বলিয়াছেন—

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।—সাংখ্যদর্শন ৬।৭০

—সুখ-দুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্মসকল যখন আত্মাতে লিপ্ত না হয়, তখনই আত্মার মুক্তাবস্থা। অপিচ—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।—সাংখ্যদর্শন ১।১

—ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) যে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহারই নাম আত্যন্তিক পুরুষার্থ বা মুক্তি।

বৌদ্ধধর্মপ্রচারক রাজপুত্র গৌতম জীবাত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে এক কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার কার্যতঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) উভয়ই স্বীকার করা হইয়াছে। তিনি জরা, মরণ ও পীড়াজনিত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্বাণ সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার নির্বাণের অর্থ রিজ ডেভিডস্ (Mrs. Rhys Davids) তাঁহার Buddhism গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—
"Nirvana is therefore the same thing as a sinless, calm state of mind; and if translated at all, may best perhaps be rendered 'holiness'—holiness that is in the Buddhist sense, perfect peace, goodness and wisdom."

বুদ্ধবংশলেখক নির্বাণ শব্দে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, উহা মনুষ্যের সত্তাবিলোপ বা একেবারে মহাবিনাশ নহে, কেবলমাত্র

ভ্রম, ঘৃণা এবং তৃষ্ণা এই তিনটির আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শব্দে কথিত হয়।

এ সম্বন্ধে প্রফেসার মোক্ষমূলার এইরূপ বলেন—**If we look in the Dhammapada at every passage where Nirvana is mentioned, there is not one which would require that its meaning should be annihilation, while most, if not all, would become perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvana that signification.**

এ পর্যন্ত মুক্তিসম্বন্ধে যে কয়েকটি শাস্ত্রের মত সংক্ষেপে সংগৃহীত হইল, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মুক্তিসম্বন্ধে ভাবপক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাবপক্ষে সকলেরই প্রায় ঐকমত্য আছে। এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তিগণ চিরকালই "মুক্তি"-রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যাঁহারা আনন্দের প্রস্রবণস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের শরণাগত না হইয়া অন্য উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ঘৃত পরিত্যাগ করিয়া এরণ্ডতৈল-ভক্ষণের ন্যায় তাঁহারা বহু সাধনদ্বারা নিজ নিজ আত্মাতে নিদ্রার ন্যায় এক প্রকার সুখদুঃখবর্জিত অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগরূপ যথার্থ মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই। অতএব যাঁহারা এই পৃথিবীতে যথার্থ সুখ চান, তাঁহারা সুখস্বরূপ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করুন। নতুবা সংসারে সুখ অন্বেষণ করা কেবল মরীচিকায় জল অন্বেষণ করার ন্যায় বৃথা। যেন সর্বদা স্মরণ থাকে, ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন "হে ভারত! সর্বাবস্থাতেই তুমি তাঁহারই (পরমেশ্বরের) শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।" যথা—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ওঁ মহাশান্তি ওম্

তৃতীয় খণ্ড

সাধনকাণ্ড

ব্রহ্ম-রূপ

গীত

টোড়ী—কাওয়ালী

রতন-আসনে বসে গৌরী-শঙ্কর।
হের সহস্রারে—রজত-ভূধরে যেন উদিত শশধর॥
শিবের শিরোপরে করে গঙ্গা কল-কল,
বাসন্তী ব'সেছে বামে এলায়ে কুন্তল ;
কিবা শোভা এক ভালে, ধবক্-ধবক্ বহ্নি জ্বলে,
আর ভালে শোভে অর্দ্ধ সুধাংশু সুন্দর॥
একের কর্ণেতে দোলে কৃষ্ণধুতুরার দল,
অপরের কর্ণশোভা কনক-কুণ্ডল ;
ঈশান বিষাণ করে, পলকে প্রলয় করে,
জীবে অন্ন দান করে অভয়ার উভয় কর॥
কঞ্চুলি পরেছে উমা জ্বলিছে মণি মাণিক্য,
বাঘাম্বরের বাঘছাল কটি-সনে নাহি ঐক্য ;
দীন নলিনী কয়, পদশোভা ভিন্ন নয়,
যে পদ ভাবনা কেন, ছোঁবে না যম কিঙ্কর॥

৺কামাখ্যাধাম, ৩।১।১৩১৩

জ্ঞানীগুরু

তৃতীয় খণ্ড—সাধনকাণ্ড

সাধনার প্রয়োজন

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ও যোগযুক্ত না হইলে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। অযোগী পুরুষের যে জ্ঞান, তাহা ভ্রান্তজ্ঞান, সে জ্ঞানে ভ্রম আছে। কেননা অযোগী পুরুষ মায়াপাশে বদ্ধ, মায়াপাশ ছিন্ন করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানালোক দর্শন করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মায়াপাশ ছিন্ন করিবার উপায় যোগ। যোগী হইলেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন যে জ্ঞান তাহা প্রলাপমাত্র। প্রাণ ও চিত্তকে বশীভূত করিতে না পারিলে কখনই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না,যেহেতু চিত্ত সততই চঞ্চল, চিত্ত স্থির না হইলে জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণ-সংরোধ। কুম্ভকদ্বারা প্রাণবায়ু স্থিরীকৃত হইলে চিত্ত আপনা-আপনি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত স্থির হইলেই প্রকৃত জ্ঞানোদয় হয়। কুম্ভককালে প্রাণবায়ু সুষুম্নানাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে করিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেই স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হয়, কারণ চিত্ত সর্বদাই প্রাণের অনুসরণ করে। যথা—

দুগ্ধাম্বুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ
তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতৌ হি।
যতো মরুত্তত্র মনঃপ্রবৃত্তিঃ
যতো মনস্তত্র মরুৎপ্রবৃত্তিঃ ॥

—হঠযোগপ্রদীপিকা, ৪।২৪

—দুগ্ধ ও জল যেরূপ একত্র মিলিত হইয়া থাকে, প্রাণ ও মন সেইরূপ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে। যে চক্রে বায়ুর প্রবৃত্তি হয়, সেই চক্রে মনের প্রবৃত্তি হয় এবং যে চক্রে মনের প্রবৃত্তি হয়, সেই চক্রে বায়ুরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

অবিনাভাবিনী নিত্যং জন্তুনাং প্রাণচেতসী।
কুসুমামোদবন্মিশ্রে তিলতৈলে ইবাস্থিতে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—জন্তুগণের প্রাণ ও চিত্ত, ইহারা অবিনাভাব-সম্বন্ধশালী (অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে একটি যেখানে থাকে, অন্যটিও সেইখানে থাকে, যেখানে একটির অভাব হয়, সেইখানে অন্যটিরও অভাব হয়। যেরূপ পুষ্প ও গন্ধ এবং তিল ও তৈল, ইহাদিগের একের বিদ্যমানতাতেই উভয়ের বিদ্যমানতা এবং একের অভাবেই উভয়ের অভাব, সেইরূপ মন ও প্রাণের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে।

সুতরাং প্রাণবায়ু স্থির হইলেই চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। এজন্য বলা হইয়াছে যে, যোগ ব্যতীত দিব্যজ্ঞান লাভ হয় না। যথা—

যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং যোগো মধ্যেকচিত্ততা।—আদিত্যপুরাণ

—যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগদ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। যোগী পুরুষের ঈদৃশ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য।

নামান্তরে এই জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যথা—

যোগাগ্নির্দহতি ক্ষিপ্রমশেষং পাপপঞ্জরম্।
প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানান্নির্বাণমৃচ্ছতি॥

—কূর্মপুরাণ

যোগরূপ অগ্নি অশেষ পাপপঞ্জর দগ্ধ করে এবং যোগদ্বারা দিব্যজ্ঞান জন্মে। যদি বল, যোগব্যতীত দিব্যজ্ঞান না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে এই বলা যায়, সমাধি অভ্যাসের পরিপাক হইলেই অন্তঃকরণের রাগদ্বেষাদি দোষের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইলেই সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে আত্মদর্শন হইলে দর্শনমাত্রেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হইয়া যায়; সুতরাং তখন দিব্যজ্ঞান আপনা-আপনি প্রকাশিত হইতে থাকে। এজন্য ইহাই স্বীকার্য যে, যোগসিদ্ধ না হইলে কখনই দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয় না এবং মোক্ষলাভও হয় না।

কেবল শাস্ত্রপাঠে বা উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ বর্তমান কালের শিক্ষায় তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাক্, নীতিজ্ঞান পর্যন্ত বিকশিত হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার অভিমান বহন করেন মাত্র, শিক্ষার প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি 'পিতামাতা পরমগুরু' এই কথা ভুলিয়া মূর্খ পিতাকে বন্ধু-সমাজে বাটীর চাকর বলিতে লজ্জা বোধ করে না, অশৌচান্তে যাহারা চুল-দাড়ি কামাইতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, ছাগের ন্যায় সম্পর্কবিচার না করিয়া যাহারা পরস্ত্রীগমন করে, ভিক্ষুককে একমুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে যাহারা অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা দেয়, নিরন্ন কৃষককে আপন স্বার্থের জন্য যাহারা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত করায়, বিচারাসনে বসিয়া যাহারা পদোন্নতির জন্য নির্দোষীকে দণ্ডিত করে, ভোগসুখকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়া যাহারা আপন বিধবা মাতার, কন্যার বা ভগিনীর পুরুষান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করে; যাহারা পশুর ন্যায় রিপুর অধীন

হইয়া কার্য করে ; যাহারা পরকাল, জন্মান্তর, কর্মফল, দেবতা, ঈশ্বর ও গুরু স্বীকার করে না ; হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরদোষচর্চা ও মিথ্যাবাক্য যাহাদের নিত্য কার্য ; তাহাদিগকে মনুষ্যগর্ভজাত গর্দভ ভিন্ন কে শিক্ষিত শব্দে অভিহিত করিবে ? যে কবি—

"সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকমাসবমিব ।
অমেধ্যক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
মহামোহান্ধানাং কিমপি রমণীয়ং ন ভবতি ?"

এই কথা* ভুলিয়া যে রমণীর কুচযুগ্ম ও অধরমধুর বর্ণনায় ব্যস্ত, তাহাকে মোহান্ধ ব্যতীত কে পণ্ডিত স্বীকার করিবে ? অস্পৃশ্য কুক্কুট-মাংস ব্যতীত যাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় না, পিতামাতার পদে যাহার মস্তক অবনত হয় না, পেন্সন না পাইলে যাহার প্রস্রাবের জল ব্যবহারের সুবিধা হয় না, চিকেন ব্রথ ভিন্ন গব্যঘৃতে যাহার তৃপ্তি হয় না, বিলাতী-ঘাস ভিন্ন যুঁই-বেলিতে যাহার বাগানের শোভা হয় না, পরপুরুষের সহিত নিজ কুলবধূকে আমোদ করিতে না দেখিলে যাহার স্ফূর্তি হয় না, পূর্বপুরুষগণকে অসভ্য কৃষক না বলিলে যাহার বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না, তাহার শিক্ষাকে কোন্ নির্লজ্জ শিক্ষাশব্দে অভিহিত করিবে ?

জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, স্বধর্মানুরাগী, বিনয়ী, সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তি অসভ্য ও অশিক্ষিত হইলেও আমরা তাহাকে উচ্চকণ্ঠে "পণ্ডিত" বলিয়া ঘোষণা করিব। যে ন্যায়কচ্‌কচি বা বিদ্যাবাগীশ শাস্ত্রের মর্যাদা ভুলিয়া স্বার্থের জন্য অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা

---

* অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে, স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে ।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥—অবধূত গীতা

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন—
জৈসী পুতলী কাঠকী পুতলী মাসময় নারী ।
অস্থিনাড়ীমলমূত্রময়, যত্নিত নিন্দিত ভারী ॥

প্রদান করে, তাহার পাণ্ডিত্যে ধিক্! যাহারা দেশের নেতা সাজিয়া দেশোন্নতির ব্যপদেশে দরিদ্র স্বদেশবাসীর শোণিতসম অর্থ শোষণ করতঃ নিজেদের পান-ভোজন ও স্ব স্ব মত-সমর্থনের জন্য লাঠালাঠি করে, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষায় শত ধিক্। পূর্বে শিক্ষার গুণে জ্ঞান স্বতঃই প্রকাশ পাইত, কিন্তু এখন সে আশা সুদূরপরাহত! সমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী, সুতরাং সাধনাদ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। শত শত তর্কশাস্ত্র ও ব্যাকরণাদি অনুশীলনপূর্বক মনুষ্যগণ শাস্ত্রজালে পতিত হইয়া বিমোহিত হইয়া থাকে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কবিকৃতি ব্যতীত কোথাও জ্ঞানের দীপ্তি দেখা যায় না। নতুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ঐ পত্নীবিয়োগবিধুর যুবক "কেমন করিয়া বলিব কেমন সেই মুখখানি"র জন্য উদ্ভ্রান্তভাবে পাগলের ন্যায় প্রলাপ বকিবেন কেন? তাঁহার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশীয় ব্যক্তির নিকট এই ঘোর দুর্দিনে তাঁহার স্বদেশবাসী কত উচ্চ আশা করিতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি স্বার্থপর মরণকান্না কাঁদিয়া বিষয়ান্ধ লোকের নিকট "বাহবা" পাইতেছেন। প্রকৃত প্রেম স্বর্গীয় জিনিস বটে, কিন্তু স্থূলদেহের বিনাশে সে প্রেম বিনষ্ট হয় না। স্থূলদেহের জন্য শোকপ্রকাশ, কি জগৎবাসীকে সীমাবদ্ধ প্রেমের পরিচয় দেওয়া, প্রেমিকের লক্ষণ নহে,* ব্যবহারিক বিদ্যাবুদ্ধির অভিমান মাত্র। আমরা ঐরূপ উদ্‌ভ্রান্ত যুবকের হা-হুতাশ দেখিয়া অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত শূন্যোচ্ছ্বাস বলিয়াই মনে করি। বিদ্যাতে যদি তাঁহার প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইত, তাহা হইলে তিনি সেই মুখখানি উপলক্ষ্য

---

* যে প্রেমিক যুবক পূর্বে "একপ্রাণ দুইজনকে দেওয়া যায় না" বলিয়া গভীর গবেষণা'র সহিত স্বদেশবাসীকে প্রেমের তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, এখন দেখিতে পাই তিনিই প্রাণের ব্যবসা করিতেছেন। যিনি যে বিষয়ে মুখে যত স্পর্ধা করেন, কার্যকালে তাঁহাকেই তত সর্বপশ্চাতে দেখিতে পাই। ইহা আমাদের জাতীয় স্বভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে শক্তিশালী নেতা স্বদেশবাসীকে ভিক্ষা ছাড়িয়া লাঠি ধরিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, শুনিতে পাই, লাঠি দেখিলে সর্বাগ্রে তিনিই মুক্তকচ্ছ হইয়া পিঠ-টান দেন।

করিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে মর্মব্যথা না জানাইয়া শিহ্লনাচার্যের সহিত একযোগে বলিতেন—

ক তদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধরমধু ক্বায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
কালাপাঃ কোমলাস্তে ক চ মদনধনুর্ভঙ্গুরো ভ্রূবিলাসঃ।
ইত্থং খট্বাঙ্গকোটৌ প্রকটিতরদনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরা
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালাং কপালম্॥

একদা শ্মশানে একটি বংশদণ্ডের অগ্রভাগে স্ত্রীলোকের একটি মাংস-চর্মবিহীনা মস্তক-কঙ্কাল দেখিয়া শিহ্লনাচার্যের মনে হইল,—মস্তক-কঙ্কালের মধ্যে এই যে দন্তাস্থিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, আর উহার গলরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মুখরন্ধ্র হইতে নিঃসরণকালে বায়ুর যে শব্দ শুনা যাইতেছে, এতদুভয়ের দ্বারা জ্ঞান হইতেছে, যেন কপাল ঘোর কামান্ধ মানবগণকে বলিয়া দিতেছে "মূঢ় মানব! এই শ্মশানের নিকট দাঁড়াইয়া একবার এই মুখখানির প্রতি চাহিয়া দেখ, আর যাহার জন্য তুমি অন্ধ হইয়া কতই না পশ্বাচার করিয়াছ, সেই স্ত্রীর মুখখানিও স্মরণ কর। এই দেখ তাহার পরিণাম! সেই মুখারবিন্দই বা কোথায়, আর কোথায় বা ঈদৃশ অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধার ন্যায় সমাদরে পান করিতে, সেই অধরমধু কোথায়? সেই মধুমাখা সুমধুর আলাপই বা কোথায় এবং মদনধনু-বিলাসের ন্যায় ভ্রূভঙ্গীর বিলাসই বা কোথায়? এখন তাহারই এরূপ পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া চর্মাবৃত এই কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়া কত আদর-গৌরব করিয়াছ, কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিয়াছ। অন্ধ! সে সময় যদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া অত আহ্লাদিত হইতে না, স্ত্রীমুখে তত সম্মান দান করিতে না।"

তাই বলিতেছি, সাধন ব্যতীত কখনও দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে না। মহাযোগী মহেশ্বর বলিয়াছেন—

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

—জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র

—বেদচতুষ্টয় ও সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণ তাহার নবনীত-স্বরূপ সারভাগ পান করিয়াছেন। আর তাহার অসারভাগ যে তক্র (ঘোল), পণ্ডিতগণ তাহাই পান করিতেছেন।

যোগসাধন ব্যতীত কোনরূপেই মোক্ষলাভের হেতুভূত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা লাভ হয় না। যোগহীন জ্ঞান কেবল অজ্ঞান মাত্র অর্থাৎ তাহা সাংসারিক জ্ঞান, তদ্দ্বারা কেবল সুখদুঃখবোধ হইয়া থাকে, সে জ্ঞানে মুক্তিপথে যাইবার সাহায্য পাওয়া যায় না। এজন্য যোগহীন জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। যথা—

যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীশ্বরি।
যোগোঽপি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি॥

—যোগবীজ, ১৮

ইহার ভাবার্থ এই যে, যোগহীন জ্ঞান জ্ঞান নহে এবং জ্ঞানহীন যোগও যোগ নহে। যোগযুক্ত জ্ঞানই জ্ঞান এবং জ্ঞানযুক্ত যোগই যোগ।

সর্বে বদন্তি খড়্গেন জয়ো ভবতি তর্হি কঃ।
বিনা যুদ্ধেন বীর্যেণ কথং জয়মবাপ্নুয়াৎ॥
তথা যোগেন রহিতং জ্ঞানং মোক্ষায় নো ভবেৎ।
জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাচন।—যোগবীজ

—সকলেই বলিয়া থাকেন যে, খড়্গো জয়লাভ হয়, কিন্তু খড়্গধারণ ও পুরুষকার ব্যতীত কোন যুদ্ধে জয়লাভ যেরূপ অসম্ভব, যোগরহিত

জ্ঞানেও সেইরূপ মোক্ষ অসম্ভব এবং জ্ঞানরহিত যোগও সেইরূপ সিদ্ধিপ্রদ হয় না।

তস্মাদত্র বরারোহে তয়োর্ভেদো ন বিদ্যতে।—যোগবীজ

—অতএব হে মহেশানি, এতদুভয়ের অর্থাৎ যোগ ও জ্ঞানমধ্যে কোনরূপ ভেদ দেখা যায় না।

সুতরাং যোগসিদ্ধি হইলেই জ্ঞানসিদ্ধি হয় এবং জ্ঞানসিদ্ধি হইলেই যোগসিদ্ধি হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ।—পাতঞ্জলদর্শন ৩।৫

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস ব্যাপারকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারিলে সংযম নামক প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। এই সংযম হইতে প্রজ্ঞা নামক আলোক বা উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। ঐ জ্যোতিঃ বা প্রজ্ঞাকে জ্ঞান বলে। প্রজ্ঞা বলিলে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহা সাধারণ জ্ঞানের মত জ্ঞান নহে, তাহা যোগযুক্ত জ্ঞান। কেবল শুষ্কজ্ঞানে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাই অর্জুনকে যোগী হইতে অনুরোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥—গীতা, ৬।৪৬

—যখন যোগী তপস্বী হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী হইতেও শ্রেষ্ঠ, তখন হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

কেননা—

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।—গীতা, ৬।৪৫

—যোগদ্বারা যতমান নিষ্পাপ ব্যক্তি যে অনেক জন্মসঞ্চিত যোগ-প্রভাবে সম্যক্ সিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে?

অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণো হি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥—যোগশাস্ত্র

—যেমন ককারাদি বর্ণমালা অভ্যাসদ্বারা সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়।

অতএব তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যই যোগের প্রয়োজন। যদি বল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কি হইবে—সমস্ত ক্লেশের শান্তি হইবে। অর্থাৎ আমি আর মায়াজালে বদ্ধ নহি, আমি মুক্তপুরুষ, তাহাই জানা যাইবে।

ক্লেশ কি?—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।—পাতঞ্জলদর্শন, ২।৩

—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার মনোবেগের নাম ক্লেশ।

অবিদ্যা কি? "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"—অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, অশুচিকে শুচিজ্ঞান, দুঃখকে সুখজ্ঞান এবং অনাত্মপদার্থের উপর আত্মজ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা।* **অস্মিতা** কি? "দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা"—দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টারূপে আত্মার সহিত দর্শনশক্তিরূপা বুদ্ধিতত্ত্বের পরস্পর ঐক্য বা তদাত্ম্যাধ্যাস হইয়া যাওয়ার নাম অস্মিতা। **রাগ** কি? "সুখানুশয়ী রাগঃ" —সুখভোগের ইচ্ছার নাম রাগ। **দ্বেষ** কি? "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ" —দুঃখের প্রতি অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণার নাম দ্বেষ। **অভিনিবেশ** কি? "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ"—পুনঃ পুনঃ ভোগজন্য যে আরূঢ় বৃত্তি, তাহার নাম অভিনিবেশ। অর্থাৎ মায়াবিমোহিতাবস্থায় যে কিছু কার্যের উদ্ভাবন হয়, তৎসমুদয়ই ক্লেশ।

---

* পাঠক! শেক্সপীয়রের সেই ডাকিনীর কথা মনে পড়ে?—"Fair is foul and foul is fair," অবিদ্যাও সেই ডাকিনীবিশেষ!

যে পর্যন্ত না জীবের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, সে পর্যন্ত কষ্টের পরিসীমা থাকে না। সে অপরিসীম কষ্টের সীমা না থাকিলেও প্রকার-গত সীমা আছে, সে সীমার নাম ত্রিতাপ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপের নাম ক্লেশ। এরূপ ক্লেশ কেন হয়? —না প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পরাধ্যাসজন্য।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয়ের যে পরস্পরা-ধ্যাস, তাহার উপশম, বিলয় বা নিবৃত্তি কিসে হয়, যেহেতু সে অধ্যাসের নিবৃত্তি হইলে আত্মা বা পুরুষ স্বীয়ভাবে অধিষ্ঠিত হইবেন। স্বীয় ভাব কি?—না মুক্তভাব, নিষ্ক্রিয়ভাব, যে ভাবে দ্রষ্টা-দৃশ্য বা ভোক্তা-ভোগ্য-ভাব নাই। আত্মা যাহাতে স্বীয়ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাহারই উপায় স্থির করিতে হইবে।

যদি বল যে, তবে কি আত্মা এখন স্বীয় ভাবে অবস্থিত নহেন? তিনি অবশ্য এখন আপনভাবে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু সে আপনভাবের প্রকাশ নাই, তৎপরিবর্তে দ্রষ্টা-দৃশ্য বা ভোক্তা-ভোগ্য-ভাবের প্রকাশ হইতেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি এখন আপনি চিন্ময় পুরুষের ভোগ্যা হইয়া সেই চিন্ময় পুরুষকে আপনার ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পুরুষের ভোগেচ্ছা না থাকিলেও লৌহ ও চুম্বকের মত অনিচ্ছায় ক্রিয়াশক্তির উদ্রেক হইয়াছে; সুতরাং আত্মা এখন পুরুষরূপে ভোক্তা এবং প্রকৃতি জগৎরূপে তাঁহার ভোগ্যা হইয়াছেন। সেই ভোক্তা-ভোগ্যভাবের অপসারণ বা নিবৃত্তি করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে সেই নিবৃত্তির উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। সে নিবৃত্তির উপায় যোগ। যোগাভ্যাস ব্যতীত প্রকৃতির মায়াজাল জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। যে পুরুষ যোগী, সে পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতিদেবী আপন মায়াজাল বিস্তার করেন না, বরং লজ্জাবনতমুখী হইয়া পলায়ন করেন, অর্থাৎ সেই পুরুষের প্রকৃতি লয়

প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হইলে সেই পুরুষ আর পুরুষপদবাচ্য হন না, তখন কেবল আত্মা নামে সংস্বরূপে অবস্থিতি করেন। এই সংস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবার জন্ম যোগসাধনার প্রয়োজন।

জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশম্।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তথা সঙ্গবিবর্জিতঃ॥

—শিবসংহিতা, ৫।২২৭

সর্বদা নিঃসঙ্গ হইয়া যোগীপুরুষ জ্ঞানের কারণ যোগাভ্যাস করিবে, তাহা হইলে আর অজ্ঞানোৎপত্তি হইবে না।

সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিত॥
এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে।

—শিবসংহিতা, ৫।২২৮-২২৯

—বিষয়-বাসনা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযতকরতঃ নিঃসঙ্গ হইয়া নির্লিপ্তভাবে সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থিতি করিবে। এইরূপ অভ্যাস নিয়ত করিলে সাধকের জ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশিত হয়।

মায়াবাদ

এই জগতের সৃজন-পালনাদিতে পরমেশ্বরের যে শক্তি নিযুক্ত আছে, তাহারই নাম প্রকৃতি বা মায়া। যথা—

সা মায়া পালিনীশক্তিঃ সৃষ্টি সংহারকারিণী।

—জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ॥

—ভাগবত, ৩।৫।২৫

—হে মহাভাগ! ভগবান্ আপনার যে সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত শক্তি-দ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, তাহার নাম মায়া।

জ্ঞানকাণ্ডে মায়ার বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। বেদান্ত এই মায়াকে অসৎ বলিয়াছেন। কেননা শৈবদর্শনে মায়া শব্দের এইরূপ অর্থ ধৃত হইয়াছে—

মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্বং জগৎ, সৃষ্টৌ ব্যক্তিং যাতীতি মায়া।—সর্বদর্শনসংগ্রহঃ

—প্রলয়ে শক্ত্যাত্মাদ্বারা সমুদয় জগৎ ইহাতে মিলিত বা উপসংহৃত হয় এবং সৃষ্টিকালে আবার সমস্তই ব্যক্তীভূত হইয়া থাকে। এই অর্থে মায়া—'মা' শব্দে উপসংহরণ এবং 'য়া' শব্দে ব্যক্তীকরণ।

অতএব মহত্তত্ত্ব যে মায়া, তাহা অবিদ্যার ব্যক্তীকরণ এবং উপসংহরণ শক্তিমাত্র। সেই সগুণা শক্তিরূপে তাহা আবার নিজে নির্গুণ মূল-প্রকৃতির বিকার, এজন্য তাহা নির্গুণের পরিণাম। যাহা পরিণামী, তাহাই অসৎ। অবিদ্যাসমুৎপন্ন জীব-জগতের নিয়তই অবস্থান্তর ঘটিতেছে। অবিদ্যার পরিণামের সীমা ও শেষ নাই। জগৎ নিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে। এই অবস্থাভেদ ও পরিণাম সমস্তই অনিত্য—নিত্যবস্তুর অনিত্য অবস্থা। যাহা অবিদ্যা-স্বভাব, কখন একরূপে নাই, সততই অবিদ্যমান, তাহাই অসৎ অবিদ্যা। কেবল একমাত্র ব্রহ্মই নির্বিকার ও সৎ। সেই নির্বিকার সৎবস্তু হইতে প্রভেদ রাখিবার নিমিত্ত পরিণামী অবিদ্যা ও মায়াকে অসৎ বলা হইয়াছে।

ত্রিগুণময়ী মায়া নিজ প্রকৃতিবশতঃ অসৎ। এই প্রকৃতি দ্বিবিধ—মায়ার আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি কি? অহংকারপূর্ণ অবিদ্যা জীবে সততই কামনার উৎপত্তি করিতেছে। এই কামনা হইতে জীবের কামনাময় সূক্ষ্মশরীরের সৃষ্টি। এই সূক্ষ্মশরীরই জীবের প্রকৃত

দেহ। এই দেহভূত প্রাণই দেহী ও জীবাত্মা। জীবের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ সেই কামনাময় দেহেরই ভোগশরীর মাত্র। এই কামনাময় দেহই জীবাত্মার পিঞ্জরস্বরূপ। সেই কামনাময় ঘোর লোভী কংসের কারাগারে জীবাত্মা বসুদেবরূপ সাত্ত্বিক বিবেকজ্ঞান ও দেবশক্তি ভক্তিমতী দেবকীসহ বন্ধনযুক্ত হইয়া বাস করেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

—গীতা, ৩।৩৮-৩৯

—ধূমদ্বারা যেমন বহ্নি, মলিনতাদ্বারা যেমন দর্পণ এবং জরায়ুদ্বারা যেমন গর্ভ আবৃত থাকে, কামনাদ্বারা সেইরূপ বিবেকজ্ঞান আবৃত থাকে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিগণের নিত্যবৈরী অতি দুষ্পূরণীয় ও অনলতুল্য সন্তাপকর কামনাদ্বারাই জ্ঞানীর জ্ঞান আচ্ছন্ন আছে।

কামনাময় মায়ার আবরণশক্তির প্রভাব এইরূপ। এই আবরণ কামনার ধর্মাধর্মজনিত হয়। তজ্জন্য জীবের সাত্ত্বিকাংশ মলিন হইয়া যায়, তাই অবিদ্যা সত্ত্বগুণকে মালিন্যময় করে। সেই সত্ত্বরূপী বাসুদেব মালিন্যময় কামনাদ্বারা আচ্ছন্ন থাকেন। এই কামনা অতি চঞ্চলা, তাহার স্থিরতা কিছুই নাই। মায়া এই কামনাযুক্ত হইয়া সততই অনিত্যভাবাপন্ন হইয়া আছে। এই অসৎ কামনাময়ী অবিদ্যার অধীন হইয়া জীব কর্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া থাকে। নিজ কর্তৃত্বে পূর্ণ হইয়া সে আর ঈশ্বরকর্তৃত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। যেখানে জীব কর্তা, সেখানে ঈশ্বর কে? এই কর্তৃত্বাভিমান জীবের অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সে জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ইহাই মায়ার ঘোর আবরণশক্তি।

এই আবরণশক্তিহেতু মায়ার যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত হয়, তাহা হইতেই মায়ার বিক্ষেপশক্তির উৎপত্তি। জীবের অভিমান যে মিথ্যা-দৃষ্টির সঞ্চার করে, সেই দৃষ্টিহেতু জগতের সমস্ত মায়িক রূপ ও ব্যবহার সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। এই রূপসকল কি বাস্তবিক সত্য, না জীবের কল্পনা মাত্র? বেদান্তী বলেন, জীবের মিথ্যা-দৃষ্টি মায়া-জগতের যে রূপসকলকে বিক্ষেপ করে, তাহাই মায়ার বিক্ষেপশক্তির পরিচায়ক। নহিলে জগৎ অনন্ত ব্রহ্মময়।

জীবদৃষ্টির সহিত ব্রহ্মপদার্থের এক বিশেষপ্রকার সম্বন্ধজনিত জগতের এই বিরাট রূপের কল্পনা। মানুষের চক্ষুর সহিত জগতের সম্বন্ধ এরূপ যে, তাহা বিশেষ রূপবিশিষ্ট বোধ হয়। পেচকের চক্ষে পেচকী যেমন সুন্দরী, নরের কাছে নারীও তেমন সুন্দরী। অতএব রূপ কেবল দৃষ্টির বিশেষপ্রকার সম্বন্ধনিবন্ধন সঞ্জাত হয়। সুতরাং জীবের মানস-দৃষ্টি এবং স্থূল-দৃষ্টি বশতঃ জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ। মায়ার অর্থই রূপ পরিণাম। এ জগৎ তবে ব্রহ্মের সৃষ্ট রূপ নহে, ইহা জীবের কল্পিত রূপ। এই কল্পনাই মায়া ও মিথ্যাদৃষ্টি। এই মায়া কেবল ব্যবহারিক জ্ঞানে বাস্তবিক, নহিলে ইহা পরমার্থজ্ঞানে অতি তুচ্ছ এবং যুক্তিতে অনির্বচনীয়। শারীরকভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলেন "যেমন প্রাকৃতজীব যতক্ষণ না প্রবুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নসমুদয়কে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করে, ব্রহ্মাত্মবোধের পূর্বপর্যন্ত লৌকিক ব্যবহারসকলকে তদ্রূপ জানিবে।"—(বেদান্তদর্শন, ২।১।১৪) বাস্তবিক, মানুষ যখন নিদ্রা-কালে স্বপ্ন দেখে, তখন সে কখনই সেই স্বপ্নকে মিথ্যা জ্ঞান করে না; নিদ্রাভঙ্গ হইলে তবে সেই স্বপ্নের অলীকত্ব প্রতিপাদিত হয়। সেইরূপ মায়ার অলীকত্ব সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিবার একমাত্র উপায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যোগপ্রকরণদ্বারা যে সম্যক্ দর্শন জন্মে, সেই দৃষ্টিপ্রভাবে মায়ার অলীকতা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয়। তদ্দ্বারা

জীব মায়ারূপ কারাগার হইতে দেবভক্তি দেবকীর সহিত শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবরূপ বিবেকজ্ঞানকে সমুদ্ধার করিয়া জীবাত্মাকে অনায়াসে মুক্ত করিতে পারেন। নহিলে তাঁহাকে কামনাসম্ভূত সূক্ষ্মশরীর লইয়া বহু বহু জন্ম-জন্মান্তরে এই ঘোর দুঃখময় সংসারে যাতায়াত করিতে হয়, কিছুতেই তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। ইহাকেই কামনাজাত পাপ-পুণ্য কর্মের বন্ধকত্ব বলে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

> ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
> মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥
> দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
> মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

—গীতা, ৭।১৩-১৪

—এই যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব, এই ত্রিবিধ ভাবে সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়াছে। সুতরাং আমি যে ত্রিবিধভাবে অস্পৃষ্ট এবং ইহাদের নিয়ন্তাহেতু নির্বিকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। আমার এই মায়া (ঈশ্বরশক্তি) অলৌকিক গুণময়ী (সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা) এবং দুস্তরা। কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিদ্বারা আমারই শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই আমার এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

এই মায়া কিরূপে অতিক্রম করিতে পারা যায়? জীবের কামনাসম্ভূত সূক্ষ্মশরীরের বিনাশসাধন করাই মায়া কাটাইবার প্রধান উপায়। কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে শরীরের ক্ষয় নাই। কর্মফলে অভিলাষী না হইয়া তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেই কামনা পরিত্যক্ত হয়। শুদ্ধ কর্তব্যজ্ঞানে সকল কার্যে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম-ফলাভিলাষ পরিত্যক্ত হয়। প্রবৃত্তিকে এইরূপে নিবৃত্তিপথে আনিয়া নিষ্কাম কর্মের সাধনা করিতে পারিলে তবে কামনার লয়সাধন করা

যায়; তবে কামনাময় শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। কামনাময় শরীরের লয়সাধন করিয়াও যদি অহঙ্কার (আমিত্বজ্ঞান) কিয়ৎ পরিমাণেও থাকে, তাহাও ঈশ্বরার্পিতচিত্তে সংহার করিতে হইবে। অহঙ্কার তিরোহিত হইলে ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ লব্ধ হইলে তদুপাধিস্বরূপ কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র থাকে। এই সাত্ত্বিকদেহের লয়সাধনার্থ নিস্ত্রৈগুণ্যের যোগসাধনা চাই। নিস্ত্রৈগুণ্য সাধিত হইলেই বিদেহ হইয়া মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, জীব বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগত-ভেদসম্পন্ন; সুতরাং সাধনার হাপরে গলাইয়া ঐ বাসনা-কামনার খাদ দূরীভূত করিতে হইবে। মায়াই বাসনা-কামনার খাদ। অতএব যে কোন সাধন-প্রণালী দ্বারা এই মায়াকে প্রসন্না বা বশীভূতা করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। দেবী পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব বলিয়াছেন—

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধনকারণম্।
তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসাযুজ্যমশ্নুতে॥
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥
মহদাদ্যণুপর্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধানমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ৪র্থ উল্লাস

—দেবি! লোকে তোমার সাধনায় ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে, এজন্য আমি তোমারই উপাসনার কথা বলিতেছি। তুমিই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকৃতি। হে শিবে! তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,

তুমি জগতের জননী। হে ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব হইতে পরমাণু পর্যন্ত এবং সমস্ত চরাচর সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে। এই নিখিল জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ। তুমি সমুদয় বিদ্যার আদিভূত এবং আমাদের জন্মভূমি। তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহ জানিতে পারে না।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী হইতে সুরথ-উপাখ্যান পাঠ করিলেই এ বিষয়ের সম্যক্ মীমাংসা হইবে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশসম্ভূত সুরথ অবনীমণ্ডলের রাজা হইয়াছিলেন, কিছুদিন পরে কোলাবিধ্বংসী (শূকরখাদক যবন) ভূপতিগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। অতি প্রবল দণ্ডধারী রাজা হইয়াও দৈববশে সুরথ পরাস্ত হইলেন। বিশ্বাস-ঘাতক দুষ্ট অমাত্যগণও শত্রুর সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজধানীর কোষাগার ও সৈন্যসামন্তাদি হস্তগত করিল। অনন্তর রাজা সুরথ অপহৃতাধিপত্য হইয়া মৃগয়াব্যপদেশে একাকী অশ্বারোহণ করিয়া অতি দুর্গম বনে গমন করিলেন।

কিন্তু হায়, বনে গিয়াও তিনি মন বাঁধিতে পারিলেন না। স্বজন-বান্ধব কেহই তাঁহার অনুগমন করিল না। যাহারা তাঁহার বিপদে অন্যকে আশ্রয় করিল, যাহারা একটি মুখের কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতেও বিমুখ হইল, যাহারা তাঁহাকে উৎসবান্তে বাসি ফুলের ন্যায় দূরে ফেলিতে কষ্টবোধ করিল না, তাহাদের মায়ায়, তাহাদের বিরহে তিনি ব্যথিত, জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

একদা একটি বৈশ্যজাতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনাকে শোকাকুল এবং দুশ্চিন্তাপরায়ণ মনে হইতেছে কেন?"

সেই বৈশ্য ভূপতির প্রণয়ভাষিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণপূর্বক বিনয়াবনত হইয়া কহিলেন, "আমি সমাধি নামক বৈশ্য। ধনসম্পন্ন বংশে আমার উৎপত্তি হইয়াছিল। অসাধুবৃত্ত পুত্রকলত্রগণ ধনলোভে লুব্ধ হইয়া আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে। পুত্র-ভার্যাগণ আমার ধন গ্রহণ করিলে আমি কলত্র ও পুত্রবিহীন এবং হিতকারী বন্ধুবর্গদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ধনার্থ দুঃখিত হইয়া বনোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছি। আমি এখন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুত্র-কলত্র ও বন্ধুগণের কুশলাকুশল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতেছি না। আমার পুত্রাদি এখন কুশলে কি অকুশলে কালাতিপাত করিতেছে, তাহারা কি সদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন কিংবা অসদ্‌বৃত্তিপরায়ণ হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না।" রাজা বলিলেন—

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥

—আপনি ধনলুব্ধ যে পুত্র-ভার্যাদি দ্বারা বিতাড়িত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আপনার মন স্নেহপ্রবণ হইতেছে কেন?

বৈশ্য উত্তর করিলেন—

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্‌গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতি-স্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেষ্বেব মে মনঃ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥

—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা অতীব সত্য। কিন্তু আমি কি করিব, আমার চিত্ত কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতেছে না। যাহারা

ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ, পতিভক্তি ও স্বজনপ্রেম পরিত্যাগকরতঃ আমাকে নিরাকৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমার অন্তঃকরণ প্রেমপ্রবণ হইতেছে। হে মহামতে রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমিও বুঝিতেছি; তথাপি কেন যে সেই গুণরহিত বন্ধুবর্গের প্রতি আমার চিত্ত প্রেমাসক্ত হইতেছে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাদের নিমিত্ত আমার নিঃশ্বাস নির্গত হইতেছে এবং চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে, সেই প্রীতিরহিত বন্ধুগণের প্রতি আমার চিত্ত কিছুতেই মমতাবিহীন হইতেছে না; অতএব আমি কি করিব?

তখন সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ সুরথ ও সমাধি বৈশ্য উভয়ে মিলিত হইয়া মেধসমুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে যথানিয়মে মুনির পাদবন্দনাদি করিয়া উপবেশন করিলে রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! মূর্খলোকে যে প্রকার বিষয়াসক্তিদ্বারা পরিমুগ্ধ হয়, আমি জ্ঞানবান্ হইয়াও সেই প্রকার রাজ্যে এবং নিখিল স্বাম্যমাত্যাদি রাজ্যাঙ্গবিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট হইতেছি, ইহার কারণ কি? আবার দেখুন, আমার ন্যায় এই বৈশ্য পুত্রদ্বারা নিরাকৃত, স্ত্রী এবং ভৃত্যগণ দ্বারা পরিত্যক্ত এবং স্বজনদ্বারা সংত্যক্ত হইয়াও তাহাদের সম্বন্ধে অতিশয় প্রেমবান্ হইতেছে। এই প্রকারে আমি ও এই বৈশ্য বিষয়ের দোষ প্রত্যক্ষ করিয়াও মমতাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখভোগী হইতেছি। যাহারা আমাদিগকে পায়ের কণ্টকের ন্যায় দূর করিয়া দিয়াছে, যাহারা আমাদের শত্রুর বশানুগ হইয়া আমাদের প্রতি নিতান্ত বাম হইয়াছে ও নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে—আমরা জ্ঞানহীন নহি, আমাদের জ্ঞান আছে, সকলেই বুঝিতে পারিতেছি—তথাপি তাহাদের জন্য কেন এ মরম-ক্রন্দন—এ আকুল যাতনা? হে মহাভাগ! যাহারা বিবেকরহিত, তাহাদিগেরই মূঢ়তা সম্ভবে; আমরা জ্ঞানী হইয়াও কি হেতু মূঢ় হইতেছি, আপনি ইহার কারণ বলুন।"

মহামুনি মেধস বলিলেন, "হে মহাভাগ! এ সংসারে সমস্ত বিষয়ই পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে এবং প্রাণিমাত্রেরই বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে; তাই বলিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানী বলা যায় না। দেখ, সকল প্রাণীই বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু যাহা দিবাপ্রকাশ বস্তু, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে সংসারাসক্ত প্রাণী চিরকালই অন্ধ থাকে, তাহারা কদাপি সেই তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার আত্মরাজ্যে বিচরণশীল মুনিগণ রাত্রিতে অর্থাৎ বাহ্যরাজ্যে অন্ধ অর্থাৎ বহির্ভাব কিছুই তাঁহাদের অনুভূত হয় না। আর যাঁহারা আত্মরাজ্যে উপনীত হইয়া লব্ধজ্ঞান হইয়াছেন, তাঁহারা দিনরাত্রি—আন্তররাজ্য ও বহিঃরাজ্য এই উভয়ে তুল্যরূপে এক আত্মসত্তারই উপলব্ধি করেন, সুতরাং তাঁহারা সর্বত্রই তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। তুমি বলিতেছ, তোমার জ্ঞান আছে। হায় রাজন্! উহা কি প্রকৃত জ্ঞান? উহা বিষয়গত জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে কোন প্রকারেই বিবেকের উদয় হইতে পারে না। তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়-রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্যমাত্রই হইয়া থাকে, এ কথা সত্য; কেবল মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। অর্থাৎ আহার-বিহারাদি বাহ্যবিষয়ে মনুষ্য আর পশুপক্ষ্যাদি সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। তথাপি ঐ দেখ, জ্ঞানসত্ত্বেও পক্ষীরা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ আদরসহকারে শাবকগণের চঞ্চুতে তণ্ডুলাদির কণা নিক্ষেপ করিতেছে। হে মনুজব্যাঘ্র সুরথ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না, মনুষ্যগণ চরমকালে প্রত্যুপকারলুব্ধ হইয়া পুত্রাদির প্রতি স্নেহপ্রবণ হইয়া তাহাদিগকে লালনপালন করিয়া থাকে? কিন্তু পশু, পক্ষী প্রভৃতির সন্তান বৎসরে বৎসরেই জন্মিয়া থাকে, প্রত্যেকবারেই তাহারা জনক-জননীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া কে কোথায় চলিয়া যায়,

পশুপক্ষিগণ নিত্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, কোন লাভের প্রত্যাশা নাই—তথাপি কেন এই ত্যাগ-স্বীকার, কেন এই আত্মদান, জান কি?

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সাংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

ঋষি বলিলেন, "তুমি মনে করিতে পার যে, পুত্র-দারাদি দ্বারা প্রকৃত সুখ সম্পাদিত হয় না, তবে কেন মনুষ্যগণ অনর্থহেতু মোহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিপাতিত হয়? বাস্তবিক পক্ষে কেহই স্বাধীন-ভাবে আত্ম-অহিত কামনা করে না, কিন্তু যিনি জগতের স্থিতি সম্পাদন করিতেছেন, সেই মহামায়া-প্রভাবেই প্রাণিগণ মমতা-আবর্তপরিপূরিত মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়। সর্বদা আত্মহিতানুসন্ধায়ী মানবকেও যে মহামায়া এতাদৃশী দুর্গতি প্রদান করেন, তাহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। কারণ, অন্যের কথা তোমাকে আর কি বলিব, যিনি জগৎপতি হরি, তিনিও এই মহামায়ার দ্বারা বশীকৃত রহিয়াছেন। ইনি সর্বেন্দ্রিয়শক্তির নিয়ন্ত্রী, ইঁহার ঐশ্বর্য অচিন্ত্য। ইনি জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্বক সম্মুগ্ধ করিয়া থাকেন। ইঁহার দ্বারাই চরাচর সমস্ত জগৎ প্রসূত হয়, ইনি প্রসন্না হইলেই লোকের মুক্তিদাত্রী হন। এই

মহামায়া যেমন সংসার-গর্ত্তে নিপাতকর্ত্রী, তেমন ইনিই আবার তত্ত্বজ্ঞান-স্বরূপা, ইঁহার শক্তিদ্বারাই মানব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, সুতরাং ইনি মুক্তির হেতু, নিত্যবস্তু। ইঁহার দ্বারা সংসারবন্ধন হইয়া থাকে, ইনি ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বরী।"

মহামুনি মেধসের কথা শুনিয়া অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভগবন্! কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥

—ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিয়া কীর্তিত করিলেন, তিনি কে? তিনি কেমন করিয়া উৎপন্না হইলেন? ইঁহার কার্যই বা কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! তিনি কাদৃক্স্বভাববিশিষ্টা অর্থাৎ নিত্যা বা অনিত্যা? তাঁহার স্বরূপ কি? এই সমস্তই আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ভক্তিকারুণ্যকণ্ঠে মেধস বলিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥

—তিনি নিত্য, জগন্মূর্তি, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও তাঁহার আমাদের ন্যায় উৎপত্ত্যাদি কিছুই নাই, তথাপি লোকে তাঁহার এক প্রকার উৎপত্ত্যাদি কীর্ত্তন করে, তাহা তুমি আমার নিকট বহু প্রকারে শ্রবণ কর। তিনি রূপ, তিনি রস, তিনি গন্ধ, তিান স্পর্শ, তিনি শব্দ। তিনি প্রকৃতি, তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিভাবিনী, তাঁহাকে প্রসন্না করিলেই মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

মহামুনি মেধস রাজা সুরথের নিকট দেবীর উৎপত্ত্যাদি কীর্তন করিয়া পরিশেষে বলিলেন—

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥
ব্যাপ্তস্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্॥

—"এই দেবীদ্বারাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইতেছে, ইনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ইঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে ইনি তুষ্টা হইয়া জ্ঞান ও সম্পৎ প্রদান করেন। হে নৃপতে! এই মহাকালীকর্তৃক অনন্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত আছে; ইনি মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাদিকেও আত্মসাৎ করেন এবং খণ্ড প্রলয়েও ইনি সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। ইনি সৃষ্টি-সময়ে সমস্ত বিষয় সৃষ্টি করেন, আবার স্থিতিকালে প্রাণিদিগকে পালন করেন; কিন্তু ইঁহার কখনই উৎপত্তি হয় না। ইনি নিত্যা। লোকের অভ্যুদয়সময়ে ইনি বৃদ্ধিপ্রদা লক্ষ্মী, আবার অভাবের সময়ে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশ করিয়া থাকেন। ইঁহাকে স্তব করিয়া পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিলে বিত্ত-পুত্রাদি দান ও ধর্মে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।"

এতত্তে কথিতং ভূপ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবম্প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্॥
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

ঋষি কহিলেন, "হে ভূপ! এই আমি দেবীমাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। সেই দেবী এই প্রকার প্রভাবসম্পন্না, তাঁহার দ্বারাই এই সমস্ত বিধৃত আছে। এই ভগবতী বিষ্ণুমায়া প্রসন্না হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে। এই দেবী তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য সমস্ত বিবেকিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। হে মহারাজ! তোমরা এই দেবীকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর, কারণ ইঁহাকে আরাধনা করিতে পারিলেই ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

এই সুরথ-উপাখ্যানে মহামায়া ও তাঁহার আরাধনার কারণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র মহামায়ার আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্না করিতে পারিলে যে মুক্তির হেতুভূত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা বোধহয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের জ্ঞানকে সেই বিষয়রূপিণী মহামায়া সংসারস্থিতিকারণে বিধ্বস্ত করিয়া মোহাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিত করেন। সে জ্ঞান সেই জ্ঞানাতীতা মহামায়া বলদ্বারা আকর্ষণ ও হরণ করিয়া জীবকে সম্মুগ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপ করিয়াই তিনি এ জগৎ স্থির রাখিয়াছেন। নতুবা কে কাহার, কাহার জন্য কি? যদি মায়াবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, যদি মোহের চশমা খুলিয়া পড়ে, তখন কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার স্ত্রী? সেই মহামায়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের হাট বসাইয়া জীবগণকে প্রলুব্ধ করিয়া এ ভবের হাটে খেলা করিতেছেন। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের

প্রলোভনে জীব ছুটিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহাদের আকর্ষণে জীবসমুদয় উন্মত্ত। জীবের সাধ্য নাই যে, এ নেশা—এ আকুল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। তবে যদি সেই বিষয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই পরমা বিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী প্রসন্না হন, তবেই জীব এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। তাই মহাযোগী মহাদেব বলিয়াছেন, "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।" অর্থাৎ শক্তি-সাধনা ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্যজনক ও বৃথা। তাই সাধক কবি গাহিয়াছেন, "ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়, ভক্ত হ'তে হ'লে আগে শাক্ত হ'তে হয়।" শক্তি-সাধনা সেই মহামায়ার সাধনা। তাঁহার সাধনা করিয়া মানুষ প্রকৃতির যে সুখলালসা, তাহাই উপভোগ করে এবং মোহাবর্ত্ত বিনষ্ট করে। প্রকৃতির রস উপভোগ করিয়া মায়ার বাঁধন, আকর্ষণের আকুলতা বিনষ্ট করিয়া, শক্তিসাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারেন। আমিও এই খণ্ডে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা বিন্ধ্যাদ্রিনিলয়া মহামায়ার যোগোক্ত সাধনোপায় বিবৃত করিব। এই দেবী সর্বস্বরূপিণী এবং সমস্ত জগৎ ইঁহার স্বরূপ, অতএব আমি সর্বরূপা এই পরমেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করি।

সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরি॥

কুলকুণ্ডলিনী সাধন

এতক্ষণ যে আদ্যাশক্তি মহামায়ার বিষয় আলোচনা করিলাম, সেই দেবী জীবের আধারকমলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যথা—

মূলাধারে চ যা শক্তিগুরুবক্ত্রেণ লভ্যতে ;
সা শক্তির্মোক্ষদা নিত্যা বিদ্যাতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥

—তন্ত্রবচন

—এই স্থূল শরীরাভ্যন্তরে আধারকমলে যে শক্তিরূপা প্রকৃতি অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁহার তত্ত্ব গুরুমুখে শিক্ষা করিবে। সেই শক্তিরূপা প্রকৃতিদেবীই মুক্তিদাত্রী, এজন্য এই শক্তিতত্ত্বকে বিদ্যাতত্ত্ব বলে।

বিদ্যা অর্থে জ্ঞান, জ্ঞানোদয় হইলেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞান নাশ হইলেই মুক্তিলাভ হয়।

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধারপদ্ম রহিয়াছে।* তন্মধ্যে তেজোময় রক্তবর্ণ ক্লীং বীজরূপ কন্দর্পনামক স্থিরতর বায়ুর বসতি। তাহার মধ্যে ঠিক ব্রহ্মনাড়ীর মুখে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ আছেন। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ রক্তবর্ণ এবং কোটী সূর্যের ন্যায় তেজোময়। তাঁহার গাত্রে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া, সর্পরূপে আত্মপুচ্ছ মুখে দিয়া সুষুম্নাছিদ্রকে অবরোধ করিয়া কুলকুণ্ডলিনীশক্তি অবস্থান করিতেছেন। এই কুলকুণ্ডলিনীই নিত্যানন্দস্বরূপা পরমাপ্রকৃতি। তাঁহার দুই মুখ, তিনি বিদ্যুল্লতাকার ও অতি সূক্ষ্ম, দেখিতে অর্ধ-ওঙ্কারের প্রতিকৃতিতুল্য। দেব-দানব, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনীশক্তি বিরাজিত আছেন। পদ্মোদরে যেমন ভ্রমরের অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে তিনি অবস্থান করেন। ঐ কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে কোমল মূলাধারে চিৎশক্তি বিরাজিত আছেন। উঁহার গতি অতিশয় দুর্লক্ষ্য। সদ্গুরুর কৃপা ও সাধকের সাধনবল ব্যতীত কুলকুণ্ডলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

*মূলাধারপদ্ম ও কুলকুণ্ডলিনীর বিবরণ মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থে বিশদ করিয়া লেখা আছে।

এই কুলকুণ্ডলিনী সর্ববেদময়ী, সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বতত্ত্বময়ী এবং পঞ্চাশবর্ণ-রূপিণী। ইনি অবস্থাভেদে ত্রিগুণা, ত্রিরেখা, ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী, ত্রিদোষা ও প্রণবস্বরূপা। যথা—

সর্ববেদময়ী দেবী সর্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ॥
ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।
ত্রিলোকা সা ত্রিমূর্তিঃ সা ত্রিরেখা সা বিশিষ্যতে॥

কুলকুণ্ডলিনী যোগিগণের হৃদয়ে তত্ত্বরূপিণী এবং সর্বজীবের মূলাধারে বিদ্যুদাকারে বিরাজিতা। যথা—

যোগিনাং হৃদয়াম্বুজে নৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥

এই স্থূলদেহাত্মক বীজপঞ্চক কুণ্ডলিনীর অন্তর্গত মূলাধারে প্রাণপঞ্চক-রূপে সর্বদা প্রস্ফুরিত হইতেছে। তদুত্তম জীবনীশক্তি কুণ্ডলিনীদেহে অবস্থিতি করিয়া জীবনদ্বারা জীবরূপে, বোধদ্বারা বুদ্ধিরূপে এবং অহংভাব-দ্বারা অহংকাররূপে অবস্থিতি করেন। তিনিই অপানতা প্রাপ্ত হইয়া সতত অধোমুখে প্রবাহিত, নাভিমধ্যে থাকিয়া সমান ও উপরিভাগে থাকিয়া উদান নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে না পারিলে জীব মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

কুলকুণ্ডলিনীই চৈতন্যরূপা, সর্বগা ও বিশ্বরূপিণী মহামায়া। এই কুণ্ডলিনীই নির্বাণকারিণী আদ্যাশক্তি মহাকালী। সকল সময় সকল অবস্থাতেই আমরা শক্তির শক্তি অনুভব করিয়া থাকি। তিনি আমাদের সর্বাঙ্গে জড়িত। আমাদের যে দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, সঞ্জীবনীশক্তি, বাক্যোচ্চারণশক্তি এবং অঙ্গসঞ্চালনশক্তি—সমস্ত সেই আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। তিনি সর্বতেজোরূপিণী, সর্বপ্রকাশকারিণী, সূক্ষ্মরূপগামিনী, স্থূলসূক্ষ্মরূপিণী, সর্বভূতাধারস্বরূপিণী

এবং মূলাধারবিহারিণী। কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রচণ্ড স্বর্ণবর্ণ তেজঃস্বরূপে দীপ্তিমতী এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের প্রসূতি ব্রহ্মশক্তি। এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্বশরীরস্থ চক্রে চক্রে পরিভ্রমণ করেন। এই শক্তিই আমাদের জীবনীশক্তি।

প্রকৃতিরূপা কুলকুণ্ডলিনীশক্তি চতুরবস্থাপন্ন হইয়া চিন্ময়পুরুষের ভোগ্যা হইয়া সেই চিন্ময়পুরুষকে ভোক্তা করিয়া লইয়াছেন। চতুরবস্থা যথা—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।

—পাতঞ্জলদর্শন

—প্রকৃতির গুণসকলের চারিপ্রকার অবস্থা আছে, যথা—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ।

বিশেষাবস্থা—স্থূলতত্ত্বের নাম বিশেষাবস্থা। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় এই পনেরটি তত্ত্ব বিশেষাবস্থা। **অবিশেষাবস্থা**—সূক্ষ্মতত্ত্বের নাম অবিশেষাবস্থা। পঞ্চতন্মাত্র ও মন বা অন্তঃকরণ এই ছয়টি তত্ত্ব অবিশেষ অবস্থা। **লিঙ্গাবস্থা**—অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব এই দুইটি তত্ত্ব লিঙ্গাবস্থা। **অলিঙ্গাবস্থা**—মূল প্রকৃতি মাত্র, এই একটি তত্ত্ব অলিঙ্গাবস্থা। সমুদয়ে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের চারি প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে।

অলিঙ্গাবস্থা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়াই অন্যান্য অবস্থা উৎপত্তি করে। স্ত্রী-অণু যেমন পুং-অণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে পরিণামপ্রাপ্ত এবং ক্রমবিবর্তিত হইয়া স্থূল প্রকৃতিতে পরিণত হয়। ইহাই প্রকৃতির চতুরবস্থা। জড়বিজ্ঞানের মতে জড়-পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ যে প্রকারে জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, মূল প্রকৃতিও তদ্রূপ পুরুষ-সংযোগে ক্ষোভিত হইয়া পরিণামে বিকার

ও বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক! স্মরণ রাখিবেন এই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মা প্রকৃতি আর স্থূলা প্রকৃতি পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥—গীতা,৭।৪-৫

—আমার মায়ারূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্টা); এতদ্ভিন্ন আমার আর একটি জীবস্বরূপ পরা (উৎকৃষ্ট চেতনাময়ী) প্রকৃতি আছে, উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, আমি এই পরা-প্রকৃতির কথাই আন্দোলন করিতেছি। এই পরা-প্রকৃতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্তনের পথে অপরা-প্রকৃতি হন। সেই মূল বা পরাপ্রকৃতি মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নিত্যা। তিনি জগন্মূর্তি এবং সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি প্রসন্না হইলে মনুষ্যদিগকে মুক্তির জন্য বর দান করিয়া থাকেন। তিনি বিদ্যা, সনাতনী ও সকলের ঈশ্বরী এবং মুক্তি ও বন্ধনের হেতুভূতা। যদি কেহ বলেন, একই প্রকৃতি বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইলেন কি প্রকারে? তাহার উত্তর এই যে, একই সুন্দরী রমণী যেমন প্রিয়জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে, তেমনি মহাশক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে মুক্তি ও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকেন।

অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্॥
—সূতসংহিতা

—অতএব সংসারনাশের নিমিত্ত সেই সাক্ষিমাত্র, সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদিপরিবর্জিত, আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে।

পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা।
সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগদ্‌ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনি ॥—স্কন্দপুরাণ

—চিদাত্মাতে এই জগতের ভ্রান্তিজ্ঞান হয়, তদ্বিষয়ে সেই সচ্চিদানন্দ-রূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠানস্বরূপা জানিবে।

এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
সর্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
একং সর্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ॥
পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্ ॥
অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্ ॥
শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জিতম্।
আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্ ॥—কূর্মপুরাণ

—হে বিপ্রগণ! দেবীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ কর্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্তমধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্বত্রগামী নিত্যকূটস্থ চৈতন্যস্বরূপা, কেবল যোগিগণই তাঁহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। প্রকৃতিপরিলীন অনন্ত-মঙ্গলস্বরূপা দেবীর সেই পরাৎপর তত্ত্ব ও পরমপদ যোগিগণই নিজ হৃদয়কমলমধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। হে মহর্ষিবৃন্দ! দেবীর সেই অতীব নির্মল, সতত বিশুদ্ধ, সর্বদীনতাদিদোষবর্জিত, নির্গুণ, নিরঞ্জন, কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয়, পরমধাম একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া থাকেন।

নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ ॥—দেবীভাগবত

—হে মুনিগণ ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদী মনীষিগণ সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে সংসারাসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণভাব, আর বাসনাপরিবর্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণভাব সমাশ্রয়পূর্বক আরাধনা করিয়া থাকেন।

চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী।—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

—চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক, অতএব তিনি একমাত্র চিদানন্দস্বরূপা।

এইখানে পাঠককে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদান্তী বলিয়াছেন, মায়া মিথ্যা, কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেই মায়া কল্পিত হইয়া থাকে। কাজেই অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্ সত্তার প্রতীতি হয় না। তবে এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানভূত সত্তারূপ ব্রহ্মের উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আকারে মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্মোপাসনাস্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া, যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাবপ্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার আরাধনা করিলেও পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে। ফলকথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া, কেবল মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু মায়ার আশ্রয়ত্ব নাই, তিনি ব্রহ্মেরই আশ্রিতা। তাই তান্ত্রিকের মহাশক্তি—"শবরূপ মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা।" শবরূপ মহাদেবই নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্ম, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মশক্তি ক্রিয়াশীলা। এই মহাকালী শিবের উপর অবস্থিতি করিয়াই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়,—"রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।" রাধা পরাপ্রকৃতি। নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, তাই শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম মদনমোহনের উপাসনা করিতে হইবে। রাধা পরিত্যাগ করিলে আর মদনমোহন হয় না। সরাধা কৃষ্ণচন্দ্রই মদনমোহন। অতএব মদনমোহন বলিলে প্রকৃতি-পুরুষরূপী সগুণ ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে।

পরব্রহ্ম ও মহামায়ার অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—

পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা॥

—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সূর্যের কিরণমালা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রভৃতি স্বভাব-শক্তি, সেইরূপ সেই পরাৎপরা পরমাশক্তি শিব-পরব্রহ্মের স্বভাব-রূপ শক্তি।

স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে।
পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কলা॥

—যেমন কোন লোক নিজ পদদ্বারা নিজ মস্তকের ছায়া লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে প্রতি পদক্ষেপেই মস্তক-ছায়ার বিদ্যমানতা থাকে না, তদ্রূপ এই বিন্দুসম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে; অর্থাৎ পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না।

চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিৎ নির্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা॥
সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥

—হে দ্বিজোত্তমগণ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অনুপ্রবিষ্টা যে সদ্রূপা সদানন্দময়ী সংসার-উচ্ছেদকারিণী কল্পনাদিবিরহিতা স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তি, সেই পরমা দেবীই পরমশিবরূপিণী।

অতএব মূলাধারনিবাসিনী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিই সেই পরশিবরূপিণী। এই শক্তিকে আয়ত্ত করাই যোগসাধনের উদ্দেশ্য।

এই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ। কিন্তু কুণ্ডলিনীশক্তি ব্রহ্মদ্বার রোধকরতঃ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন; তাহাতেই জীবাত্মা অবিদ্যার বশতাপন্ন, রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া অহংভাবাপন্ন হইয়াছেন এবং অজ্ঞান-মায়াচ্ছন্ন হইয়া সুখদুঃখাদি ভ্রান্তিজ্ঞানে কর্মফল ভোগ করিতেছেন। এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা না হইলে কোন প্রকারেই জ্ঞান উৎপন্ন হইবার নহে। যথা—

মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্র-যন্ত্রার্চনাদিকম্॥
জাগর্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্র-যন্ত্রার্চনাদিকম্॥

—গৌতমীয়তন্ত্র

—মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীশক্তি যে পর্যন্ত জাগরিতা না হইবেন, সে পর্যন্ত মন্ত্রজপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল। যদি সাধকের বহু পুণ্যপ্রভাবে সেই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন, তবে মন্ত্রজপাদির ফলও সিদ্ধি হইবে।

মূলাধারপদ্মে অবস্থিত কুলকুলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য সাধনভজন যোগাদি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে। যোগানুষ্ঠান-দ্বারা তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিতে পারিলেই মানবজীবনের পূর্ণত্ব। মূলাধারপদ্ম হইতে কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিয়া শিরঃস্থিত সহস্রদলপদ্মে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলে ব্রহ্মযোগ এবং জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ হইয়া প্রকৃত যোগ সাধিত হয়। আমি তাহার কয়েকটি উপায় এই খণ্ডে প্রকাশ করিব।

সর্বপ্রকার সাধনপ্রণালীর মধ্যে যোগোক্ত ও তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালী শ্রেষ্ঠ। যোগসাধনের সহজ উপায় তন্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।* যোগোক্ত সাধনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব প্রকৃতি-পুরুষযোগ সাধন করিতে হইলে অগ্রে যোগাঙ্গ ও অন্যান্য বিষয় জানা আবশ্যক। সুতরাং প্রথমে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিখিয়া, পরে প্রকৃত যোগের বিষয় বিবৃত করিব। প্রাথমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত না হইয়া কেহ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার অধিকারী হইতে পারে?

ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ মূলাধারে কুণ্ডলিনীর চিন্তা ও তাঁহার স্তব পাঠ করিলে, নিত্যচিন্তনের ফলস্বরূপ ঐ শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কুলকুণ্ডলিনীশক্তির স্তব, যথা—

ওঁ নমস্তে দেবদেবশি যোগীশপ্রাণবল্লভে।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ! স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতে॥
প্রসুপ্তভুজগাকারে সর্বদা কারণ-প্রিয়ে।
কামকলান্বিতে দেবি! মমাভীষ্টং কুরুষ্ব চ॥
অসারে ঘোরসংসারে ভবরোগাৎ মহেশ্বরি।
সর্বদা রক্ষ মাং দেবি! জন্মসংসাররূপকাৎ॥—যোগসার

মানুষের দেহমধ্যে সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান আছে, কেবল শক্তি বশ করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করিতে পারা যায় না বলিয়াই তাহা গুপ্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে। কোন শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে হইলে, তাহার উপর অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিন্তাপ্রবাহ প্রবাহিত করিতে পারিলেই সেই চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা সেই শক্তিতত্ত্ব হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সাধক ধ্যান ও স্তবপাঠান্তে কুণ্ডলিনীদেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রণাম করিবেন। সকলেরই জানিয়া রাখা

* তন্ত্রোক্ত বহুবিধ সাধনা এবং ব্রহ্মশক্তির সবিশেষ তত্ত্ব মৎপ্রণীত "তান্ত্রিকগুরু" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কর্তব্য যে, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর প্রভৃতি সর্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণের ইষ্টদেবতা। তাঁহার প্রণাম যথা—

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ ও তাহার সাধন

যোগের স্বরূপ ও তাৎপর্য জ্ঞাত হইলে ইহাই পর্যালোচনা করিতে হয় যে, যোগ বলিতে কি বুঝায়? অর্থাৎ যোগ কাহাকে বলে? পরম যোগী সদাশিব বলিয়াছেন—

যোঽপানপ্রাণয়োর্যোগঃ স্বরজোরেতসস্তথা।
সূর্যচন্দ্রমসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥
এবন্তু দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে॥—যোগবীজ

—প্রাণ ও অপান বায়ু, রজঃ ও রেতঃ অর্থাৎ নাদ ও বিন্দু, সূর্য ও চন্দ্র অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়ার শ্বাস এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ-সাধনের নাম যোগ।

যোগসাধনায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে এই যোগের আটটি অঙ্গ পর পর সাধন করিতে হইবে। সাধন অর্থে অভ্যাস। যোগের আটটি অঙ্গ যথা—

যমনিয়মাসনপ্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।
—পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ২৯

—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি সাধনার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ।

এই আট প্রকার যোগাঙ্গদ্বারা সাত প্রকার সাধন কীর্তিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যম ও নিয়ম নামে দুইটি অঙ্গ যোগ-

বিষয়ের সাধন নহে। এজন্ত আসন নামক তৃতীয়াঙ্গ হইতে সমাধি পর্যন্ত যে ছয়টি অঙ্গ ও ষট্‌কর্ম নামক একটি উপাঙ্গ, এই সাতটির সাত প্রকার সাধন উক্ত হইয়াছে। যথা—

শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্যং ধৈর্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তত্বং দৈহিকং সপ্তসাধনম্॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৪।৬

—শোধন, দৃঢ়তা, স্থিরতা, ধৈর্য, লঘুত্ব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ততা এই সাত প্রকার সাধনদ্বারা দেহকে পরিশুদ্ধ করিতে হয়।

যে যে যোগাঙ্গদ্বারা যে যে সাধন সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাই বলা যাইতেছে, যথা—

ষট্‌কর্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাৎ লাঘবঞ্চ ধ্যানং প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তত্বং মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৪।৭-৮

ষট্‌কর্ম দ্বারা শোধন, আসনদ্বারা দৃঢ়তা, মুদ্রাদ্বারা স্থৈর্য, প্রত্যাহার-দ্বারা ধীরতা, প্রাণায়ামদ্বারা লঘুত্ব, ধ্যানদ্বারা প্রত্যক্ষ ও সমাধিদ্বারা নির্লিপ্তত্ব সাধন করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।*

ষট্‌কর্ম ও মুদ্রা এই দুইটি বিষয় যোগের অষ্টাঙ্গ হইতে পৃথক্, সুতরাং পাঠকগণের নিকট নূতন। অতএব এই দুইটি বিষয় সম্যক্

---

* স্কন্দপুরাণে মতান্তরে—

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ বিষয়ান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥

—প্রাণায়ামদ্বারা সমস্ত দেহ-দোষ, ধারণাদ্বারা পাপরাশি, প্রত্যাহারদ্বারা বিষয়-সমুদয় এবং ধ্যানদ্বারা অনীশ্বর গুণসমূহকে দগ্ধ করিবে।

লিখিতে হইবে। অগ্রে দেখা যাউক, ষট্‌কর্ম কাহাকে বলে ও তাহার সাধন কি প্রকার।

ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতি লৌলিকী ত্রাটকস্তথা।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্মাণি সমাচরেৎ॥—গোরক্ষসংহিতা, ৪।৯

—ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ছয় প্রকার শোধনকার্যকে ষট্‌কর্ম বলে। এই ষট্‌কর্মসাধনের প্রকারভেদ এইস্থানে প্রদর্শিত হইল।

ধৌতিপ্রকারে—অন্ত্রধৌতি—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার, বহিস্কৃতি; দন্তধৌতি—দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণমূল, কপালরন্ধ্র; হৃদ্‌ধৌতি—দন্তদ্বারা, বমনদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা; মূলশোধন—গুহ্যদেশের অভ্যন্তর প্রক্ষালন। **বস্তিপ্রকার**—জলবস্তি, শুষ্কবস্তি। **নেতিপ্রকার**—মুখ ও নাসিকামধ্যে সূত্রচালন। **লৌলিকীপ্রকার**—উদর সঞ্চালনপূর্বক নাড়ী পরিষ্কারকরণ। **ত্রাটকপ্রকার**—চক্ষে পলক না ফেলা। **কপালভাতিপ্রকার**—বাতক্রম, বুৎক্রম, শীতক্রম।*

এই ষট্‌কর্ম দ্বারা অগ্রে নাড়ীশোধন করিয়া পরে যোগাভ্যাস করিতে হয়। কেননা শরীরস্থ নাড়ীসকল মলাদিতে দূষিত থাকে। নাড়ীশোধন না করিলে বায়ুধারণ করা যায় না। কিন্তু ষট্‌কর্ম দ্বারা নাড়ীশোধন সাধারণের পক্ষে অতীব দুষ্কর। উহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে নানাবিধ দুঃসাধ্য রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা। এজন্য উপযুক্ত লোকের উপদেশানুসারে বিশেষ সতর্কতার সহিত ষট্‌কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। যে সকল সাধক উহা দুষ্কর মনে করিবেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থে লিখিত আন্তর প্রয়োগ দ্বারা নাড়ীশোধনের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা সকলের পক্ষেই সুকর।

* ইহাদের সাধনপ্রণালী সাধকগণকে মৌখিক উপদেশ দেওয়া হয়।

† প্রাণায়ামক্ষয়িতমনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দিশ্যতে।

এক্ষণে মুদ্রার বিষয় জানা আবশ্যক। মুদ্রা অভ্যাসদ্বারা মনের স্থৈর্য ও কুলকুণ্ডলিনীশক্তির চেতনা হয়। যথা—

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥—শিবসংহিতা, ৪।২৫

—সকল প্রকার যত্নের সহিত সেই ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থিতা নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে প্রবোধিত করিবার জন্য মুদ্রাভ্যাস করিবে।

মুদ্রা শারীরিক ব্যায়ামের অনুরূপ। দেহস্থিত বায়ু প্রভৃতিকে শরীর সঙ্কোচন-বিকোচনের দ্বারা ইচ্ছামত পরিচালনাকে মুদ্রা বলা বলা যাইতে পারে। ইহাও খুব সাবধানতার সহিত অভ্যাস করিতে হয়। মুদ্রা অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা বা খেচরী মুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধরী, মূলবন্ধ, মহাবেধ, বিপরীতকরণী, মহাবন্ধ, যোনি, বজ্রোলী, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডবী, পঞ্চধারণা (পঞ্চপ্রকার ধারণা যথা অধো বা পার্থিবা, আম্ভসী, বৈশ্বানরী, বায়বী ও নভসী), শাম্ভবী, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী এবং ভুজঙ্গিনী—এই পঞ্চবিংশতি প্রকার মুদ্রা যোগিগণের সিদ্ধিদাত্রী।

ধারণার সাধনা মুদ্রাদ্বারা সম্পন্ন হয়। যোগিবর গোরক্ষনাথের মতে যোগাঙ্গ কেবল ছয়টি মাত্র। যথা—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥—গো, সং, ১।৫

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই ছয় প্রকার সাধন যোগের অঙ্গ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ইনি আসনদ্বারা

প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তব্যং, ততঃ প্রাণায়ামেঽধিকারঃ। দক্ষিণনাসাপুটমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথাশক্তি। ততোঽনন্তরমুৎসৃজ্যৈব দক্ষিণেন পুটেন সমুৎসৃজেৎ, সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেৎ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চকৃত্বো এবৈবমভ্যসতঃ সাধনচতুষ্টয়মপররাত্রে, মধ্যাহ্নে, পূর্বরাত্রে মধ্যরাত্রে চ পক্ষান্মাসাদ্বা শুদ্ধির্ভবতি। —শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, শাঙ্করভাষ্য, ২।৮

দৃঢ়তা, প্রত্যাহারদ্বারা ধীরতা, প্রাণায়ামদ্বারা লঘুত্ব, ধ্যানদ্বারা প্রত্যক্ষ, সমাধিদ্বারা নির্লিপ্ততার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি এই পাঁচটি যোগাঙ্গ মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি ছয়টি যোগাঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু পাঁচটির সাধন উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। অবশিষ্ট ধারণা নামক যোগাঙ্গের কোনরূপ সাধন উল্লেখ করেন নাই, তৎপরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা স্থৈর্যসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ধারণা-দ্বারা মুদ্রারূপ প্রক্রিয়াসহযোগে স্থৈর্যসাধন বলা হইয়াছে। যম ও নিয়ম এই দুইটি যোগাঙ্গ যদিও গোরক্ষনাথ স্বীকার করেন না, তথাপি ষট্‌কর্মের দ্বারা শোধন-কার্য করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ষট্‌কর্মটিই নিয়মনামক যোগাঙ্গের অন্তর্গত। যেহেতু ষট্‌কর্মের জন্য যে সকল পদ্ধতির উল্লেখ আছে এবং নিয়ম নামক যোগাঙ্গের যেরূপ সাধনা দেখা যায়, তাহা পরস্পর মিলন করিলে ষট্‌কর্ম নামক শোধন কার্যটি নিয়ম নামক যোগাঙ্গের অংশ বলিয়া বিশেষ প্রতীতি হয়। কেবল "যম" নামক যোগের প্রথমাঙ্গটির কোনও প্রকার সাধন-প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না, যেহেতু উহার অধিকাংশ ক্রিয়াই মানসিক। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, যম নামক যোগের প্রথমাঙ্গটি কেবল চিত্তশুদ্ধির সাধনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এজন্য অনেক যোগিপুরুষ যম নামক অঙ্গটিকে যোগাঙ্গের মধ্যে ধরেন নাই। যাহা হউক, যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ মিলন সংস্থাপন করিলে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না, যথা—

প্রথমাঙ্গ যম	উহার সাধন	চিত্তশুদ্ধি অভ্যাস
দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়ম	„ (ষট্‌কর্মদ্বারা)	শোধন অভ্যাস
তৃতীয়াঙ্গ আসন	„	দৃঢ়তাভ্যাস

চতুর্থাঙ্গ প্রাণায়াম	উহার সাধন	লাঘবাভ্যাস
পঞ্চমাঙ্গ প্রত্যাহার	„	ধৈর্যাভ্যাস
ষষ্ঠাঙ্গ ধারণা	„	(মুদ্রাদ্বারা) স্থৈর্যাভ্যাস
সপ্তমাঙ্গ ধ্যান	„	প্রত্যক্ষতাভ্যাস
অষ্টমাঙ্গ সমাধি	„	নির্লিপ্ততাভ্যাস

এইরূপ অষ্টপ্রকার সাধনাভ্যাসজন্য যোগের অষ্টপ্রকার অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। এই অষ্টপ্রকার যোগাঙ্গ ক্রমান্বয়ে সাধন করিলে নিশ্চয় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। এই অষ্টপ্রকার যোগাঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ মৎপ্রণীত 'যোগীগুরু' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পাঠ করিবার আগে "যোগীগুরু" নামক পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে হইবে। কেননা, তাহাতে যোগের প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ শরীরতত্ত্ব, যথা—নাড়ী, বায়ু ও চক্রাদির বিবরণ, যোগের নিয়মাদি পালন, অষ্টাঙ্গ যোগের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ এবং আসনসাধন প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এই গ্রন্থে তাহার পুনরাবৃত্তি হইল না। সুতরাং সেইগুলি না বুঝিলে এই সকল তত্ত্ব বুঝিতে গোল বা সন্দেহ হইতে পারে। কেবল এই খণ্ডে লিখিত সাধনপ্রণালীগুলির সুবিধার্থে প্রাণায়াম ও সমাধির বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে। কারণ প্রাণায়াম সাধন না করিলে যোগের উচ্চ উচ্চ বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

প্রাণায়াম সাধন

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে ধারণ করার নাম প্রাণায়াম। যোগশাস্ত্রের আচার্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

—পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ৪৯

—শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগের নিয়মে বিধৃত করার নাম প্রাণায়াম।

পূর্বার্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।

নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেন যোগিপুঙ্গবঃ ॥—শিবসংহিতা, ৩।৬০

—ষোড়শ প্রাণায়াম করিয়া সাধক পূর্বজন্ম ও ইহজন্মকৃত জ্ঞানাজ্ঞান বিবিধ প্রকার পাপ ও পুণ্য বিনষ্ট করিবেন।

পুণ্য বিনষ্ট করার কারণ এই যে, পাপ ও পুণ্য উভয়েই বন্ধনের হেতু—তবে সোনার শিকল আর লোহার শিকল।

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বর্যাষ্টকানি বৈ।

পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥—শিবসংহিতা, ৩।৬২

—যোগীন্দ্রব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া পাপ-পুণ্যরূপ মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোকমধ্যে পর্যটন করিতে পারেন।

পূর্বার্জিতানি কর্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতম্।

নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহলোকোদ্ভবানি চ ॥—শিবসংহিতা, ৩।৬৯

—প্রাণায়াম দ্বারা সাধকের পূর্বজন্মার্জিত ও ইহজন্মার্জিত কর্মসমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সাধক তিন ঘণ্টা মাত্র বায়ুধারণে সক্ষম হইলে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ লাভ করিতে পারে। যথা—

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।

দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়-প্রবেশনম্ ॥

বিণ্‌মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণস্তথা।

ভবন্ত্যেতানি সর্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্ ॥—শি, সং, ২।৬৪-৬৫

—সাধক তখন স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন, তাঁহার বাক্য সিদ্ধ হয় এবং দূরদৃষ্টি হয়; দূরশ্রবণ, অতিসূক্ষ্ম দর্শন ও পরশরীরে প্রবেশের ক্ষমতা জন্মে; * বিণ্‌মূত্রলেপনে স্বর্ণ ধাত্বন্তর হয় এবং অন্তর্ধান করিবার ক্ষমতা জন্মে। যোগপ্রভাবে এই সকল শক্তি লাভ হয় এবং অবিরোধে শূন্যপথে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে।

যামমাত্রং যদা পূর্ণঃ ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
একবারং প্রকুর্বীত যোগী তদা চ কুম্ভকম্॥
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ॥—শিবসংহিতা, ৩ পঃ

—যখন অভ্যাস করতঃ পূর্ণ একপ্রহরকাল বায়ু বন্ধ করিবার সামর্থ্য জন্মে, তখন একবার মাত্র কুম্ভক করিলে হইতে পারে। একপ্রহরকাল যদি যোগীর শরীরে প্রাণবায়ু নিশ্চল হয়, তবে যোগী স্বকীয় সামর্থ্যে বাতুলের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন।

এতদবস্থার অন্তে অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হয়। যখন ইড়া-পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং প্রাণবায়ু সুষুম্নানাড়ীর মধ্যস্থ ছিদ্রপথে কেবল সঞ্চারিত হয়, তখনই তাহাকে পরিচয় অবস্থা বলে। যথা—

ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্বা সুনিশ্চিতম্।
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
ত্রিকূটং কর্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতম্॥

—শিবসংহিতা, ৩।৭৩-৭৪

—উক্ত বায়ু ক্রিয়াশক্তি গ্রহণ করিয়া সমস্ত চক্র ভেদপূর্বক যখন অভ্যাসযোগে সুনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের নিশ্চিত

* শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য কামকলাসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য রাজা অমরকের মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া, কিঞ্চিন্যূন একমাসকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন।

কর্মের ত্রিকূট দর্শন হয়। অর্থাৎ কর্মজন্ম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের অনুভব হয়,—উহাদিগের স্বরূপ দর্শন হইয়া প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়।

যোগিবর গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন—

অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণং নিরোধয়েৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২৩২

—প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি অল্পকাল মধ্যেই প্রাজ্ঞ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন। এজন্য যোগিগণ ও মুনিগণ প্রাণসংরোধ অভ্যাস করিবেন।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টেন দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ।

—পাতঞ্জলদর্শন, ২।৫০

প্রাণায়াম বৃত্তিভেদে তিন প্রকার—বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। রেচকের নাম বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা। পূরকের নাম অভ্যন্তরবৃত্তি অর্থাৎ শ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা। আর কুম্ভকের নাম স্তম্ভবৃত্তি অর্থাৎ প্রপূরিত বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখা। উক্ত প্রাণায়াম পুনরায় দ্বিবিধ—দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম জানিবার উপায় স্থান, কাল ও সংখ্যা। দেহমধ্যে বায়ুপূরণকালে আপাদমস্তক যদি চিন্ চিন্ করে, তবেই জানিবে দীর্ঘ। যদি চিন্ চিন্ না করে তবেই সূক্ষ্ম। এইরূপ জানার নাম স্থান। কত সময় ধরিয়া কুম্ভক করা হইল তাহাও জানা যায়। যদি বেশী সময় ধরিয়া করা হয় তবেই দীর্ঘ, নচেৎ সূক্ষ্ম। এইরূপ জানার নাম কাল। আর সংখ্যাদ্বারা অর্থাৎ ১৬।৬৪।৩২ বার প্রভৃতি সংখ্যায় মন্ত্রজপদ্বারা যে জানা যায়, তাহার নাম সংখ্যা। সংখ্যার বৃদ্ধি করিতে পারিলেই দীর্ঘ এবং সংখ্যার হ্রাস হইলেই সূক্ষ্ম।

প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম উদাহৃতঃ।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ

—প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সংযোগকে প্রাণায়াম বলে।

রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই ত্রিবিধ কার্য সম্পন্ন করাকেও প্রাণায়াম বলে, যথা—

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুম্ভকৈঃ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।২

প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি সর্বরোগমুক্ত হন; কিন্তু অযুক্ত অভ্যাসে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। যথা—

প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ।
অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ॥
হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ।
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥—সিদ্ধিযোগ

—প্রাণায়ামসাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সর্বব্যাধি বিনষ্ট হয়; কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী বিশেষ সতর্কতার সহিত ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবে, কেননা প্রাণ লইয়া ইহার কার্য ; বায়ুর ব্যতিক্রমে এবং অযুক্ত অভ্যাসের কারণ ইহাতে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরোবেদনা, চক্ষুবেদনা, কর্ণবেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

অতএব শ্বাসপ্রশ্বাসের আকর্ষণ কদাচ বেগের সহিত করিবে না;—উভয়ই ধীরে ধীরে সাবধানতার সহিত করিতে হয়। এরূপ অল্পবেগে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু (ছাতু) যেন নিশ্বাস-বেগে উড়িয়া না যায়। রেচক, পূরক বা কুম্ভক কোন সময়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত বা বক্র করিবে না। এইরূপ উপযুক্তভাবে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই তাহা শীঘ্র আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়। ইহার

অন্যথা করিলে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কার্য সমাধা করিবার চেষ্টা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ফেলিলে অনিষ্ট উপস্থিত হয়। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই বদ্ধ বায়ু লোমকূপ দিয়া নিঃসৃত ও তদ্দ্বারা দেহ বিদীর্ণ হইতে পারে। অতএব অরণ্যহস্তীর ন্যায় উহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করা কর্তব্য। বন্যহস্তী যেমন ক্রমে ক্রমে বশ্য হয়, প্রাণবায়ুও তেমনি ক্রমে ক্রমে বশ্য ও মৃদু হয়, একেবারে হয় না। প্রাণায়ামশিক্ষার্থী যখন কুম্ভকের পর রেচন করিবেন অর্থাৎ আক্রম্যমাণ বাহ্যবায়ুকে যখন পরিত্যাগ করিবেন, তখন আরও অধিকতর সতর্ক ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

প্রস্বেদজনকো যস্তু প্রাণায়ামেষু সোঽধমঃ।
কম্পে চ মধ্যমঃ প্রোক্ত উত্থানে চোত্তমো ভবেৎ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ৬।২৫

—প্রাণায়ামকালে শরীর হইতে ঘর্ম নির্গত হইলে তাহা অধম, কম্প হইলে মধ্যম এবং শূন্যে উত্থিত হইলে উত্তম যোগ বলিয়া কথিত হয়।

প্রথমোদ্যমে ঘর্ম হইতে অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা—

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দনং কারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥

—শিবসংহিতা, ৩।৪৯

—প্রাণায়ামসাধনে প্রথমে সাধকের দেহে ঘর্মের উদ্ভব হয়। ঘর্ম হইলে সেই ঘর্ম সর্বশরীরে মর্দন করিবে, না করিলে সমস্ত শরীরের ধাতু বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দুরী মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্গগনেচরঃ সাধকঃ॥—শিবসংহিতা, ৩।৫০

—প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কল্পে শরীরে কম্প হয়, তৃতীয় কল্পে দর্দুর-গতি অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হয়। অর্থাৎ বদ্ধপদ্মাসনস্থিত যোগীকে অবরুদ্ধ প্রাণবায়ু প্লুতগতির ন্যায় চালিত করে। তৎপরে অধিক কাল বায়ুরোধ করিয়া রাখিতে পারিলে, যোগী ভূমি পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে বিচরণ করিতে পারে।

অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে।
অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
স্বেদো লালা কৃমিশ্চৈব সর্বথৈব ন জায়তে।
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষনিয়ম-গ্রহঃ॥
অত্যল্পং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ।
অথাভ্যাসবশাদ্ যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

—শিবসংহিতা, ৩ পঃ

—প্রাণায়ামসিদ্ধির লক্ষণ এই যে, যোগীর অল্প নিদ্রা, অল্প মূত্র ও অল্প পুরীষ হয়। শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না, সর্বদা চিত্ত সন্তুষ্ট থাকে। যোগিদিগের শরীরে ঘর্ম, কৃমি, কফ, লালাদি জন্মে না। যোগীকে বিনা আহারে বা অল্পাহারে, কি বহুবিধ আহারে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এই যোগবলে সাধকের ভূচরী সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ গম্য কি অগম্য সকল স্থানেই গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে।

যোগশাস্ত্রে অষ্টপ্রকার প্রাণায়াম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

সহিতঃ সূর্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা।
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভিকা॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১৯৫

—সহিত, সূর্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী এই আট প্রকার কুম্ভক।

ঘেরণ্ড বলেন,—

> সূর্যভেদনমুড্ডাখ্যং তথা শীৎকারঃ শীতলী।
> ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্ছা প্লাবনী চাষ্টকুম্ভকাঃ ॥

—সূর্যভেদন, উড্ডীয়ান, শীৎকার, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্ছা ও প্লাবনী এই অষ্টপ্রকার কুম্ভক।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সহিত-স্থানে উড্ডাখ্য, উজ্জায়ী-স্থানে শীৎকার ও কেবলী-স্থানে প্লাবনী নামক কুম্ভক উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ ক্রমে বর্ণনা করিব।

আগে আসনসিদ্ধি ও নাড়ীশোধন করিয়া, তৎপরে প্রাণায়াম সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অতি সহজে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।*

সহিত প্রাণায়াম

রেচ্য চাপূর্য যঃ কুর্যাৎ স বৈ সহিতকুম্ভকঃ।—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য

—শ্বাসত্যাগ ও শ্বাসগ্রহণ করিয়া যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহার নাম সহিত।

> মুখং সংযম্য নাসাভ্যাং চাকৃষ্য পবনং শনৈঃ।
> যথা লগতি কণ্ঠাত্তে হৃদয়াবধি সস্বনঃ।
> পূর্ববৎ কুম্ভয়েৎ প্রাণান্ রেচয়েদিড়য়া ততঃ ॥

ইহাই ঘেরণ্ডসংহিতার উড্ডাখ্য প্রাণায়াম। তাহার ক্রম যথা—

> ইড়য়া বায়ুমারোপ্য পূরয়িত্বোদরস্থিতম্।
> শনৈঃ ষোড়শভির্মাত্রৈরকারং তত্র সংস্মরেৎ ॥
> ধারয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুঃষষ্ট্যা চ মাত্রয়া।
> উকারমূর্তিমত্রাপি সংস্মরন্ প্রণবং জপেৎ ॥

* তস্মিন্ আসনসিদ্ধৌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্বাহ্যকোষ্ঠবায়্বোর্যা অন্তর্বহির্গতিঃ তস্য যো বিচ্ছেদঃ স প্রাণায়ামঃ। স চ আসনজয়াৎ সুখেন সেৎস্যতীতি বিস্তাবনীয়ম্।
—রাজমার্তণ্ড

যাবদ্বা শক্যতে তাবৎ ধারণং জপসংযুতম্।
পূরিতং রেচয়েৎ পশ্চাৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্বিতম্॥
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গি দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া পুনঃ।
প্রাণায়ামো ভবেদেবং পুনশ্চৈবং সমভ্যসেৎ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৬।৪-৭

এই সহিত-কুম্ভকের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিখিত হইল না। কারণ যোগীগুরু গ্রন্থে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক! যোগীগুরু গ্রন্থে প্রাণায়াম দেখিয়া অভ্যাস করিবেন।*

সহিতো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
সগর্ভো বীজমুচ্চার্য নির্গর্ভো বীজবর্জিতঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ১৯৬

—সহিত নামক প্রাণায়াম দুই প্রকার– সগর্ভ এবং নির্গর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহা সগর্ভ এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে কুম্ভক করা যায়, তাহার নাম নির্গর্ভ প্রাণায়াম।

শ্লেষ্মরোগহরঞ্চৈতদনলৈর্দীপ্তিবর্ধনম্।
নাড়ীজলোদরী ধাতুগণ্ডদোষবিনাশনম্॥
গচ্ছতা তিষ্ঠতা কার্যমুড্ডাখ্যং কুম্ভকন্বিদম্॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা

—এই সহিত বা উড্ডাখ্য প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সাধকের শ্লেষ্মা-জনিত সমস্ত রোগ ও জলোদরী ধাতুগণ্ডাদি দোষ বিনষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নির দীপ্তি হয়।

---

* পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্ধেন অশক্ত-স্তত্তৃতীয়তঃ॥ তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্য সংযমঃ। প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূরনেনৈতি যোগ্যতাম্॥ কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জনীমধ্যমাং বিনা।—রাজমার্তণ্ড

সূর্যভেদ প্রাণায়াম

পূরয়েৎ সূর্যনাড্যা চ যথাশক্তি বহির্মরুৎ।
ধারয়েদ্বহুযত্নেন কুম্ভকেন জালন্ধরৈঃ ॥—গোরক্ষসংহিতা

—প্রথমে সূর্যনাড়ী (পিঙ্গলা নাড়ী) দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবে, তৎপরে ঐ আকৃষ্ট বায়ুকে জালন্ধর মুদ্রার দ্বারা ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে।

জালন্ধর মুদ্রা যথা—

কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে মারুতং ধারয়েদ্দৃঢ়ম্।
নাভিস্থাগ্নৌ কপালস্থসহস্রকমলচ্যুতম্ ॥
অমৃতং সর্বদাস্রাবং বিন্দুত্বং যাতি দেহিনাম্।
যথাগ্নিশ্চ তদমৃতং ন পিবেচ্চ পিবেৎ স্বয়ম্ ॥—দত্তাত্রেয়সংহিতা

অর্থাৎ শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমলচ্যুত অমৃতধারা নাভিস্থিত জঠরানলে পতিত হইতে না দিয়া নিজে পান করার নাম জালন্ধরবন্ধ।

যাবৎ স্বেদং ন কেশাগ্রাৎ তাবৎ কুর্বন্তু কুম্ভকম্।—গোরক্ষসংহিতা

—যে পর্যন্ত কেশের অগ্রভাগ হইতে ঘর্ম নির্গত না হয়, তাবৎকাল কুম্ভক করিয়া থাকিবে।

সর্বে তে সূর্যসংভিন্না নাভিমূলাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ইড়য়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্যেণাখণ্ডবেগতঃ ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২০৯

—এই কুম্ভক করিবার সময় প্রাণ আপন প্রভৃতি বায়ুসকলকে সূর্য-নাড়ী অর্থাৎ পিঙ্গলা-নাড়ী দ্বারা ভেদ করিয়া সমানবায়ুকে নাভিমূল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে ইড়া অর্থাৎ বাম নাসাপথে ধৈর্যের সহিত ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বেগে রেচন করিবে।

পুনঃ সূর্যেণ চাকৃষ্য কুম্ভয়িত্বা যথাবিধি।
রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ॥—গোরক্ষসংহিতা,২১০

পুনর্বার দক্ষিণ নাসাতে পূরক, সুষুম্নাতে কুম্ভক ও বাম নাসাপথে রেচন করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়।

মতান্তরে—

আসনে সুখদে যোগী বদ্ধা মুক্তাসনং ততঃ।
দক্ষনাড্যা সমাকৃষ্য বহিঃস্থং পবনং শনৈঃ॥
আকেশাগ্রান্নখাগ্রাচ্চ নিরোধাবধি কুম্ভয়েৎ।
ততঃ শনৈঃ সব্যনাড্যা রেচয়েৎ পবনং সুধীঃ॥—ঘেরণ্ডসংহিতা

সূর্যভেদ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া এইরূপ—সাধক যোগগৃহে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জিহ্বা উল্টাইয়া তালুকুহরে স্থাপিত করুন। তৎপরে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা বাম নাসাপুট ধারণকরতঃ দক্ষিণ নাসাদ্বারা ধীরে ধীরে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট বদ্ধ করিয়া, নাভিমূল হইতে সমানবায়ুকে বলপূর্বক উত্তোলন করিয়া প্রপূরিত বায়ুর সহিত কণ্ঠে ধারণপূর্বক কুম্ভক করুন। যতক্ষণ কেশের অগ্রভাগ দিয়া ঘর্ম নির্গত না হয়, ততক্ষণ কুম্ভক করিতে হইবে। কুম্ভকান্তে প্রপূরিত বায়ুকে ধৈর্যের সহিত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় বাম নাসাপথে রেচন করিবেন। তৎপরে পুনর্বার দক্ষিণ নাসাপথে পূরক, পূর্ববৎ কুম্ভক এবং বাম নাসাপথে রেচন করিবেন। এইরূপ যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে একবার, মধ্যাহ্নকালে একবার, সন্ধ্যাকালে একবার এবং নিশীথকালে একবার, এই চারি সময়ে চারিবার করিতে হইবে।

কুম্ভকঃ সূর্যভেদস্তু জরামৃত্যুবিনাশকঃ।
বোধয়েৎ কুণ্ডলীং শক্তিং দেহানলং বিবর্ধয়েৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১১

—এই সূর্য্যভেদ নামক কুম্ভকদ্বারা জরা-মৃত্যু বিনষ্ট, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি উদ্বোধিত এবং দৈহিক অগ্নি বর্ধিত হয়।

উজ্জায়ী প্রাণায়াম

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বক্ত্রে নৈব চ ধারয়েৎ।
হৃদ্‌গলভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যে চ ধারয়েৎ ॥
মুখং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কুর্য্যাজ্জালন্ধরং ততঃ।
আশক্তিঃ কুম্ভকং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ ॥—গোরক্ষসংহিতা

—উভয় নাসিকাপথ দ্বারা অন্তর্বায়ু আকর্ষণপূর্বক মুখের মধ্যে কুম্ভক করিয়া ধারণ করিবে। পরে মুখ প্রক্ষালনপূর্বক জালন্ধরবন্ধ মুদ্রাযোগে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অবিরোধে বায়ুধারণ করিবে। ঘেরগুমতে ইহাই শীৎকারপ্রাণায়াম নামে উক্ত হইয়াছে।

সাধক উপযুক্ত স্থানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসিকাদ্বারা সমান বেগে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করিবেন। বায়ু আকর্ষণকালে চিবুক কণ্ঠে সংস্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। তৎপরে প্রপূরিত বায়ুকে মুখে ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবেন। কুম্ভকান্তে পরিষ্কার জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালনকরতঃ যত্নপূর্বক রসনা তালুমূলে সংস্থাপন করিবেন। তৎপরে পুনঃ পুনঃ যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অবিরোধে বায়ুধারণ করিতে হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে ইহাও চারি সময়ে করিতে হইবে।

উজ্জায়ীকুম্ভকং কৃত্বা সর্বকার্যাণি সাধয়েৎ।
ন ভবেৎ কফরোগশ্চ ক্রূরবায়ুরজীর্ণকম্ ॥
আমবাতং ক্ষয়ং কাসঃ জ্বরপ্লীহা ন জায়তে।
জরামৃত্যুবিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ ॥—গোরক্ষসংহিতা

—উজ্জায়ী কুম্ভক করিয়া সকল প্রকার কার্য সাধন করিবে। ইহাতে কফরোগ, ক্রূরবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, কাস, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি জন্মে না এবং জরা-মৃত্যু বিনষ্ট হয়।

শীতলী প্রাণায়াম

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য পূর্ববৎ কুম্ভকাদিতঃ।
শনৈশ্চ ঘ্রাণরন্ধ্রাভ্যাং রেচয়েদনিলং প্রিয়ে ॥—ঘেরণ্ডসংহিতা

—জিহ্বাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় কুম্ভক করিবে। তৎপরে ধীরে ধীরে উভয় নাসাপথে ঐ বায়ুকে রেচন করিবে।

সাধক সুখাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া ঠোঁট দুইখানি সরু করিয়া বাহিরের বাতাস ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিবেন। এইরূপ যথাশক্তি বায়ু টানিয়া মুখ বন্ধকরতঃ ঢোক গিলিবার মত করিয়া আকৃষ্ট বায়ুকে উদরে চালনা করুন, পরে ক্ষণমাত্র ঐ বায়ুকে কুম্ভকদ্বারা ধারণ করিয়া উভয় নাসাপথে ধীরে ধীরে রেচন করিবেন। প্রত্যহ দিবারাত্রের মধ্যে তিন চারি বার এই ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

সর্বদা সাধয়েদ্ যোগী শীতলীকুম্ভকং শুভম্।
অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব তস্য প্রজায়তে ॥—গোরক্ষসংহিতা

—যোগিগণ সর্বদা এই শুভজনক শীতলী-কুম্ভক সাধন করিবে, তাহা হইলে কখনই তাহাদিগের অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ জন্মিবে না।

গুল্মপ্লীহাদিকান্ দোষান্ জ্বরং রেতঃক্ষয়ং ক্ষুধাম্।
তৃষ্ণাঞ্চ শীতলী নাম কুম্ভকোঽয়ং নিহন্তি বৈ ।—ঘেরণ্ডসংহিতা

—শীতলী-কুম্ভক সাধন করিলে গুল্ম, প্লীহা, জ্বর, রেতঃক্ষয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সাধকের সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

এই প্রক্রিয়ায় শূলবেদনা প্রভৃতি বুকে পেটে যে কোন আভ্যন্তরীণ বেদনা থাকিলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।*

* শীতলীকুম্ভকের বিশদ বিবরণ মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থের বরকল্পে দ্রষ্টব্য।

ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম

ভস্ত্রেব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ ॥
এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃত্বা কুর্যাচ্চ কুম্ভকম্।
তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পূর্বোক্তঞ্চ যথাবিধি ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৬-২১৭

লৌহকারের ধমকাযন্ত্রদ্বারা উদ্দীপনজন্য যেরূপ বায়ু আকর্ষণ করা যায়, সেইরূপ উভয় নাসাপুটদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদরে চালিত করিবে। এইরূপ বিংশতিবার বায়ু চালনা করিয়া কুম্ভকদ্বারা যথাসাধ্য বায়ু ধারণ করিবে। তৎপরে পূর্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ ভস্ত্রিকা-(জাঁতাকল) দ্বারা যেরূপ বায়ু নিঃসৃত করা যায়, সেইরূপ উভয় নাসাপুট-দ্বারা বায়ুর রেচন করিবে। কিন্তু সাবধান!—যেন রেচনান্তে হাঁপাইতে না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভস্ত্রিকাকুম্ভকং সুধীঃ।
ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৮

—সাধকব্যক্তি তিনবার এইরূপ ভস্ত্রিকাকুম্ভক সাধন করিবে। এই সাধনদ্বারা রোগ বা ক্লেশ থাকে না, দিন দিন আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ভ্রামরী প্রাণায়াম

অর্ধরাত্রিগতে যোগী জন্তুনাং শব্দবর্জিতে।
কর্ণৌ পিধায় হস্তাভ্যাং কুর্যাৎ পূরককুম্ভকম্ ॥

শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভম্।
প্রথমং ঝিল্লীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরম্॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২১৯-২২০

—অর্ধরাত্রিকালে যোগী জন্তুগণের শব্দরহিত ও যোগসাধনোপযোগী স্থানে গমনপূর্বক উভয় কর্ণ হস্তদ্বারা বন্ধ করিয়া পূরক ও কুম্ভক করিবে। অর্থাৎ কর্ণ বন্ধ করিয়া উভয় নাসিকাপথে ধীরে ধীরে বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিবে। উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা কর্ণরন্ধ্রযুগল বন্ধ করিতে হয়; ঐরূপে ফুসফুসে বায়ু পূর্ণ করিয়া লইয়া বায়ু ধারণ করিবে। যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া অল্পে অল্পে রেচন করিবে। প্রতিদিন অর্ধরাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে দক্ষিণ কর্ণে শরীরাভ্যন্তরস্থ নাদশব্দ শ্রুত হইতে থাকিবে। প্রথমে ঝিঁঝি পোকার মত শব্দ, তৎপরে বংশীরব শ্রুত হইয়া থাকে।

মেঘ-ঝর্ঝর ভ্রমরী-ঘণ্টা-কাংস্যস্ততঃপরম্।
তুরীভেরী-মৃদঙ্গাদি-নিনাদানকদুন্দুভিঃ।
এবং নানাবিধো নাদো জায়তে নিত্যমভ্যাসাৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২১

—পরে মেঘগর্জন, ঝর্ঝরীবাদ্যের ধ্বনি, ভ্রমরগুঞ্জন, ঘণ্টা, কাংস্য, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক, দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যের নিনাদ ক্রমশঃ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ভ্রামরী প্রাণায়াম নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে নানাবিধ শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে।

অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ॥
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২২-২২৩

—হৃদয়স্থিত অনাহতপদ্মের মধ্য হইতে যে শব্দ উত্থিত হয়, সেই শব্দের ধ্বনি অর্থাৎ প্রতিশব্দ শ্রুতিগোচর হইবে, পরে যোগিব্যক্তি নয়ন নিমীলিত করিয়া অন্তরমধ্যে সেই অনাহতপদ্মস্থ প্রতিধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন করিবে। সেই দীপকলিকাকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্মে যোগিজনের মন সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর পরমপদে লীন হইবে। এইরূপ ভ্রামরী প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সমাধি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।*

মূর্চ্ছা প্রাণায়াম

পূরকান্তে গাঢ়তরং বদ্ধা জালন্ধরং শনৈঃ।
রেচয়েন্মূর্চ্ছনাখ্যোঽয়ং মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা ॥—ঘেরণ্ডসংহিতা

—সাধক যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসিকাপথে ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করিবে। এইরূপে আপাদমস্তক বায়ুতে পূর্ণ করিয়া জালন্ধরবন্ধ-মুদ্রাযোগে অর্থাৎ রসনা তালকুহরে প্রবিষ্ট করতঃ কণ্ঠে বায়ু ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে। পরে ঐ প্রপূরিত বায়ুকে উভয় নাসাপথে ধৈর্যের সহিত রেচন করিবে। এই ক্রিয়া দিবারাত্রির মধ্যে তিন চারিবার করিতে হয়।

সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রুবোরন্তরম্।
সন্ত্যজ্য বিষয়ান্ সর্বান্ মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা ॥
আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবম্।
উৎপদ্যতে যত্নতো হি শিক্ষেত কুম্ভকং সুধীঃ ॥—গোরক্ষসংহিতা

—প্রথমে পূর্বোক্ত প্রকারে স্বচ্ছন্দে কুম্ভক করিয়া মনকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে সংযুক্ত করতঃ পরমাত্মাতে লীন করিবে। এইরূপ আত্মার সহিত

---

* ভ্রামরী কুম্ভকযোগে কিরূপে লয়যোগ সাধন করিতে হয়, তাহা মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" গ্রন্থের সাধনকল্পে "নাদসাধন" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখ।

মনের সংযোগবশতঃ পরমানন্দ সমুদ্ভূত হয় ; এইজন্য পণ্ডিতগণ যত্নপূর্বক মূর্ছা নামক কুম্ভক অভ্যাস করিবেন।

বাতপিত্তশ্লেষ্মহরং শরীরাগ্নিবিবর্ধনম্।
কুণ্ডলীবোধনং চক্রে ক্রোধঘ্নং শুভদং শুচি ॥—ঘেরণ্ডসংহিতা

মূর্ছানামক প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাদোষ বিনষ্ট ও শরীরের অগ্নি বর্ধিত হয়, চক্রে কুণ্ডলিনী উদ্বোধিতা এবং সাধকের ক্রোধাদি বিনাশে শুচি ও শুভ হইয়া থাকে।

কেবলী প্রাণায়াম

রেচকং পূরকং মুক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ৩।৩০

—রেচক বা পূরক পরিত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু ধারণপূর্বক প্রাণায়াম করাকে কেবলী কুম্ভক বলে।

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ।
একাধিকচতুঃষষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে ॥
কেবলীমষ্টধা কুর্যাদ্ যামে যামে দিনে দিনে।
অথবা পঞ্চধা কুর্যাদ্ যথা তৎ কথয়ামি তে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২৭-২২৮

—উভয় নাসাপুটদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিবে। প্রথম দিনে এই কুম্ভক সাধনে এক অবধি চৌষট্টিবার পর্যন্ত "হংসঃ" বা "সোঽহং" এই মন্ত্রদ্বারা জপসংখ্যা রাখিয়া শ্বাসবায়ু ধারণ করিবে। প্রতিদিন এই কেবলী প্রাণায়াম অষ্টপ্রহরে অষ্টবার করিবে। অসমর্থ হইলে পঞ্চবার করিবে। যেরূপে তাহা করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রাতর্মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে মধ্যরাত্রিচতুর্থকে।
ত্রিসন্ধ্যমথবা কুর্যাৎ সমমানে দিনে দিনে ॥
পঞ্চবারং দিনে বৃদ্ধির্বারৈকঞ্চ দিনে তথা।
অজপাপরিমাণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২২৯-২৩০

—সাধক প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, মধ্যরাত্রিতে এবং শেষ রজনীতে এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চবার কুম্ভক করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে কেবল তিনবার মাত্র করিবে অর্থাৎ প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিসন্ধ্যাকালে তিনবার করিবে। যে পর্যন্ত অজপা পরিমাণে অর্থাৎ একুশ হাজার ছয় শত বার (২১৬০০) কুম্ভক করিতে সমর্থ হওয়া না যায়, সেই কাল পর্যন্ত প্রতিদিন পঞ্চবার করিয়া কুম্ভক বৃদ্ধি করিবে। যদি পাঁচবার বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হও, তবে প্রতিদিন একবার করিয়াও বৃদ্ধি করিবে।

ঘেরণ্ডমতে—

অন্তঃপ্রবর্তিতাধারমরুতা পূরিতোদরম্।
সাক্ষাৎ পারস্থ গাধেঽপি প্লবতে পদ্মপত্রবৎ ॥—ঘেরণ্ডসংহিতা

এই প্লাবনী প্রাণায়াম কেবলী প্রাণায়ামের নামান্তর মাত্র।

প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিৎ।
কুম্ভকে কেবলীসিদ্ধৌ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ২৩১

—এইরূপ প্রাণায়ামকে যোগিগণ কেবলী প্রাণায়াম বলেন। কেবলী কুম্ভক সিদ্ধ হইলে ভূতলে কি না সিদ্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।

এইরূপ করিয়া যে কোন প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, ইহার ফলে সাধক প্রথমেই অত্যন্ত শান্তি বোধ করিবেন। প্রকৃত বিশ্রাম কাহাকে

বলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। সারাদিন খাটিয়া আসিয়া একবার প্রাণায়াম করিলে এরূপ বিশ্রাম-সুখ অনুভূত হইবে, যাহা জীবনে কখনও অনুভব করিতে পারেন নাই। তারপরে, ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে মুখের জ্যোতিঃ ফুটিবে। শুষ্ক দাগ, চিন্তার রেখা সাধকের মুখ হইতে দূর হইবে। গলার স্বর সুমিষ্ট হইবে। যৌবনের নবীন কিরণ দেখা দিবে। সুখের চির-বসন্ত আসিয়া হৃদয় অধিকার করিবে।

সমাধি সাধন

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

--পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ ৩

—কেবল সেই পদার্থ [স্বরূপ আত্মা] আছেন, এরূপ আভাস জ্ঞানমাত্র থাকিবে, আর কিছু জ্ঞান থাকিবে না, এইরূপ চিত্তের ধ্যেয় বস্তুতে যে তন্ময়তা অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তুতে চিত্তের লয় হইয়া যাওয়া, তাহার নাম সমাধি।

সমাধির্ব্রহ্মণি স্থিতি।—গরুড়পুরাণ

—পরব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখার নাম সমাধি।

ধ্যানদ্বাদশকৈরেকঃ সমাধিঃ প্রতিপদ্যতে।
আত্মসংযময়োঃ সম্যগৈক্যং যথা ভবতি গোচরঃ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৬৩০

দ্বাদশ বার ধ্যান করিলে একবার সমাধি সিদ্ধি হয়। এই সমাধি-দ্বারা আত্মা ও জীবের ঐক্য উপলব্ধি হইতে পারে।*

---

* প্রাণায়ামে দ্বিষট্কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ। প্রত্যাহারৈর্দ্বাদশভির্ধারণা পরিকীর্তিতা॥ ভবেদীশ্বরসঙ্গত্যৈ ধ্যানং দ্বাদশধারণম্। ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধি-রভিধীয়তে॥ সমাধেঃ পরতো জ্যোতিরনন্তং সপ্রকাশকম্। তস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়াকাণ্ডং যাতায়াতং নিবর্ত্ততে।—স্কন্দপুরাণ, ১৪-১৬

উভয়োরাত্মনোরৈক্যং সমাধিশ্চ বিধীয়তে।
যথা সংক্ষীয়তে প্রাণো মনশ্চৈব বিলীয়তে॥

—গোরক্ষসংহিতা

—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এতদুভয়ের ঐক্যই সমাধি। এই সমাধি অবস্থায় মন, প্রাণ সকলই লয়প্রাপ্ত হয়। অপিচ—

নির্গুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সমভ্যসেৎ।
বায়ুং নিরুধ্য মেধাবী জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥

—দত্তাত্রেয়সংহিতা

—নির্গুণ ধ্যানসম্পন্ন ব্যক্তি সমাধিযোগ অভ্যাস করিবে। কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ করিয়া সাধক জীবন্মুক্ত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থাকে সমাধি বলে। নতুবা কেবল একাগ্রচিত্ত হইলেই যে সমাধি হয়, তাহা নহে। যথা—

তত্ত্বাববোধো ভগবন্ সর্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন চ তূষ্ণীমবস্থিতিঃ॥—যোগবাশিষ্ঠ

—হে ভগবন্! ব্রহ্মজ্ঞান সকল আশাতৃণের পাবকস্বরূপ। সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরই নাম সমাধি, কেবল মৌনী হইয়া স্থিতির নাম সমাধি নহে।

এ পর্যন্ত জ্ঞান ও যোগ বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত যোগই যে ব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই যে যোগ, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে। ব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, জ্ঞান-সাধন দ্বারা যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ হন, তাঁহারা

—দ্বাদশটি প্রাণায়ামে একটি প্রত্যাহার হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বাদশটি প্রত্যাহারে একটি ধারণা, দ্বাদশটি ধারণায় একটি ধ্যান। এই ধ্যানকালে ঈশ্বরসন্দর্শন হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বাদশটি ধ্যানে সমাধিলাভ হইয়া থাকে। সমাধিকালে স্বপ্রকাশ অনন্তজ্যোতিঃ পরিদর্শন হয়; সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিলে আর ইহ সংসারে আসিতে হয় না, সমস্ত কর্মভোগ নিবৃত্তি হইয়া নির্বাণমুক্তিলাভ হয়।—কূর্মপুরাণ, ১৪-১৬·

প্রাণরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধন দ্বারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভে প্রয়াস পান। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।
অত্র বঃ সংশয়ো মা ভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্॥

—সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য জ্ঞান নাই এবং যোগবলের স্তায় বল নাই। এই বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবে না, সাংখ্যজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান।

যোগশব্দে আত্মজ্ঞান ও প্রাণসংরোধ উভয়ই বুঝায়, কিন্তু প্রাণরোধই যোগশব্দে রূঢ়িতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্ত যোগ ও জ্ঞান এই দুইটি উপায় সমান এবং সমফলপ্রদ। ক্লেশাসহিষ্ণু সুকোমলচিত্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে হঠাৎ প্রাণসংরোধ-যোগ অসাধ্য, আর বিচারানভিজ্ঞ কঠোরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়-জ্ঞান অসাধ্য। সমাধি-যোগেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধ্যান গাঢ় হইলে, ধ্যেয়বস্তু ও আমি এরূপ জ্ঞান থাকে না ; চিত্ত তখন ধ্যেয়বস্তুতেই বিনিবেশিত, এক কথায় তাহাতে লীন ; সেই লয়াবস্থাকেই সমাধি বলে।

যোগাচার্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন যে, সমাধি দুই প্রকার, যথা—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় পদার্থের জ্ঞান থাকে এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে সেরূপ কিছুই থাকে না।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তু দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম আবার দুই প্রকার—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। পঞ্চমহাভূতজন্ত পদার্থের নাম বাহ্য-স্থূল এবং পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্বের নাম বাহ্য-সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়সকলকে আধ্যাত্মিক-স্থূল এবং অহংতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ও আত্মাকে আধ্যাত্মিক-সূক্ষ্ম বলে। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদে যে চারি প্রকার পদার্থের উল্লেখ করা গেল, এই সমস্তই ধ্যেয়-বস্তু বলিয়া কথিত হয়। এই চারিপ্রকার ধ্যেয় বস্তুর

অন্তর্গত যে কোনরূপ পদার্থে ধ্যানসংযোগে গাঢ় চিত্তনিবেশ করিতে পারার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

পদার্থসকলের চারিপ্রকার বিভাগজন্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চারিপ্রকার অবস্থা হইয়াছে। যথা—

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ১৭

—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা। এই চারিপ্রকার অবস্থাযুক্ত সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বিতর্কাবস্থা—বাহ্য স্থূলপদার্থের সাক্ষাৎকারস্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। বিচারাবস্থা—বাহ্য সূক্ষ্মপদার্থের সাক্ষাৎকারস্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। আনন্দাবস্থা—আধ্যাত্মিক স্থূলপদার্থের সাক্ষাৎকারস্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। অস্মিতাবস্থা—আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মপদার্থের সাক্ষাৎকার-স্বরূপ জ্ঞানলাভ হওয়া। এই চারিপ্রকার সমাধি অবস্থায় যথাক্রমে বাহ্য, আন্তর, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম এই চারি জগতের জ্ঞান লাভ হয়। এই চারি প্রকার অবস্থার মধ্যে যে কোনরূপ অবস্থায় সমাধি সংঘটন হউক না কেন, তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমধি বলা যায়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দুই প্রকার ভাব আছে। যথা—ভবপ্রত্যয় ও উপায়প্রত্যয়। ভবপ্রত্যয় সমাধির ভাব অবিদ্যামূলক এবং উপায়প্রত্যয় সমাধির ভাব বিদ্যামূলক। ভবপ্রত্যয় সমাধিতে সংসারাসক্তি থাকে এবং উপায়প্রত্যয় সমাধিতে সংসারাসক্তি থাকে না এই প্রভেদ। যথা—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্।—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ১৯

বিদেহ-লয় ও প্রকৃতি-লয় এই দুই প্রকার যোগীর যে সম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহা ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক, যেহেতু উহারা সংসারাগমনের কারণ, মুক্তির কারণ নহে।

যোগী দেহপাতের পরে যদি পঞ্চমহাভূতে অথবা সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ে লয় পান, তবে তাহাকে বিদেহ-লয় বলা যায়, আর যিনি তন্মাত্র-তত্ত্বে বা অহং-

তত্ত্বে অথবা মহত্তত্ত্বে কিংবা অব্যক্ত প্রকৃতিতে চিত্তকে লয় করেন, তাঁহার সেই লয়কে প্রকৃতি-লয় বলা যায়। এই উভয় প্রকার লয় হওয়াকেই ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ভাব বলে, কারণ তাঁহাদের চিত্ত পুনর্বার সুষুপ্তিভঙ্গের পর জাগ্রদবস্থা-প্রাপ্তির ন্যায় যথাকালে সাংসারিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ সমাধি হইলেও সাংসারিক বীজ নষ্ট হয় না, যথাকালে অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে পুনরায় সংসারী করিয়া ফেলে। এইজন্য এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আর একটি নাম সবীজ সমাধি। যথা—

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ৪৬

উক্ত চতুর্বিধ সমাধিকে সবীজসমাধি বলে, কেননা উহা বীজের ন্যায় অঙ্কুরজনক। সমাধিভঙ্গের পর পুনরায় তাহা হইতে সংসারাঙ্কুর উৎপন্ন হয়; এইরূপ সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। বেদান্তশাস্ত্রে ইহাই সবিকল্প সমাধি নামে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ সমাধিকালে, যেমন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তি-জ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকা-জ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈতজ্ঞান হয়।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যেরূপ সংসারাগমনের বীজসংশ্লিষ্ট, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সেরূপ নহে। উহা নির্বীজ, নিরবলম্ব এবং কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তির হেতু। যথা—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।

—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ ১৮

—মনোবৃত্তির বিরাম বা নিবৃত্তি হইলে যে চিত্তের একপ্রকার শূন্য-ভাব উপস্থিত হয়, অর্থাৎ চিত্তের যখন কোনরূপ অবলম্বন না থাকে, তখন তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস হইতেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কঠোরতর দার্ঢ্য জন্মিলে চিত্ত যখন আর বাহ্য জগতের সহিত সংস্পর্শ করিতে চাহিবে না, কোন অবলম্বন চাহিবে না,

মনোবৃত্তিসমুদয় লয়প্রাপ্ত হইবে, তখনই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইবে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে কথান্তরে নির্বীজ সমাধি বলা যায়।

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।

—পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ২০

অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ন্যায় কোন ইন্দ্রিয়, মহাভূত, তন্মাত্র বা প্রকৃতিতে চিত্তার্পণ না করিয়া, প্রথম হইতেই আপনার আত্মাতে, ইষ্ট-দেবতাতে বা পরব্রহ্মে যদি চিত্ত লয় করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে শ্রদ্ধা, বীর্য্য স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎ-কার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

প্রথমে যোগের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হওয়ার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতে উৎসাহ জন্মিলে তাহাকে বীর্য বলা যায়; বীর্য হইতে অনুভূত বিষয়ের অবিস্মরণ হওয়ার নাম স্মৃতি; ভাব্য বিষয়ে ধ্যানতৎপর হওয়ার নাম স্মৃতি। স্মৃতি বা ধ্যান গাঢ় হইয়া আসিলেই একাগ্রতা বা সমাধি উৎপন্ন হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার, ইষ্টদেবতা-সাক্ষাৎকার বা পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তাহা হইলেই কৃতকৃতার্থ হওয়া গেল।

অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিই বেদান্তমতে নির্বিকল্পসমাধি বলিয়া উক্ত হয়। নির্বিকল্পসমাধিকালে, যেমন জলমিশ্রিত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্ব-জ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই বোধ হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মা-কারাকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্ত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয়।

সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।—পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ৪৫

ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিতে পারিলে অন্য কোনরূপ সাধনা না করিলেও কেবল ভক্তিবলেই সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিলাভ হয় এবং অন্তে নির্বাণমুক্তি প্রাপ্তি হয়।

নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যত্নাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।—শিবসংহিতা, ৫।৭৩

। "অধিমাত্রতম" নামক যোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী সাধক বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে ছয় মাসের মধ্যেই সিদ্ধ হইতে পারেন।

যাহা হউক, সিদ্ধগুরু না পাইলে কেহ কখনও প্রাণসংরোধরূপ যোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ প্রাণরোধরূপ যোগ অভ্যাসের সময়ে কোনরূপ নিয়মের অন্যথাচরণ হইলে, নানাপ্রকার উৎকট পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। যোগেশ্বর সদাশিব বলিয়াছেন,—

যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধ্বা চ যোগবিদ্‌গুরুম্‌।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ॥
ভবেদ্বীর্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্বীর্যাপ্যতিদুঃখদা॥

—শিবসংহিতা, ৩।৯-১০

—যোগবিদ্‌ গুরু লাভকরতঃ তাঁহা হইতে যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারই উপদেশ অনুসারে নিশ্চয়বুদ্ধির সহিত সাধন করিবে। কারণ, গুরুর উপদেশমত কার্য করিলে যোগবিদ্যা বীর্যবতী হওয়ায় সত্বরই সিদ্ধিলাভ করা যায়। তদ্ভিন্ন সিদ্ধিলাভ ঘটে না; অধিকন্তু সাধককে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

সাধনাভিলাষী ব্যক্তি প্রথমে আসন-অভ্যাস ও যথাযথ নাড়ীশোধন করিয়া পূর্বোক্ত অষ্টবিধ প্রাণায়ামের মধ্যে যাঁর যেটি ইচ্ছা হয় তিনি সেই প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন। সুন্দররূপে প্রাণায়াম অভ্যাস হইলে পশ্চাদুক্ত যে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সমাধি অভ্যাস করিবেন। যাঁহারা প্রাণায়াম আদি ক্রিয়াকে কঠিন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রাণায়ামের পরিবর্তে মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" পুস্তকের "কুণ্ডলিনী চৈতন্যের কৌশল" শীর্ষক বিষয়ের কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইলে পশ্চাদুক্ত যে কোন ক্রিয়া অভ্যাস করিবেন।

প্রকৃতি-পুরুষ যোগ বা কুণ্ডলিনী-উত্থাপন

যত প্রকার যোগের প্রণালী আছে, তন্মধ্যে কুণ্ডলিনী উত্থাপন বা প্রকৃতি-পুরুষযোগ শ্রেষ্ঠ। কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া চিনে জোঁকের ন্যায়, অর্থাৎ জোঁক যেমন একটি তৃণ হইতে আর একটি তৃণ অবলম্বন করে, তদ্রূপ মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠাইয়া শেষে শিরসি সহস্রারে লইয়া পরমপুরুষের সহিত যোগ করাই প্রধান যোগ। যে ব্যক্তি বহু পুণ্যফলে কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে ভজনা করেন, তিনি ধন্য ও কৃতার্থ হন। যথা—

মহাকুণ্ডলিনীশক্তিং যো ভজেত্ ভুজঙ্গিনীম্।
স কৃতার্থঃ স ধন্যশ্চ স দিব্যো বীরসত্তমঃ॥

—ভুজঙ্গিনীরূপিণী মহাকুণ্ডলিনীশক্তিকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, তিনি কৃতার্থ ও ধন্য এবং যথার্থ বীরশ্রেষ্ঠ।

কুণ্ডলিনী উত্থাপনের মানস-ক্রিয়ার প্রণালী এইরূপ।—সাধক যোগসাধনোপযোগী স্থানে কম্বল, মৃগচর্ম প্রভৃতি যে কোন আসনে পূর্ব কিংবা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া ধূপাদির গন্ধে গৃহ পূর্ণ করিবেন ও নিজে আনন্দযুক্ত হইবেন। অতঃপর আপন আপন সুবিধামুরূপ অভ্যস্ত যে-কোন আসনে স্থিরভাবে সোজা হইয়া উপবেশন করিবেন। প্রথমতঃ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সপ্তদশের আধারস্বরূপ জীবাত্মাকে মূলাধারচক্রস্থিত কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত চিন্তা করিবেন। মূলাধারপদ্ম ও কুণ্ডলিনীশক্তিকে মানসনেত্রে দর্শন করিয়া "হুঁ" এই কূর্চবীজ উচ্চারণপূর্বক উভয় নাসিকাপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত করিতে করিতে চিন্তা করুন, মূলাধারস্থিত শক্তিমণ্ডলান্তর্গত কুণ্ডলিনীর চতুর্দিকস্থিত কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ

অগ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। তখন "হংস" মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অশ্বিনীমুদ্রাযোগে গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত করিয়া কুম্ভকদ্বারা বায়ুরোধ করিলে কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বগমনোন্মুখী হইবেন। সেই সময় সাধক কুণ্ডলিনীশক্তিকে মহাতেজময়ী চিন্তা করিবেন। সে সময় কুণ্ডলিনী এক মুখ স্বাধিষ্ঠানে রাখিয়া অন্য মুখদ্বারা মূলাধারস্থিত ব্রহ্মা ও ডাকিনীশক্তি এবং ঐ পদ্মের চতুষ্পত্রস্থিত বং, শং, ষং, সং, এই মাতৃকাবর্ণ, সমুদয় দেবতা ও বৃত্তি চারিটি গ্রাস করিবেন অর্থাৎ উহারা তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে; এই পৃথ্বীমণ্ডলও লয়প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মুখে লং এই বীজ অবস্থান করিবে। তখন তিনি ঐ মুখও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইবেন। অমনি মূলাধারপদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইবে এবং ম্লান হইয়া যাইবে।*

মূলাধারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানপদ্মে আসিয়াই পূর্বের মুখ মণিপুরে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখদ্বারা স্বাধিষ্ঠান-পদ্মস্থিত বিষ্ণু ও রাকিনীশক্তি, পদ্মপত্রস্থিত দেবতাগণ, বং, ভং, মং, যং, রং, লং, এই ছয়টি মাতৃকাবর্ণ এবং প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্ছা সর্বনাশ ও ক্রূরতা এই ছয়টি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত পৃথ্বীবীজ লং জলে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং জলও বং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ঐ মুখ ক্রমে মণিপুর-পদ্মে উঠাইবেন। এই প্রণালীসমুদয় ভাবনাদ্বারা অভ্যস্ত হইলে, যখন কুণ্ডলিনী উঠিতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। কেননা তিনি যতদূর উঠিবেন, সেই পর্যন্ত মেরুদণ্ডের ভিতর সিড়্ সিড়্ করিবে, রোমাঞ্চ হইবে এবং সাধক মনে অপার আনন্দ অনুভব করিবেন।

---

* সাধককে এইখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, সমুদয় পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্ধ্বমুখ ও বিকশিত হয়। কুণ্ডলিনী চৈতন্যলাভ করিয়া যখন যে পদ্মে যাইবেন তখন সেই পদ্মই বিকশিত হইবে। কিন্তু যখন যে পদ্ম ত্যাগ করিবেন, তখন সেই পদ্ম মূলাধারের ন্যায় অধোমুখ, মুদ্রিত ও ম্লান হইয়া যাইবে।

অতঃপর কুণ্ডলিনী মণিপুর আসিয়া পূর্বমুখ অনাহত-পদ্মে উত্তোলন করিবেন এবং অপর মুখদ্বারা মণিপুর-পদ্মস্থিত রুদ্র ও লাকিনীশক্তি, পদ্মপত্রস্থিত দেবতাগণ, ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং এই দশটি মাতৃকাবর্ণ এবং লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয় এই দশটি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত বং বীজ অগ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং অগ্নিও রং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি এই মুখও ক্রমশঃ অনাহত-চক্রে উঠাইবেন। মণিপুবচক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিবার সময়ে সাধকের মেরুদণ্ডের ভিতর চিন্ চিন্ করে, বেদনা অনুভব হয়। এই সময় সাধকের উদরাময় রোগ প্রকাশ পায় এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী অনাহতপদ্মে আসিয়া পূর্বমুখ বিশুদ্ধপদ্মে উত্তোলন করিয়া অপর মুখদ্বারা অনাহত-পদ্মস্থিত দেবদেবী, কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং, এই দ্বাদশটি মাতৃকাবর্ণ এবং আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ এই দ্বাদশটি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত রং-বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও যং-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ বিশুদ্ধ চক্রে উঠাইবেন। অনাহতপদ্মকে বিষ্ণুগ্রন্থি বলে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধ-পদ্মে আসিয়া পূর্বমুখ ললনা-পদ্ম নামক গুপ্ত চক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখদ্বারা বিশুদ্ধ-পদ্মস্থিত অর্ধনারীশ্বর, শিব, শাকিনীশক্তি, পদ্মপত্রস্থিত সমুদয় দেবদেবী, অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং, অং, অঃ এই ষোড়শটি মাতৃকাবর্ণ এবং নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম, এই সপ্তস্বর ও হুঁ, ফট্, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিষ, অমৃত প্রভৃতি

গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত বায়ুবীজ যং আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং আকাশও হং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ ললনাচক্রে উঠাইবেন।

কুলকুণ্ডলিনী ললনাচক্রে আসিয়া একমুখ আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন করিয়া অপর মুখদ্বারা ললনাচক্রস্থিত শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম, উর্মি ও শুদ্ধতা এ দ্বাদশটি বৃত্তি গ্রাস করিবেন। তখন তিনি ক্রমশঃ এই মুখ আজ্ঞাপদ্মে উঠাইবেন।

অনন্তর কুণ্ডলিনী আজ্ঞাপদ্মে আসিয়া আজ্ঞাপদ্মস্থ শিব, শক্তি ও হং, লং, ক্ষং, এই তিনটি মাতৃকাবর্ণ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি পদ্মস্থিত অন্যান্য সমুদয় গ্রাস করিবেন। পূর্বোক্ত আকাশবীজ হং মনশ্চক্রে লয় হইয়া যাইবে। মন ও মনশ্চক্র-মধ্যস্থ শিবও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে। এই পদ্মের নাম রুদ্রগ্রন্থি। এই গ্রন্থি ভেদ করিলে সাধক হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ ও তেজোযুক্ত হইবেন, শরীর নীরোগ হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী সোমচক্রের মধ্য দিয়া যাইবেন এবং সুষুম্না-মুখের নীচে কবাটস্বরূপ অর্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল ভেদ করিয়া যতই উত্থিত হইতে থাকিবেন, ততই ক্রমে ক্রমে নাদ, বিন্দু, হকারার্ধ ও নিরালম্বপুরী প্রভৃতি গ্রাস করিয়া যাইবেন অর্থাৎ তৎসমস্ত কুণ্ডলিনী-শরীরে লয়-প্রাপ্ত হইবে। এই অর্ধচন্দ্রাকার কবাট ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদলকমলে পরমপুরুষের সহিত সংযুক্ত হইবেন।

আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী এইরূপে স্থূলভূত হইতে প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব গ্রাস করিয়া শিরসি সহস্রারে উঠিয়া পরমপুরুষের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইবেন। তখন প্রকৃতি-পুরুষের সামরস্য-সম্ভূত অমৃতধারাদ্বারা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে। এই

সময় সাধক সমস্ত জগৎ বিস্মৃত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কিরূপ অনির্বচনীয় অভূতপূর্ব অপার আনন্দে নিমগ্ন হইবেন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। এ আনন্দ অনুভব ব্যতীত মুখে বলিয়াও বুঝাইতে পারা যায় না। সে অব্যক্ত অপূর্ব ভাব ব্যক্ত করিবার মত ভাষা নাই। সে অনির্দেশ্য অননুভূত আনন্দ অনির্বচনীয়! অবর্ণনীয় !! অলেখনীয় !!!

সহস্রদলপদ্মে কুণ্ডলিনীকে মহাতেজোময়ী অমৃতানন্দমূর্তি চিন্তা করিবেন। তৎপরে সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত ও রসাপ্লুত করিয়া পরমপুরুষের সহিত সামরস্যসম্ভোগ করিয়া পুনর্বার কুণ্ডলিনীকে যথাস্থানে আনয়ন করিতে হইবে। এই সময় তাঁহাকে অমৃতধারা-প্লাবিত মহামৃতরূপা আনন্দময়ী চিন্তা করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনীকে নামাইবার সময় সাধক "সোঽহং" মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে তিনি নিম্নদিকে আসিবেন। প্রত্যাগমনকালে নিরাবলম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু আদি উদ্গীর্ণ করিয়া যখন কুণ্ডলিনী আজ্ঞাপদ্মে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহা হইতে মন, পরমশিব, হাকিনীশক্তি ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ, মাতৃকাবর্ণ এবং পদ্মস্থিত অন্যান্য সমুদয় সৃষ্ট হইয়া পূর্ববৎ যথাস্থানে অবস্থিত হইবে। অনন্তর মনশ্চক্র হইতে হং আকাশবীজ উৎপন্ন হইলে, তাহা মুখে করিয়া সেই মুখদ্বারা ললনাচক্র ভেদ করিয়া বিশুদ্ধপদ্মে উপস্থিত হইবেন।

অতঃপর এখানে আসিলে তাঁহার মুখ হইতে অর্ধনারীশ্বর শিব ও শাকিনীশক্তি এবং মাতৃকাবর্ণ, সপ্ত স্বরাদি—যাহা তিনি গ্রাস করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ও অমৃত প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে সংস্থিত হইবে। তখন অপর মুখও এই পদ্মে প্রত্যাগমন করিবে। আকাশবীজ হং হইতে আকাশ আবির্ভূত হইবে। আকাশ হইতে যং বীজ উৎপন্ন

হইয়া তাঁহার মুখে অবস্থান করিবে। তিনি তখন অনাহতপদ্মে ঐ মুখ আনয়ন করিবেন।

অনাহতপদ্মে আসিলে কুণ্ডলিনীর মুখ হইতে পদ্মস্থিত সমস্ত দেব-দেবী, মাতৃকাবর্ণ ও আশা প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া পূর্ববৎ যথাস্থানে থাকিবে ; ক্রমশঃ অপর মুখ এই পদ্মে উপনীত হইবে। যং এই বায়ুবীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে অগ্নিবীজ রং আবির্ভূত হইলে পূর্ববৎ তাহা মুখে করিয়া মণিপুরপদ্মে উপস্থিত হইবেন।

মণিপুরে আসিয়া কুণ্ডলিনী আপন মুখ হইতে এই পদ্মস্থিত রুদ্র ও লাকিনীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ, লজ্জাদি বৃত্তিসমুদয় এবং অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টি করিয়া পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলে অপর মুখ ক্রমশঃ এই পদ্মে আসিবে। অগ্নিবীজ রং হইতে বরুণবীজ বং উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীমুখে অবস্থান করিবে।

কুণ্ডলিনী বং-বীজ মুখে করিয়া স্বাধিষ্ঠানপদ্মে আসিবেন। তাঁহার মুখ হইতে এই পদ্মস্থিত বিষ্ণু ও রাকিণীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ, অবিশ্বাসাদি বৃত্তিসমুদয় এবং অন্যান্য সমস্তই আবির্ভূত হইয়া পূর্ববৎ যথাস্থানে স্থিত হইবে। তখন অপর মুখও ক্রমশঃ এই পদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বরুণবীজ বং হইতে জল উৎপন্ন হইবে এবং জল হইতে পৃথ্বীবীজ লং উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর মুখে অবস্থান করিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী লং বীজ মুখে করিয়া স্ব-আধার মূলাধার পদ্মে উপস্থিত হইবেন। অমনি তাঁহার মুখ হইতে ব্রহ্মা ও ডাকিনীশক্তি, মাতৃকাবর্ণ এবং অন্যান্য সমস্তই উৎপন্ন হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে। পৃথ্বীবীজ লং হইতে পৃথ্বীমণ্ডল সৃষ্টি হইবে। তখন তিনি অপর মুখ ক্রমশঃ এই পদ্মে আনয়ন করিয়া ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধ করতঃ সুখে নিদ্রিতা হইয়া অন্য মুখদ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে

থাকিবেন। তখন পুনর্বার জীবাত্মা ভ্রান্তি ও মায়ামোহে সংমুগ্ধ হইয়া জীবভাবে যথাস্থানে অবস্থান করিবেন।

এই প্রণালী কুম্ভকযোগে ভাবনাদ্বারা ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়। কুণ্ডলিনী সর্বস্বরূপিণী, সুতরাং কুণ্ডলিনী সকল দেহে সকলের মূলরূপে মূলাধারে অবস্থিতি করিতেছেন। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, পার্শি, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, তান্ত্রিক প্রভৃতি যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, সকলেই উপরোক্ত নিয়মে কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিয়া সাংখ্যযোগে সাধন করিতে পারিবেন।

যাহারা স্থূলমূর্তির উপাসক, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাক্ত অর্থাৎ শক্তিমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা কুণ্ডলিনীকে উঠাইবার সময় 'হংস' বলিয়া উঠাইবেন এবং নামাইবার সময় 'সোঽহং' বলিয়া নামাইবেন। আর কুণ্ডলিনীকে উক্তপ্রকারে সহস্রারে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে গুরূপদিষ্ট ইষ্টদেবতা, অর্থাৎ যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি কুণ্ডলিনীশক্তিকে সেই দেবী এবং পরমপুরুষকে তন্নির্দিষ্ট ভৈরব কল্পনা করিয়া উভয়ের একত্র সামরস্য সম্ভোগ করিবেন। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।*

* শক্তিসাধক স্বনামধন্য মহাত্মা রামপ্রসাদের ভজনসঙ্গীতে আছে—

জাগ্ মা আমার দেহমধ্যে। (কুল-কুণ্ডলিনী)
(আমি) জ্ঞান-চন্দন ভক্তি-জবা দিব মা তোর শ্রীপাদপদ্মে।
অপূর্ব ছয় পদ্ম আছে মা মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যে।
ডাকিন্যাদি শক্তি তোমার রয়েছে তার প্রতি পদ্মে॥
সুষুম্নার সূক্ষ্মপথে মা শক্তি সঙ্গে গো যোগাদ্যে।
চল সহস্রদল পদ্ম 'পরে মা আমি তাই ভাবি গো ভবারাধ্যে॥
পরমহংসরূপে পিতা আছেন তথা শোন্ বিশুদ্ধে।
পরমহংসীরূপিণী মা তুই, একবার যুগল মিলনে দেখা দে।
প্রসাদ বড় ভাবছে গো মা, কি হবে শমনের যুদ্ধে।
অভয় দে অভয়ে শমনভয়ে আর ছলনা করিস্‌নে আদ্যে।

আর যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারাও উক্তপ্রকারে কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উঠাইয়া পুরুষের সহিত সংযুক্ত করিবার কালে কুণ্ডলিনীকে পরা প্রকৃতি-রূপিণী রাধা এবং সহস্রারস্থিত পরমপুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া উভয়ের সামরস্য-সম্ভোগ করিবেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতম্।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাং ষট্‌চক্রাণ্যথ বিভাব্য চ॥
কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরম্।
সহস্রদলমধ্যস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুম্॥
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌষেয়বাসসম।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভম্॥

—নারদপঞ্চরাত্র, ৩৭০-৭২

—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ষট্‌চক্র হৃদয়মধ্যে ভাবনা করিয়া স্বশক্তি ও কুণ্ডলিনীর সহিত সহস্রদল-পদ্মস্থিত পরমাত্মাপ্রভুকে ধ্যান করিয়া, দ্বিভুজ এবং পীতকৌষেয়বস্ত্র-পরিহিত, ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, সুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং নবীন মেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।

কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব-সাধনের বহুবিধ প্রণালী শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সহজ, শ্রেষ্ঠ ও সুখসাধ্য কয়েকটি প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল। যাঁহার যেটি সুবিধা হইবে, তিনি সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন করিবেন। বিষয় একই, প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন মাত্র।

রসানন্দ যোগ বা যোনিমুদ্রা সাধন

যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রারে উত্থাপিত করা যাইতে পারে। যথা—

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গার-রসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতঃ সমাধিস্তেন জায়তে ॥

—ঘেরণ্ডসংহিতা, ৪

—যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া সাধক সেই পরমাত্মাতে আপনাকে শক্তিময় ভাবনা করিবে অর্থাৎ আপনাকে প্রকৃতিরূপা শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপ শিব চিন্তা করিবে, তাহা হইলে প্রকৃতি-পুরুষ বা শিব-শক্তি জ্ঞান হইবে। তখন স্ত্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গাররসপূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। এইরূপ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে মিলিত হইয়াছি, এরূপ জ্ঞান জন্মিবে। তাহা হইলে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরব্রহ্মে চিত্ত লয় হইয়া যাইবে।

পূর্বোক্তরূপে বৈষ্ণবসাধক আপনাকে রাধারূপে চিন্তা করিয়া পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাস-রসে মত্ত হইবেন। যোনিমুদ্রার ক্রম এইরূপ—

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ততে ॥
ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুকসন্নিভম্।
সূর্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥
তস্যোর্ধ্বে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তয়া সহিতাত্মানমেকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥
গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণম্ ॥
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারপ্রবর্ষিণম্।

পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্।
পুনরেবা কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা ॥
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতা।
পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদিঃ শিবাত্মকঃ ॥
যোনিমুদ্রা পরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥

—শিবসংহিতা, ৪।২-৮

প্রথমে পূরক-যোগ দ্বারা স্বীয় মূলাধারপদ্মে বায়ুর সহিত মনকে স্থাপন করিতে হইবে। গুহ্যদ্বার ও উপস্থের মধ্যবর্তী স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে। এই যোনিস্থান আকুঞ্চিত করিয়া যোনিমুদ্রা সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। এই যোনিমণ্ডলকে ব্রহ্মযোনিও বলা যায়। এই ব্রহ্মযোনিমধ্যে বন্ধুকপুষ্পসদৃশ রক্তবর্ণ, কোটিসূর্যের ন্যায় তেজোময় এবং কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল স্থিরতর কন্দর্প নামক বায়ু আছে। তাহার উর্ধ্বভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্ম চৈতন্যস্বরূপা পরমা কলা (কুণ্ডলিনীশক্তি) আছেন। সাধক এইরূপ ধ্যান করিয়া, পরে আত্মা সেই পরমা-কলা কুণ্ডলিনীশক্তি কর্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত হইয়া আছেন, তাহাই চিন্তা করিবেন। তৎপরে সাধক কুম্ভক-যোগপ্রভাবে বায়ুর সহিত ঐ কুণ্ডলিনীশক্তি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ, এই লিঙ্গত্রয় ভেদ করিয়া সুষুম্নানাড়ীর রন্ধ্রমধ্য দিয়া ব্রহ্মমার্গে গমন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবেন। এইরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি অকুল-স্থানে (শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল-কমলকর্ণিকা মধ্যে) উপনীত হইয়া বিসর্গস্থিত দিব্য কুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই কুলামৃত পরমানন্দময়, শ্বেত-রক্তবর্ণ (সত্ত্ব-রজোময়) ও তেজঃসম্পন্ন; ইহা হইতে দিব্য সুধাধারা বর্ষণ হইতেছে। কুণ্ডলিনী এইরূপ দিব্য কুলামৃত পান করিয়া পুনর্বার কুলস্থানে মূলাধারপদ্মস্থ ব্রহ্মযোনিমণ্ডলে) প্রত্যাগমন করিবেন। কুলকুণ্ডলিনী

শক্তির এইরূপ গমনাগমন প্রাণায়ামমাত্রাযোগেই করিতে হইবে। সেই মূলাধারপদ্মে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি আত্মার প্রাণস্বরূপা হইয়া আছেন। এইরূপ গমনাগমনের পর পুনর্বার ঐ কুণ্ডলিনীশক্তি কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন হইতেছেন, ইহাই চিন্তা করিবে, ইহারই নাম যোনিমুদ্রা। ইহা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠ ; ইহার বন্ধমাত্রেই সাধক, এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারেন।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতো ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

—তন্ত্রবচন

যোনিমুদ্রাযোগে এইরূপে পুনঃ পুনঃ কুণ্ডলিনীশক্তিকে কুলামৃত পান করাইলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না।

যোগিবর গোরক্ষনাথের মতে যোনিমুদ্রা এইরূপ—

সিদ্ধাসনং সমাসাদ্য কর্ণচক্ষুর্নাসামুখম্।
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীমধ্যানামাদিভিশ্চ সাধয়েৎ ॥
কাকীভিঃ প্রাণং সংকৃষ্য অপানে যোজয়েত্ততঃ।
ষট্‌চক্রাণি ক্রমাৎ ধ্যাত্বা হুঁ হংসমধুনা সুধীঃ ॥
চৈতন্যমানয়েৎ দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী।
জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য করাম্বুজে ॥
শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরঃশিবেন সঙ্গমম্।
নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখম্ ॥
শিবশক্তি-সমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ।
আনন্দশ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ ॥
যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
সকৃত্তু লাভাৎ সংসিদ্ধিঃ সমাধিস্থঃ স এব হি ॥

—গোরক্ষসংহিতা, ৮৭-৯৪

সাধক সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জনীদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়, মধ্যমাদ্বয় দ্বারা নাসিকাবিবরদ্বয় এবং অনামিকা-দ্বয় ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দুইটি দ্বারা মুখবিবর রুদ্ধ করিয়া, কাকীমুদ্রা দ্বারা অর্থাৎ ঠোঁট দুখানি কাকচঞ্চুর ন্যায় সরু করিয়া প্রাণবায়ুকে সমাকর্ষণ করিয়া অপানবায়ুতে যুক্ত করিবে। তৎপরে শরীরস্থ ষট্‌চক্রকে ধ্যান করিয়া "হুঁ হংস" এই মন্ত্রদ্বারা নিদ্রিতা ভুজঙ্গিনীদেবীকে অর্থাৎ কুল-কুণ্ডলিনীকে সচৈতন্য করিয়া জীবাত্মার সহিত শক্তিকে শিরস্থিত সহস্রদল-পদ্মে উপস্থাপিত করিবে। সুধীব্যক্তি আপনাকে শক্তিময় ভাবনা করিয়া ঐ কমলকর্ণিকামধ্যে পরমপুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় সঙ্গমাসক্ত হইবেন এবং আপনাকে আনন্দময় ও পরমসুখী চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হইবে, তাহা হইলেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইল। এই যোনিমুদ্রা অতিশয় গোপনীয়, দেবগণও উহা লাভ করিতে পারেন না। এই মুদ্রা একবার মাত্র করিলেই সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও সমাধিস্থ হইতে পারা যায়।

সমাধিভঙ্গ হইলে পর যোগী অন্তর্বাহে আর ভ্রান্তি দর্শন করেন না, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান।

এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ। নারীসহবাসকালে শুক্রবহির্গমন সময়ে শরীর ও মনে যেমন অনির্দেশ্য আনন্দ অনুভব ও অব্যক্ত ভাব হইয়া থাকে, সাধক সমাধিকালে তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। শরীর ও মনের সে অব্যক্ত অপূর্বভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই।

ব্রহ্মযোগ বা ভূতশুদ্ধি সাধন

ভূতশুদ্ধিযোগেও কুলকুণ্ডলিনী উত্থাপিত হইয়া থাকেন। নিত্য জপ-পূজাদিতে ভূতশুদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। ভূতশুদ্ধি না করিলে কোন

কার্যেই অধিকার হয় না। কিন্তু লক্ষ লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিও প্রকৃত ভূতশুদ্ধি জানেন কিনা সন্দেহ। ইড়া বা পিঙ্গলার পথে হইবে না; সুষুম্না-পথে দেহের সমস্ত তত্ত্ব, সমস্ত বৃত্তি ঐ কুণ্ডলিনীশক্তির সাহায্যে সর্বতোভাবে একমুখী করাই ভূতশুদ্ধির মুখ্য উদ্দেশ্য। সুন্দররূপে প্রাণায়াম অভ্যাস না থাকিলে, কেহই ভূতশুদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম একক এবং অদ্বিতীয় হইয়া ব্রহ্মানন্দ-রস উপভোগ করিবার জন্য শিব-শক্তিরূপে বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টিবিন্যাস করিয়াছেন। এক্ষণে শিবশক্তিভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরব্রহ্মভাব অনুভব করিতে হইলে সেই শিবশক্তিকে বা পুরুষ-প্রকৃতিকে একত্র করিয়া পুনর্বার চণকাকার (ছোলার মত) এক আবরণ-মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহা না পারিলে আর পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হইবে না, আজন্ম প্রকৃতি-পুরুষজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তি যত্নের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন করিবেন। প্রকৃতি-পুরুষ একত্র করার নাম ব্রহ্মতত্ত্ব। যথা—

মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।
তয়োরৈক্যে মহেশানি ব্রহ্মতত্ত্বং তদুচ্যতে॥

—তন্ত্রবচন

—মূলাধারকমলস্থিতা কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত সহস্রারস্থিত পরম-শিবের যে সম্মিলন, তাহাকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলে।

ভূতশুদ্ধি যোগে এই ব্রহ্মতত্ত্ব সাধনের প্রণালী এইরূপ—

সাধক আপন সুবিধানুরূপ আসনে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া মনঃস্থিরের জন্য কিছুক্ষণ নাভিদেশে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া থাকিবেন। তদনন্তর বামে গণেশ ও দক্ষিণে গুরু কল্পনা করিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিবেন। অনন্তর সাধক স্বকীয় অঙ্কে উত্তান পাণিদ্বয় (চিৎভাবে হস্তদ্বয়) রক্ষা করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন,

বুদ্ধি এই সপ্তদশের আধার জীবাত্মাকে মূলাধার-পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত চিন্তা করিয়া মূলাধারপদ্ম ও কুণ্ডলিনীকে মানসনেত্রে (ধ্যান দ্বারা) দর্শন করিবেন। পরে যং এই বায়ুবীজ উচ্চারণপূর্বক ষোলবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত ব্রহ্মযোনিমধ্যে বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কোটীসূর্যের ন্যায় তেজোময় ও কোটীচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল যে কন্দর্প নামক স্থির বায়ু আছে, তাহাই উদ্দীপিত করিবেন। তৎপরে রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণপূর্বক বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চারিদিকস্থ বহ্নি প্রজ্বলিত করিবেন এবং অভিনিবিষ্টমনে চিন্তা করিবেন, কুণ্ডলিনী কর্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত আত্মার যে পাপাদি কর্ম ছিল, তাহা অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত ও বায়ুদ্বারা উড়িয়া স্থানান্তরিত হইল। উক্ত প্রকারে বায়ুদ্বারা বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে হুঙ্কারদ্বারা কুণ্ডলিনীর উত্থান করাইয়া হংস মন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীতত্ত্বের সহিত তাঁহাকে স্বকীয় স্বাধিষ্ঠানচক্রে উত্তোলন করিয়া স্থাপন করিবেন এবং তত্ত্বসমুদয় তাঁহাতে সংযোজিত করিবেন।

অভিনিবিষ্টচিত্তে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কোন এক বিষয় চিন্তা করাকে ইচ্ছাশক্তি (Will force) বলে। সাধক সেই ইচ্ছাশক্তিকে মূলাধার-পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির উপরে অভিনিবিষ্ট করিলে, তাহাতে তাঁহার উদ্বোধন হয়। যে ইন্দ্রিয়ের উপরে মন সন্নিবিষ্ট করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়শক্তিই তখন উদ্বোধিত হয়—জাগিয়া উঠে। কুণ্ডলিনীও শক্তি, অতএব তাঁহার উপরে মনের অভিনিবেশ করিলে তিনিও জাগরিতা হন। তখন হুঙ্কার অর্থাৎ গম্ভীর স্বর বিস্তারপূর্বক হুঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই স্বরাশ্রয় করিয়া কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানে উঠিয়া পড়েন। আর "হংস" শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের মন্ত্র; এই হংস বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্রস্থল মূলাধার, মূলাধার হইতেই উহা উদ্ভূত হইয়া থাকে; লং এই পৃথ্বীবীজও

তাহার অবভাসক, সুতরাং ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসও পৃথ্বীতত্ত্বের সহিত সংযুক্ত না হইলে কুণ্ডলিনী উঠিতে পারেন না।

কুণ্ডলিনীকে স্বকীয় অধিষ্ঠানে স্থাপনপূর্ব্বক পৃথিব্যাদি তত্ত্বসমুদয়কে জলাদি তত্ত্বে লীন করিবেন, গন্ধাদি ঘ্রাণের সহিত সমুদয় পৃথিবী জলে লীন করিবেন। অনন্তর রসনার সহিত রস-জল অগ্নিতে লীন করিবেন, তৎপরে রূপাদি ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নিকে বায়ুতে লীন করিবেন। তদনন্তর সশব্দ আকাশকে অহঙ্কার-তত্ত্বে লীন করিয়া উহাকে বুদ্ধিতত্ত্বে লীন করিবেন। তদনন্তর বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে লীন করিয়া ব্রহ্মে ঐ প্রকৃতির লয় করিবেন।

কিরূপে ঐ পৃথিব্যাদিতত্ত্ব অন্য তত্ত্বে লীন হয়, তাহা কুণ্ডলিনী উত্থাপন ক্রিয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে লইয়া পরমপুরুষের সহিত সংযুক্ত ও একীভূত করিয়া তাঁহাদের উভয়ের সামরস্যসম্ভূত অমৃতধারায় নিজ শরীরকে প্লাবিত ও আনন্দযুক্ত ভাবনা করিবেন। এতদবস্থায় সাধকের ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অনন্তর "সোঽহং" এই মন্ত্রদ্বারা লয় প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে পুনরায় স্বস্থানে চালনা করিবেন।

শাস্ত্রে আরও কয়েক প্রকার ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা প্রায়ই পূজাদিতে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মতত্ত্বসাধনে উপরোক্ত প্রকার ভূতশুদ্ধি আশুফলপ্রদ। অতএব সাধকগণ উক্ত ভূতশুদ্ধি-প্রণালীতে ব্রহ্মতত্ত্ব সাধন করিবেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে অন্য একপ্রকার ভূতশুদ্ধি লিখিত হইল, যথা—

রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ-কুল-কুণ্ডলিন্যা সহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকানাহত-বিশুদ্ধা-জ্ঞাখ্য-ষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা, শিরোবস্থিতাধোমুখ-সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত-

পরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈবপৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ুরাকাশ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষুস্ত্বক্‌-শ্রোত্র-বাক্‌-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থ-প্রকৃতি-মনো-বুদ্ধ্যহঙ্কার-চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপ-পুরুষেণ সহ দেহং সংশোধ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসায়াং বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ মূলাধারোত্থিতেন বহ্নিনা দগ্ধ্বা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন ললাটস্থ-চন্দ্রাদ্গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচয্য লমিতি পৃথ্বীবীজং দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ। ততো হংস ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবরূপমাত্মানং বিচিন্তয়েৎ।

প্রোক্ত ভূতশুদ্ধির সংস্কৃত অতি কোমল, সহজেই ভাব বুঝিতে পারা যায়, এইজন্য উহার অনুবাদ দিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। বিশেষতঃ মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" পুস্তকে এইরূপ ভূতশুদ্ধির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং সকলের করণীয় সহজসাধ্য ভূতশুদ্ধিও লেখা হইয়াছে। কাহারও প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকে সহজসাধ্য ভূতশুদ্ধি দেখিয়া লইবে।

রাজযোগ বা ঊর্ধ্বরেতার সাধন

সাধক প্রথমতঃ কুণ্ডলিনী উত্থাপনের যে কোন ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া তাহাতে পরিপক্ক হইলে পর রাজযোগের প্রণালীতে ঊর্ধ্বরেতার সাধন করা কর্তব্য। যোগশাস্ত্রেও সেইরূপ উপদেশ উক্ত হইয়াছে। যথা—

পূর্বাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মূলাধারনিকুঞ্চনাৎ।
পশ্চিমং দণ্ডমার্গন্তু শঙ্খিন্যন্তঃ প্রবেশয়েৎ ॥
গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরম্।
ততস্তু নাদয়েদ্ বিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ব্রজেৎ ॥—যোগশাস্ত্র

পূর্ব পূর্ব অভ্যাসযোগে মূলাধার নিকুঞ্চন করিয়া মন ও প্রাণবায়ুকে পশ্চিম দণ্ডমার্গে স্থিত শঙ্খিনী-নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশিত করিবেন। পরে গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ নাভিমূলে ব্রহ্মগ্রন্থি, হৃদ্দেশে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং ললাটে রুদ্রগ্রন্থি এই গ্রন্থিত্রয় ভেদ করিয়া ভ্রমরকন্দ অর্থাৎ সহস্রারে উপনীত হইয়া ঐ কমলকর্ণিকামধ্যে যে শক্তিমণ্ডল আছে, তাহার অভ্যন্তরে তেজোময় বিশুদ্ধ-স্ফটিক সদৃশ শ্বেতবর্ণ যে একটি বিন্দু* আছে, সেই বিন্দুস্থান হইতে নাদ (ওঁ) শ্রবণ করিতে করিতে শূন্যালয়ে গমন করিবেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হইবেন।

অথবা মূলসংস্থানমুদ্বাতৈঃ সম্প্রবোধয়েৎ।
সুপ্তাং কুণ্ডলিনীং নাম বিসতন্তুনিভাকৃতিম্ ॥
সুষুম্নান্তঃপ্রবেশেন পঞ্চচক্রাণি ভেদয়েৎ।
ততঃ শিবে শশাঙ্কেন উর্দ্ধং নির্মলরোচিষি।
সহস্রদলপদ্মান্তঃস্থিতে শক্তিং নিয়োজয়েৎ ॥—যোগশাস্ত্র

মূলাধারস্থিত মৃণালতন্তুসদৃশী অতি সূক্ষ্মাকৃতি প্রসুপ্তা অর্থাৎ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে রং বহ্নিবীজবলে মূলাধারোত্থিত বহ্নি প্রবোধিত অর্থাৎ জাগরিত করিয়া সুষুম্নানালমধ্যে প্রবেশনানন্তর পঞ্চচক্র অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান,

* বিন্দুরূপী পরমপুরুষের সবিশেষ বৃত্তান্ত মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। যোগিগণ যোগবলে এই বিন্দু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহাকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলে।

সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণ-নিলয়ান্তরে।
বিন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ ॥—নিরুত্তর তন্ত্র

মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা—এই পঞ্চচক্র ভেদপূর্বক সহস্রদল-কমলান্তর্গত শশাঙ্কসদৃশ নির্মলকান্তি পরমাত্মা পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিবেন।

অথ তৎসুধয়া সর্বাং সবাহ্যাভ্যন্তরাং তনুম্।
প্লাবয়িত্বা ততো যোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥
তত উৎপদ্যতে তস্য সমাধির্নিস্তরঙ্গিণী।
এবং নিরন্তরাভ্যাসাৎ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥—যোগশাস্ত্র

তৎপরে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় শিবশক্তির শৃঙ্গাররসপূর্ণ বিহার হইতে যে সুধাক্ষরণ হইতেছে, সেই সুধাধারাদ্বারা সর্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া থাকিবেন। পরে আর কিছুই চিন্তা করিবেন না। তাহা হইলে নিস্তরঙ্গ অর্থাৎ নির্বাত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চলা সমাধি উৎপন্ন হইবে। এইরূপ নিরন্তর অভ্যাস করিলে যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে।

মহাযোগী মহেশ্বরের বামদেব নামক উত্তর-আম্নায়ে (উত্তরদিকস্থ মুখে) এই রাজযোগ উক্ত হইয়াছে। অধিমাত্র নামক সাধক রাজযোগের অধিকারী। রাজযোগ সর্বযোগের রাজা এবং দ্বৈতভাববর্জিত। যথা—

চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জিত।—শিবসংহিতা, ৫।৯

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি রাজযোগের এক একটি অঙ্গ। প্রাণায়ামাদি হঠযোগ রাজযোগ-সাধনের সবিশেষ সাহায্য করে, এইজন্য হঠযোগ রাজযোগের একটি সহজ উপায় বলিয়া যোগিগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা সাধারণের ন্যায় প্রাণসংরোধরূপ যোগাভ্যাসে অক্ষম, তাঁহারা কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজযোগ সাধন করিবেন। কিন্তু ইহাতেও অধিকারিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেই যোগের আশ্রয়ে সাধন করিবেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥
অস্মিঁল্লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥

—ভাগবত ১১।২০।৬-১১

—আমি মনুষ্যদিগের শ্রেয়ঃসাধন অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বর্গসাধনজন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এই তিন প্রকার যোগের বিষয় বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন শ্রেয়ঃসাধনের আর কোন উপায় কুত্রাপি নাই। ঐ তিনপ্রকার যোগের মধ্যে যাঁহারা নির্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখদায়কবোধে ধর্ম ও কর্মবিষয়ে বিরক্ত, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগই সিদ্ধিপ্রদ। আর কর্ম ও কর্মফলবিষয়ে যাঁহারা দুঃখবুদ্ধিশূন্য অর্থাৎ কামী, যাঁহাদিগের সংসারভোগে তৃপ্তি জন্মে নাই, তাঁহাদের পক্ষে কর্মযোগই সিদ্ধি প্রদান করে। আর কোনরূপ ভাগ্যোদয় বশতঃ আমার (ঈশ্বরের) প্রসঙ্গে যাঁহার নিতান্ত শ্রদ্ধা জন্মে এবং কর্ম ও তৎফলাদিবিষয়ে যিনি বিরক্ত বা অত্যাসক্ত না হন, ভক্তিযোগই তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। যে পর্যন্ত কর্মাদিবিষয়ে বিরক্তি না জন্মে কিংবা আমার কথাশ্রবণাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত

নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম করিবেন। হে উদ্ধব! স্বধর্মে থাকিয়া কামনা পরিত্যাগপূর্বক যদি কোনও ব্যক্তি যজ্ঞাদি সাধন করেন এবং নিষিদ্ধ কর্মসকল না করেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গে অথবা নরকে গমন করেন না। নিষিদ্ধকর্মত্যাগী স্বধর্মানুষ্ঠায়ী শুদ্ধচেতা ব্যক্তি ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হন বা ভাগ্যবশতঃ মদ্ভক্তি লাভ করেন।

অতএব যে কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া রাজযোগ সাধন করিতে পারিলেই সাধকের শ্রেয়ঃসাধন হইয়া থাকে। তবে যাঁহারা যোগশাস্ত্রান্তর্গত রাজযোগ সাধন করেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। এই রাজযোগে সিদ্ধিলাভ হইলে সাধক ঊর্ধ্বরেতা ও জরামরণ-বর্জিত হন; যথা—

অভ্যাসাত্তু স্থিরঃ শান্ত ঊর্ধ্বরেতাশ্চ জায়তে।
পরমানন্দময়ো যোগী জরামরণবর্জিতঃ॥

—যোগশাস্ত্র

—এই রাজযোগ অভ্যস্ত হইলে যোগিগণ শান্ত, ঊর্ধ্বরেতা ও জরামরণবর্জিত এবং পরমানন্দময় হইয়া থাকেন।

অতএব আমি সাধকগণকে যত্নের সহিত রাজযোগ সাধন করিতে অনুরোধ করি। কেননা—

দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগো মনোবায়ুং স্থিরং কৃত্বা প্রযত্নতঃ॥

—যোগশাস্ত্র

—দত্তাত্রেয় আদি মহাত্মাগণ মন ও প্রাণ স্থির করিয়া যত্নের সহিত এই রাজযোগ সাধন করিয়াছিলেন।

নাদবিন্দুযোগ ও ব্রহ্মচর্য-সাধন

শরীরস্থ শুক্রধাতুকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখিবার উপায়কে ব্রহ্মচর্য বলে। যথা—

বীর্যধারণং ব্রহ্মচর্যম্।—পাতঞ্জলদর্শন

বীর্যধারণের নাম ব্রহ্মচর্য।

অতএব সর্বাবস্থায় মৈথুন বর্জন করিয়া বীর্যধারণ কর্তব্য।*

শুকদেবকে অকৃতদার থাকিয়া ব্রহ্মচর্যপালনের নানাবিধ উপদেশ দিয়া দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন—

দ্বন্দ্বারামেষু ভূতেষু য একো রমতে মুনিঃ।
বিদ্ধি প্রজ্ঞানতৃপ্তং তং জ্ঞানতৃপ্তো ন শোচতি॥

—মহাভারত

—যিনি আপনার চতুর্দিকে দাম্পত্যসুখ-পরিতৃপ্ত অসংখ্য ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়াও তাহাদের মধ্যে স্বয়ং একাকী অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তিনিই জ্ঞানতৃপ্ত। তাঁহাকে কদাপি শোক প্রকাশ করিতে হয় না।

দ্বন্দ্বারামেষু সর্বেষু য একো রমতে বুধঃ।
পরেষামনুপধ্যায়ংস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥—মহাভারত

—যিনি আপনার চতুর্দিকে দম্পতীদিগকে পরস্পর অনুরক্ত দর্শন করিয়াও আপনি ঈর্ষাশূন্যহৃদয়ে একাকী বিহার করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

---

* মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" পুস্তকে শুক্রধারণের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যসম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে মৎপ্রণীত "ব্রহ্মচর্যসাধন" পুস্তকখানি অবশ্য পাঠ্য।

সঙ্গং ন কুর্যাৎ প্রমদাসু যস্ত যোগস্ত পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্ত ॥
যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ ॥

—ভাগবত, ৩।৩১ ৩৯-৪০

—যে ব্যক্তি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই রমণীর সাহচর্য করিবেন না; কারণ ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা বলিয়া থাকেন, যিনি আমার (পরমেশ্বরের) সেবাদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারী তাঁহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ। দেবনির্মিত প্রমদারূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি দ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে; কিন্তু জ্ঞানী তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥
ন তথাস্ত ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্তপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

—ভাগবত, ১১।১৪ ২৯-৩০

আত্মবান্ ধীরব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া ভয়শূন্ত দেশে একাকী অবস্থিত থাকিয়া আলস্ত পরিত্যাগ করতঃ সর্বদা আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করিবেন। কারণ স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীব্যক্তির সাহচর্যে তাঁহার যেরূপ ক্লেশ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্ত কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠাধিকারী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য তাঁহার "মণিরত্নমালা" গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিয়াছেন—

কিমত্র হেয়ং?—কনকঞ্চ কান্তা।

মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগের যোগ্য ?—ধন ও স্ত্রী।

কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি ?—নারী।

জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি ?—স্ত্রী।

ত্যাজ্যং সুখং কিং ?—রমণীপ্রসঙ্গঃ।

কোন্ সুখ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগের যোগ্য ?—স্ত্রীসম্ভোগ।

দ্বারং কিমহো নরকস্য ?—নারী।

নরকের দ্বার কি ?—নারী।

সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা ? —স্ত্রী।

সুরার ন্যায় মনুষ্যকে কে উন্মত্ত করে ?—স্ত্রী।

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা ?

নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ।

এই জগতে বিজ্ঞ হইতেও মহাবিজ্ঞতম কে ?—যাহাকে পিশাচী-রূপিণী নারী বঞ্চনা করিতে পারে নাই।*

অতএব যিনি ব্রহ্মচর্য-বৃত্তি সম্যক্‌রূপে পালন করেন, শাস্ত্রানুসারে তাঁহার ব্রহ্মলোক বা মোক্ষপ্রাপ্তি নির্দিষ্ট হয়। স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।—জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র

—যিনি ব্রহ্মচর্যসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছেন, তিনি মর্ত্যলোকবাসী হইয়াও মনুষ্যপদবাচ্য নহেন। তিনিই প্রকৃত দেবতা। কেননা—

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।—পাতঞ্জলদর্শন, ২।৩৮

* এস্থলে নারীগণকে যেরূপ পুরুষদিগের সাধনের অন্তরায়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, পুরুষদিগকেও পক্ষান্তরে স্ত্রীদিগের সাধন সম্বন্ধে তদ্রূপ জানিতে হইবে। নতুবা শাস্ত্রকারগণ যে পুরুষদিগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং নারীগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাহা নহে। কারণ তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীকে গৃহের শ্রী, পুরুষের সহধর্মিণী এবং শরীরের অর্দ্ধাংশরূপে কখনই বর্ণনা করিতেন না। অধিক কি, আগমশাস্ত্রে নারীমাত্র-কেই দেবীরূপে দেখিবার উপদেশ আছে। বিশেষতঃ যিনি সর্বত্রই ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। তিনি কি স্ত্রী কি পুরুষ সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া জানেন।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীর্যলাভ হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দেহে ব্রহ্মণ্যদেবের বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সোজা কথায়—ব্রহ্মচর্য পালন করিলে স্বতঃই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি করিলে সম্যক্ ব্রহ্মচর্যবৃত্তি পালিত হয়। পরমযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষ্যতে ॥

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬২

কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্বতোভাবে মৈথুনেচ্ছা পরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য বলে।

ব্রহ্মচর্যপালনের অন্য কোন লক্ষণ বা কার্য বর্তমান না থাকিলেও যে-সকল ব্যক্তি চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা কেবলমাত্র মৈথুন পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রহ্মচারিরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র স্ত্রীসহবাসকে মৈথুন বলে না, উহা অষ্টাঙ্গ বা অষ্টলক্ষণযুক্ত। যথা—

স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ ॥—দক্ষস্মৃতি, ৭।৩২-৩৩

—কামপ্রবৃত্তিসহকারে রমণীর স্মরণ, কীর্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যকথন, মনে মনে সঙ্কল্প, উদ্‌যোগ এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি, এই আটটিকেই পণ্ডিতেরা মৈথুনের অষ্ট অঙ্গরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ বর্জন করাই ব্রহ্মচর্য, সুতরাং মুমুক্ষুব্যক্তি চেষ্টা ও যত্নের সহিত এই অষ্টবিধ মৈথুন পরিবর্জন করিবেন।

যাঁহার এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, "জীবন যায় যাইবে, তথাপি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কখনই ধর্মপথ উল্লঙ্ঘন করিব না, জীবিত থাকিতে কখনই জিতেন্দ্রিয়তা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিব না"; তিনিই ব্রহ্মচর্যবৃত্তি-পালনে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই জিতেন্দ্রিয়তা-বৃত্তি সহজে লাভ করা যায় না। ব্রহ্মগতপ্রাণ না হইলে জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতে একেবারে বিমুখ, কিন্তু মনের কলুষ ক্ষালিত করে নাই। লোকলজ্জায় বা ধর্মের ভানে, লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভাশায় সংযতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য করে, কিন্তু ভিতরে ইন্দ্রিয়ের প্রবল দাহ। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি হইতে এইরূপ সাধু-মহাত্মাদের প্রভেদ বড় অল্প, উভয়েই তুল্যরূপে ইহলোকের নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি কর বা না কর, যখন ভ্রমেও মনে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির কথা আসিবে না, যখন ধর্মরক্ষার্থ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতে হইলেও তাহা দুঃখের বিষয় ব্যতীত সুখের বিষয় বোধ হইবে না, তখনই বুঝিতে হইবে প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম হইয়াছে। নতুবা লোকদেখান সাধুতার ভান কোন কার্যকরী নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

—গীতা, ৩।৬

—যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সকলকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল স্মরণ করে, সেই মূঢ়াত্মা কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়।

অতএব মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নারী-সহবাসাসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ব্রহ্মচর্যসাধন হয় না। সোজা কথায়, সর্বতোভাবে অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জন করাই ব্রহ্মচর্য। যখন স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা মনোমধ্যে একেবারে উদয় হইবে না, তখনই জানিবে প্রকৃত ব্রহ্মচর্যসাধন হইয়াছে।

প্রথমে দেখিতে হইবে, পুরুষের রমণী-সম্মিলনের ইচ্ছা এত প্রবল কেন? যেমন রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় না করিয়া কখনই রোগের মূলোচ্ছেদ করা যায় না, তদ্রূপ স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষার কারণ অবধারণ না করিলে সে আকুল আকাঙ্ক্ষা রোধ করা যায় না। এই জগতে এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে, যদ্দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন ঘটিয়া থাকে। মহদাদি অণু পর্যন্ত সমস্তই এক নিয়মে গাঁথা। সেই আকুল আকর্ষণশক্তির বলে মানব কামের অনল-উত্তেজনা বুকে করিয়া ছুটাছুটি করে—নর নারীর প্রতি, নারী নরের প্রতি আকাঙ্ক্ষার শতবাহু লইয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রধাবিত হয়, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এত আকাঙ্ক্ষা, এত উচ্ছ্বাস বোধহয় আর কিছুতেই নাই। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলন-জন্য যে নির্মল আনন্দ, প্রকৃতি-অংশসম্ভূতা রমণীর উপরে পুরুষ সেই মিলন-আনন্দের অনুভূতি স্মরণ করিয়া ছুটিয়া পড়ে। আর প্রকৃতির যে রস উপভোগ করাইবার বাসনা, সেই বাসনাতে রমণী পুরুষে আসক্ত হয়। এই সম্মিলন-শক্তিই পুরাণের মদন, তাই তাহার অন্য নাম মনসিজ। অর্থাৎ এই সম্মিলন-ইচ্ছা মানবের মন হইতে জন্মে, তাই মদনের নাম মনসিজ। এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করা যাউক।

সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি-পুরুষমূর্তিহীন কেবল এক জ্যোতিমাত্র ছিল। সৃষ্টির আরম্ভকালে সেই সর্বব্যাপী জ্যোতিঃ আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দু-রূপে প্রকাশমান হন। নাদ ও বিন্দু সগুণ শিব-শক্তি (যথা—"বিন্দুঃ শিবাত্মকো শক্তির্নাদঃ") ইত্যাদি। বিন্দু পরমশিব আর পরাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। এই নাদবিন্দুযোগেই সৃষ্টিবিন্যাস হইয়াছে। যথা—

> বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনাৎ স্বয়ম্।
> সর্বভূতানি জায়ন্তে স্ব-শক্ত্যা জড়রূপয়া॥
>
> —শিবসংহিতা

—বিন্দুরূপ শিব ও রজোরূপা শক্তি, উভয়ের মিলন হইলে জড়রূপা ঈশ্বরের স্বশক্তি দ্বারা জীবের উৎপত্তি হয়।

এইজন্য রজঃকে মাতৃশক্তি ও বিন্দুকে পিতৃশক্তি বলে। এই মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির সংযোগে জীবপ্রবাহ অব্যাহত রহিয়াছে। এই সম্মিলনদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কার্য সম্পন্ন হইতেছে।

এই মাতৃ-পিতৃশক্তিই জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। ইহা দ্বারাই স্ত্রীদেহ-পুরুষদেহ নির্মিত হইয়াছে। সংসারে যত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমস্তই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব। এই দুইটি শক্তিই পরস্পরের ভাবাভিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরে আলিঙ্গিত হইয়া নানাস্থানে নানাভাবে বিকশিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য সম্পন্ন করে। আমি কিন্তু প্রাণিজগতের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের কথা আলোচনা করিব।

যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বের কথা বলা হইল, তাহারা আপনার অস্তিত্ব রক্ষা ও পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বদাই পরস্পরের সম্মিলনচেষ্টা করিতেছে। তদ্দ্বারা উভয়েরই তেজ ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই মানব-মানবীকে একীভূত করে। লৌহখণ্ডদ্বয়ে পরিস্ফুরিত বিরুদ্ধ চুম্বক-শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সম্মিলনের ইচ্ছায় অবলম্বিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া সম্মিলিত হয়, স্ত্রী-পুরুষের উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্বশক্তিও সেইরূপ নিজের নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্র হয়; তদ্দ্বারা আনুভবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনোদ্বয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। তাই বেদে স্বামী হোতা, স্ত্রী ঋত্বিক্; স্বামী চিদাধার, স্ত্রী বিশ্ব-প্রকৃতি। পুরুষ সন্ন্যাস, স্ত্রী শিক্ষা, অভীষ্টদেবতা, জন্ম-সংসার-মৃত্যু-কারিণী; পুরুষ জ্ঞান, স্ত্রী প্রেম; পিতৃ-অংশ উদাসীন—কেবল জীবনের উন্মেষক, আর মাতৃ-অংশ দেহসৃষ্টিকারক—কর্মফল-ভোগ-প্রবর্তক। স্ত্রীশক্তি হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, স্ত্রীশক্তি লইয়া

মানুষ সংসারী হয়, সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্তন করে, আবার স্ত্রীশক্তিতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

স্ত্রী-পুরুষের সংমিলনের দুইটি উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এক সৃষ্টিপ্রবাহ অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয় আত্মসম্পূর্তি। মানুষ সুখ চায়—কেবল মানুষই বা বলি কেন, জগতের জীবমাত্রেই সুখ চায়। সুখপ্রাপ্তির অন্যতম নাম আত্মসম্পূর্তি। স্ত্রী-পুরুষের সংমিলনজনিত ঐন্দ্রিয়িক সুখে সে পূর্ণসুখ নাই। সেই সুখ ত অল্পক্ষণস্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ। মাতৃ-শক্তি ও পিতৃশক্তি বিভক্তভাবে ক্রিয়া করিতেছে, ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিয়া ঐ দুই শক্তির মিলনে আত্মসম্পূর্তি লাভ হইয়া থাকে, তখন মানুষ পূর্ণ হয়। পূর্ণ হইলে জগতের যে প্রধান আসক্তি নর-নারীর মিলনেচ্ছা, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, ঘৃতে আয়ু ও বল বৃদ্ধি করে, আবার অস্বাভাবিক ভোজনে উদরের পীড়া জন্মে, তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষের সংমিলন-ক্রিয়াও জ্ঞানের সহিত সংসাধিত না হইলে আত্মসম্পূর্তি দূরের কথা—আত্মহত্যাই হইয়া থাকে। তবে যে কোনরূপে স্থায়ীভাবে তাহাদের মিলন করিয়া লইতে পারিলে আর ঐ মিলনেচ্ছা আসক্তিতে পরিণত হয় না।

স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে আকুল আকর্ষণ, যে উন্মাদ কামনা, তাহা কেন হয়, বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন। কীট-পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্যন্ত সকলেই যাহার প্রবলাকর্ষণে আকর্ষিত, যে মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি মিলন-আশায় উন্মত্ত, তাহা কি মনে করিলেই পরিত্যাগ করা যায়? যাহারা আত্মসম্পূর্তি লাভ না করিয়া নারী পরিত্যাগ করে, তাহাদের পতন অনিবার্য; দিনকতক পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আবার আসক্তি জন্মে। বিশ্বামিত্রঋষির তপস্যায় মজ্জাগত হইয়া প্রাণটি মাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছিল, সমস্ত বৃত্তিকে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন অশুভ মুহূর্তে মেনকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিগুলি

জাগিয়া উঠিল, ঋষির পতন হইল। তাই অধুনাতন কোন কবি বলিয়াছেন—

বিশ্বামিত্র-পরাশর প্রভৃতয়ো যে চাম্বুপর্ণাশনাঃ
তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহং গতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা-
স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥

—বিশ্বামিত্র, পরাশর প্রভৃতি যে সকল মহর্ষিগণ জল ও পত্র খাইয়া জীবনধারণ করিতেন, তাঁহারাও যখন স্ত্রীর মুখপদ্ম দর্শন করিয়া আনন্দে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন ঘৃতসংযুক্ত শালি-অন্ন এবং দধি-দুগ্ধ ভোজন করিয়া অন্য মানবগণ যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে পারিত, তবে পঙ্গুও সাগর-লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত।

কথাটা আধুনিক হইলেও ভাবিবার বিষয় বটে। বাস্তবিক স্ত্রী-পুরুষের মিলনেচ্ছা বিধিকৃত, জীবের ইচ্ছাধীন নহে। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে সামরস্য-সম্ভূত আনন্দ আত্মা সম্ভোগ করিয়াছেন, সেই মিলনানন্দ উপভোগের জন্য জীব নিরন্তর ব্যাকুল। তাই রমণী দেখিলে পুরুষ পূর্ব-অনুভূতি স্মরণ করিয়া দানবের দীপ্ত চাহনিতে চাহিয়া থাকে, পতঙ্গের ন্যায় রমণীর রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দেয়। মাতৃশক্তির বিকাশে পিতৃশক্তির এই আকুল আকাঙ্ক্ষা—পিতৃশক্তির এই উন্মাদ কামনা। বালিকাতে মাতৃশক্তির বিকাশ হয় নাই, বৃদ্ধার ঐ শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে, তাই বালিকা বা বৃদ্ধা পিতৃশক্তি আকর্ষণে সমর্থা নহে। যুবতীতেই মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ, তাই পেচকীসদৃশী যুবতীও পুরুষের চক্ষে অনিন্দ্যসুন্দরী। এখন কামিনীর জন্য মানুষ কেন পাগল হয়, কেন উন্মত্ত হয়, বুঝিয়াছ?—এক বিন্দুপদার্থের ধারণাই তাহার কারণ, ঐ রজোবিন্দুর মিলনেচ্ছাই তাহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু মানুষ যে সাধনা করিতে যায়, তাহা জানে না বলিয়াই বিন্দু-পতন হয়। তখন পুরুষ আর নারীর বদন নিরীক্ষণ করিতে চায় না। ক্ষণপূর্বে যে রমণীতে সুধাংশু-সৌন্দর্য দেখিয়াছিল, তাহা এখন রক্ত-ক্লেদ-পরিপূর্ণ মাংসপিণ্ড বোধ হয়। ক্ষণপূর্বে যাহার নিঃশ্বাস সুরভি পবন বলিয়া বোধ হইত, তাহা এখন মরুভূমির তপ্তশ্বাস বলিয়া অনুভব হয়। যে মানুষ মুহূর্তপূর্বে রমণীকে সুখের খনি মনে করিয়াছে, এখন সে আর তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছুক নহে। মুহূর্তে কেন এমন বিষম বিপ্লব, কেন এমন ঘোর পরিবর্তন ? যে উদ্দেশ্যে বিন্দু আসিয়াছিল, যে আনন্দ দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তোমার অনভিজ্ঞতায় মাতৃ-শক্তির সহিত মিলন হয় নাই, তাই সেই মিলনানন্দের কণিকা উপলব্ধি করাইয়া অভিমানে ঝরিয়া পড়িয়াছে। আবার যখন সে শক্তি উত্তেজিত হয়, তখন আবার রমণীতে অমৃতভ্রম জন্মিয়া থাকে। আবার পিতৃ-শক্তির ক্ষয় হইলেই বাসনা নিবিয়া যায়।

ভারতীয় আর্য-ঋষিগণ যোগবলে এই নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্বলিতকণ্ঠ জীবকে অমৃতধারায় স্নিগ্ধ করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিয়াছিলেন, রমণীর আসঙ্গ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিবার শক্তি কাহারও নাই; তাই রমণীকে জননীত্বে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন।* আর যোগিগণ নাদ-বিন্দু সংযোগের প্রণালী অবলম্বনে প্রকৃতির অনলবাহুর হাত এড়াইবার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতি রমণীমূর্তি বা মাতৃশক্তিরূপে সর্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং বাঁধিয়া রাখে। যদি সেই শক্তিকে সাধনাদ্বারা বশ করিয়া তাহাতে আত্মসংমিশ্রণ করিয়া লওয়া যায়, যদি রজোবিন্দুর বা শিব-পার্বতীর

* তন্ত্রশাস্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বের সাধনায় রমণীত্ব জননীত্বে পরিণত হয়। তাহার সাধন-প্রণালী 'তান্ত্রিকগুরু' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

মিলন সংঘটন করিতে পারা যায়, তবে তাহার আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না; যাহার আকর্ষণে জীব নরকের দ্বারের প্রতি ছুটিয়া যায়, সেই আকাঙ্ক্ষার আগুন নিবিয়া যায়, বিন্দু রক্ষা হয়, আর ঐ মিলনে ক্ষণকালের জন্য যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দ স্থায়িভাবে সাধকের হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। কামনার আগুন নিবিয়া গেলেই সাধকের স্বতঃই দিব্যজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা পূর্ণতম ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা একটি ব্রহ্মজ্ঞানীর অনন্ত সাধনা, ইহা পিতৃমাতৃশক্তির সংযোজন বা হরগৌরীর পূর্ণমিলন—আত্মায় আত্মায় মিশামিশি, বিদ্যুতে বিদ্যুতে জড়াজড়ি করিয়া যেমন মিশিয়া যায়, ইহাও সেই প্রকার মিশামিশি। ইহাতে আর বিচ্ছেদ হয় না। দুই শক্তি এক হইয়া আত্মসম্পূর্তি লাভ করে, অপূর্ণ মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তবে এ রসের রসিক না হইলে এ তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না। কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে তাহা অনুভব হইবার নহে। যাঁহারা যোগবলে, সাধনপ্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারেন।

রজঃ ও বিন্দু সাক্ষাৎ শক্তি ও শিব বা প্রকৃতি ও পুরুষ; এই উভয়ের মিলনে জীবের সৃষ্টি। কিন্তু যোগী যদি এই জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই মিলনেই তাহার পূর্ণতা-সংসিদ্ধি বা আত্মসম্পূর্তি ঘটিয়া থাকে। সদাশিব বলিয়াছেন—

অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনাবস্তাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা॥—শিবসংহিতা

—আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তি; সাধনবান্ যোগী এই জ্ঞানে যখন উভয়ের মিলন করিতে পারে, তখন তাহার শরীরে দেবতুল্য কান্তি হয়।

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ॥

—শিবসংহিতা

বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্যময়। অতএব যত্নপূর্বক সর্বদা যোগীর আত্মশরীরে উভয়ের মিলন করা কর্তব্য।

সেই রজোবিন্দুরূপী প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিলন করার নাম নাদ-বিন্দুযোগ। তাহার ক্রম এইরূপ, যথা—

মণিপুরপদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ তাম্রবর্ণ রজঃ আছে। পূরকযোগে কুণ্ডলিনীশক্তির সাহায্যে ঐ রজঃ উত্তোলনপূর্বক সহস্রদল-কমলকর্ণিকা-মধ্যে শুদ্ধ-স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ এবং কোটিসূর্যের ন্যায় তেজোময় যে বিন্দু আছে, তাহার সহিত সংমিলন করিবে।

পূর্বোল্লিখিত অভ্যাসযোগেই তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকেই নাদবিন্দুযোগ বলে। এই সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রকৃতি বশীভূত, আত্মজয় ও আধ্যাত্মিক মরণের ভয় নিবারিত হয়। ইহা যোগীর সূক্ষ্ম সাধনা।

এই প্রণালী ব্যতীত শাস্ত্রে রসতত্ত্ব-সাধনার বা নাদবিন্দুযোগের স্থূল উপায় বর্ণিত আছে। তাহা বাহ্য সাধনা। নারীর সাহায্যে তাহা সম্পাদিত হয়। স্ত্রী পুষ্পিতা হইলে প্রথম তিন দিন এই ক্রিয়া অভ্যাসের উপযুক্ত সময়। ঋতুকালই পূর্ণরসের কাল বা মাতৃশক্তির বিকাশ-কাল। উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ এবং সর্ববিধ পশুতে কেবল ঋতুকালে মাতৃশক্তির বিকাশ; কিন্তু মানবীতে সর্বদাই রসের বিকাশ সুতরাং এখানে মায়ের সর্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)। সর্বদা বিকাশ থাকিলেও ঋতুকালে কেবল উহা অধিক পরিপুষ্ট, অধিক বিকশিত, আর অন্য সময়ে অপেক্ষা-কৃত অল্প বিকাশ। তাই ঋতুর প্রথম তিন দিনই সাধনার উপযুক্ত কাল। ঐ সময়ে সাধক অমরোলীমুদ্রাযোগে যোনিকুহর হইতে লিঙ্গনাল দ্বারা রজঃ আকর্ষণপূর্বক উত্তোলন করিয়া সহস্রারে বিন্দুর সহিত সংমিলিত করিবেন। রজঃশক্তির সাহায্যে বিন্দু স্থিরভাব ধারণ

করে। যেমন বড় তরল—বড় চঞ্চল পারদকে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধকের প্রয়োজন, তদ্রূপ বিন্দুধারণের জন্য রজঃশক্তির আবশ্যক; বিন্দু ও রজঃ একত্র করিলে উহা ধারণ করা যায়। সেই আকাঙ্ক্ষার পদার্থ—চিরবিরহের অমূল্য নিধি প্রাণে আসিয়া সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিয়া থাকে। নতুবা শত চেষ্টাতেও কেহ বিন্দুধারণে সমর্থ হয় না। কারণ স্ত্রীলোকস্মরণমাত্রে বিন্দু চঞ্চল ও বিকৃত হইয়া পড়ে; সাধকের অজ্ঞাতে—অজানিতভাবে কখন বাহিরে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? তাই মাতৃশক্তির সংযোজন দ্বারা পিতৃশক্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই পুস্তকে তাহা খুলিয়া বলা যায় না। এইজন্য শাস্ত্র হইতে মূলমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়ো যোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ॥
স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্ধ্বে নিরোধ্য যোনিমুদ্রয়া॥
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতোঽয়ং পুমাংশ্চালনমাচরেৎ॥
গুরূপদেশতো যোগী হুঙ্কারেণ চ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ॥—শিবসংহিতা

এস্থলে ইহা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা ও রসতত্ত্বের অন্যান্য গূঢ় কথা প্রকাশ করা অসম্ভব। কেননা রসতত্ত্বের সাধন-প্রণালী গুহ্যতম, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা অন্যায়। বিশেষতঃ এই সাধনার বিষয় সাধারণের অশ্লীল বিবেচিত হইতে পারে; হাল-ফ্যাশনের পাশ্চাত্যশিক্ষা-দৃপ্ত সুসভ্য মহাশয়গণ হয়ত কুরুচি-জ্ঞানে পুস্তকখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরল-স্বচ্ছ নাসিকাটি কুঞ্চিত করিয়া বসিবেন। বিষম কাল পড়িয়াছে বলিয়াই ভয় হয়। এখন "উরু" শব্দ উচ্চারণ করিয়া লজ্জায় রসনা দংশন

করিতে হয়, অথচ পিতামাতার সমক্ষে যুবতীর সুগোল ফুল্ল গোলাপীগণ্ডে অধর-সংযোগ সুরুচিসম্মত, পীনস্তনদ্বয় অর্ধ-অনাবৃত রাখিয়া পুরুষের হস্ত ধরিয়া রমণীর নৃত্য সুসভ্য-জনানুমোদিত। সভ্যতার বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা করে! যাহা মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহার শিক্ষা বা তাহার প্রচার সভ্যতাবিরুদ্ধ! পূর্বে সকলেই গুরুগৃহে নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরিশেষে রতিশাস্ত্র পাঠ করিত, এখন উক্ত শাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায়, তাই মানুষ এখন পশুর অধম; কিছুই জ্ঞাত নহে, অথচ পশুর ন্যায় নারীতে আসক্ত। তাই তাহাদের উৎপাদিত সন্তানগণ পাশব প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ দেশে পাপস্রোত বৃদ্ধি করিতেছে। বিদেশী বিধর্মী রাজার কল্যাণে মানুষের মহামঙ্গলপ্রদ শাস্ত্রাদি প্রকাশের উপায় নাই।* কাজেই আমাকে এখানে নিরস্ত হইতে হইল। প্রকৃত সাধক আমার নিকট আসিলে চুঙ্গি সাহায্যে কিরূপে উক্ত ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হয়, তাহার মৌখিক উপদেশ দিতে পারি।

একটি বাজে উপায়দ্বারা অভ্যাসের সাহায্য হইতে পারে। বেগে মূত্রনিঃসরণকালে, গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত করিয়া পূরকযোগে বেগ রোধ করিয়া মূত্রধারা পুনরায় শরীরাভ্যন্তরে আকর্ষণ করিবেন। অবশ্য একদিনে তাহা সম্পন্ন হইবার নহে। সমস্ত শিক্ষাই ক্রমাভ্যাসের ফল। অতএব বিশেষ তাড়াতাড়ি করিলে ইহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটে না। প্রোক্ত অভ্যাসে পারদর্শী হইলে জ্ঞানীব্যক্তি ঐ মূল পাঠ করিয়াও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। কিন্তু সাবধান!—আত্মসম্পূর্তি করিতে গিয়া যেন আত্মহত্যা করিবেন না। কারণ ব্রহ্মগতপ্রাণ প্রকৃত নিষ্কামী সাধক ভিন্ন অন্যে এই তত্ত্বের অধিকারী নহে।

---

* কলিকাতার জনৈক পণ্ডিত কামশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া লালবাজারের পুলিশকোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিন্দুং করোতি সর্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতম্।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্॥
অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ।—শিবসংহিতা

—জরামরণশীল বিমূঢ় সংসারিগণের বিন্দুই সুখদুঃখের কারণ, অতএব যোগিগণের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ এই যোগই শুভকর—তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা ইহাতে প্রকৃতির প্রধান আসক্তির আগুন নিবিয়া যায়—জীব যাহার আকাঙ্ক্ষায় ছুটাছুটি করে, তাহার জ্বালা কমিয়া যায়, জীব তখন জীবন্মুক্ত হয়।*

ভগবান্ সদাশিব বলিয়াছেন—

সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ॥—শিবসংহিতা

—যখন বিন্দুধারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন পৃথিবীতলে কি না সিদ্ধ হয়? যাহার প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার (শিবের) এতাদৃশ মহিমা হইয়াছে।

অতএব পাঠক! ইহা উপন্যাসকারের কল্পনাসম্ভূত প্রেমকাহিনী মনে করিবেন না। অনেকে "পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ" এই বাক্য পাঠ বা শ্রবণ করিয়া মনে করেন, পুত্র না হইলে মানবের মুক্তি হয় না। অবশ্য কোন মহৎ কারণ ব্যতিরেকে সামর্থ্যসত্ত্বে বিবাহদ্বারা প্রজাসৃষ্টি না করিলে ভগবানের আদেশ অমান্য করা হয়। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ যুবা পার্থিব বিবাহের পূর্বেই প্রেমাধার পরমেশ্বরের সহিত সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তিনি যদি তুচ্ছ পার্থিব প্রণয় উপেক্ষা করিয়া চিরজীবন অবিবাহিত থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই। তবে

* এই প্রণালী ব্যতীত বৈষ্ণবশাস্ত্রে ইহার নিগূঢ় সাধন বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্রহ্মগতপ্রাণ প্রেমিক সাধক ব্যতীত অন্যের তাহাতে অধিকার নাই। মৎপ্রণীত 'প্রেমিকগুরু' গ্রন্থে 'শৃঙ্গার-সাধন' 'রসতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধন' প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের গুহ্য সাধনপ্রণালী বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। মোক্ষধর্ম-পরায়ণ ব্রহ্মচারিগণকে নরকের ভয় দেখান দূরে থাকুক, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নারদ, শুকদেবাদি বিবাহ না করিয়াও ত্রিলোকপূজিত হইয়াছেন। মনু বলিয়াছেন—

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিব্যং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥

—মনুসংহিতা ৫।১৫৯

—সহস্র সহস্র অবিবাহিত ব্রহ্মচারী সন্তান উৎপাদন না করিয়া ব্রহ্মচর্যদ্বারা দিব্যগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভগবান্ চৈতন্যদেবও শিষ্যগণকে চিরজীবন অবিবাহিত থাকিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা—

অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥

মহাত্মা ঈশা শিষ্যগণকে বিবাহসম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিলেন।* যাহা হউক অবিবাহিত বা কুমার ব্রহ্মচারী ব্যতীত অন্য গৃহস্থ ব্যক্তিও সত্যবাদী ও জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে এবং ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীগমন না করিলে ব্রহ্মচারিরূপে গণ্য হইতে পারেন। যথা—

ভার্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি বৈ দ্বিজঃ।—মহাভারত

অজপা গায়ত্রী-সাধন

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের লোকের যে অবস্থা, তাহাতে যোগাভ্যাস অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে সন্দেহ নাই, সেই নিমিত্ত তাঁহাদের

* Holy Bible, St. Matthew, XIX. 10, 11, 12 দেখ।

জন্য অজপা-গায়ত্রী সাধন লিখিত হইল। জপের মধ্যে অজপা-জপ শ্রেষ্ঠ সাধনা। সাধক লিখিত কৌশল অবলম্বন করিয়া এই স্বত-উত্থিত অশ্রুতপূর্ব অলোকসামান্য "হংস"ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অপার্থিব পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। অজপা-জপ অর্থাৎ হংসমন্ত্র জপ করিলে সাধকের সোঽহং অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যোগসাধন অপেক্ষা অজপা-গায়ত্রী জপ কোন অংশে ন্যূন নহে। যাঁহাদের সময় অল্প এবং যোগসাধন কঠিন বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা অজপা-গায়ত্রী সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

মূলাধারস্থ পদ্ম ও স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অধোমুখে থাকাতে চিত্রাণী-নাড়ী-মধ্য-স্থিতা ব্রহ্মনাড়ীর মুখও অধোভাগে আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট সার্ধ ত্রিবলয়াকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি একমুখ ঐ ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধপূর্বক নিদ্রা যাইতেছেন ; অন্যমুখ দণ্ডাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, এই মুখদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস হইতেছে। তাহাই জীবের নিশ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাসবায়ুর নির্গমন-কালে হংকার ও গ্রহণকালে সঃকার উচ্চারিত হয়। "সোঽহং-হংস-পদেনৈব জীবো জপতি সর্বদা।" হংস-বিপরীত "সোঽহং" জীব সর্বদা জপ করিতেছে। এই হংসশব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলে।

একবিংশতিসহস্রষট্শতাধিকমীশ্বরি।
জপতে প্রত্যহং প্রাণী সান্দ্রানন্দময়ীং পরাম্॥
বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ।
অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥

যতবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার "হংস" পরম মন্ত্র অজপা জপ হয়, এবং প্রত্যেক মনুষ্যের এক অহোরাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার নিশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ। এই অজপা-গায়ত্রী দ্বারা জীবের আত্মসম্পূর্তি লাভ হয়। "হংস"—'হং' ভিতর হইতে সত্ত্বের অংশ টানিয়া লইয়া বাহিরের জগতে ঢালিয়া দিয়া

প্রকৃতির পরিপুষ্টতা সংসাধিত করিয়া দিতেছে ; আর 'সঃ' বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ভিতরে টানিয়া লইয়া সত্তের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতেছে। 'হং' শিব বা পুরুষ—'সঃ' শক্তি বা প্রকৃতি। হংস শ্বাস-প্রশ্বাসের মিলন—পুরুষ-প্রকৃতির মিলন, সুতরাং আত্মসম্পূর্তি।

এই হংসই জীবের জীবাত্মা। মূলাধার হইতে হংস শব্দ উত্থিত হইয়া জীবাধার অনাহত-কমলে ধ্বনিত হয়। বিনা আঘাতে ধ্বনিত হয় বলিয়া এই পদ্মের অনাহত নাম হইয়াছে। বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া অনাহত হইতে 'হংস' নাসিকা দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হইতেছে। অতএব জীব হইতে স্বতঃই হংসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। হংসবীজ মনুষ্যদেহের জীবাত্মা। এই হংসধ্বনি সামান্য চেষ্টায় সাধকের কর্ণগোচর হয়। এই হংসের বিপরীত 'সোহহং' সাধকের সাধনা। অনাহতপদ্মে জীবাত্মা অহোরাত্র সাধনা বা যোগ বা ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। মানবের তমসাচ্ছন্ন বিষয়-বিমূঢ় মন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সদ্‌গুরুর কৃপায় ইহা জানিতে পারিলে আর মালা-ঝোলা লইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না।

এই অজপা-জপ মোক্ষদায়ক। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কিংবা অর্ধরাত্র-সময়ে অজপা গায়ত্রী সাধন করিতে হয়। তাহার নিয়ম এইরূপ—

সাধক আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুর ধ্যানকরতঃ ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে অনাহত-পদ্মে বাণলিঙ্গ শিবের মস্তকে নির্বাত নিষ্কম্প দীপকলিকাকার হংসবীজ-প্রতিপাদ্য তেজোময় জীবাত্মাকে মানসনেত্রে দর্শন করিয়া হংসধ্যান করিবেন। ধ্যান—

গমাগমস্থং গমনাদিশূন্যং চিদ্রূপরূপং তিমিরান্তকারম্।
পশ্যামি তং সর্বজনপ্রধানং নমামি হংসং পরমার্থরূপম্॥

অনন্তর অজপা জপের অঙ্গন্যাসাদি করিতে হয়।

ষড়ঙ্গন্যাস—ওঁ হং সাং সূর্যাত্মনে তেজোবত্যৈ শক্তয়ে হৃদয়ায় স্বাহা। ওঁ হং সীং সোমাত্মনে প্রভাশক্তয়ে শিরসে স্বাহা। ওঁ হং সূং নিরঞ্জনাত্মনে অবিদ্যাশক্তয়ে শিখায়ৈ স্বাহা। ওঁ হং সৈং নিরাভাসাত্মনে মহাশক্তয়ে কবচায় স্বাহা। ওঁ হং সৌং অনন্তাত্মনে ঈক্ষণশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হং সঃ অনন্তাত্মনে শক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্।

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য অজপা-গায়ত্রীমন্ত্রস্য হংস ঋষিঃ অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দঃ পরমহংসো দেবতা হং বীজং সং শক্তিঃ সোঽহং কীলকং পরমাত্মপ্রীতয়ে উচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাংষট্শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রাজপাজপসমর্পণেন মোক্ষপ্রাপ্তয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি হংসঋষয়ে নমঃ। মুখে অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি পরমহংসায় দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে হং বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ সঃ শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে সোঽহং কীলকায় নমঃ।

অনন্তর সহস্রারে গুরুধ্যান, হৃদয়ে হংসধ্যান এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিয়া পরে তাঁহাদের তেজোময় চিন্তা করিবেন। অতঃপর ঐ তিন তেজের একতা করিয়া ঐ তেজঃপ্রভাবে আপনাকেও তেজোময় ও অভিন্ন ভাবনাকরতঃ অনাহত-পদ্মে জীবাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একশত আটবার বা তদধিক যথাসাধ্য সোঽহং মন্ত্র জপ করিবেন। জপের নিয়ম—'সঃ' শব্দ (উচ্চারণ সময়ে সো) মনে মনে উচ্চারণ করিয়া উভয় নাসাপুটে শ্বাস আকর্ষণ করিবেন। সেই সময়ে চিন্তা করিবেন, নাসাপুট দিয়া ঐ আকৃষ্ট বায়ু নিম্নে নামিয়া এবং কুণ্ডলিনীর মুখ হইতে শ্বাস বহির্গত হইয়া উর্ধ্বে উঠিয়া, উভয় বায়ু একত্রে অনাহত-পদ্মস্থিত জীবাধার বায়ুবীজে (যং) আঘাত করিতেছে। তৎপরে "হং" শব্দ উচ্চারণ করিয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিবেন। এই সময়ে উভয় বায়ু উভয় দিকে চলিয়া যাইতেছে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। উভয় বায়ু একত্র সম্মিলনকালে স্বতঃই সোঽহং উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ উভয় বায়ু

উভয় দিক হইতে আসিয়া বায়ুযন্ত্রে (প্রবেশকালে) সো—হং(নির্গমকালে) ধ্বনিত হইয়া থাকে। আর ইহার বিপরীতক্রমে জপ করিলেই হংস জপ হইয়া থাকে।* এইরূপে জপ করিতে করিতে যখন স্বতঃ উত্থিত অজপা-গায়ত্রী শ্রুতিগোচর হইবে, তখন একমনে ঐ নাদধ্বনি শুনিতে শুনিতে সাধকের সোঽহং (আমিই ব্রহ্ম) জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

উপরোক্তরূপে যথাসাধ্য জপ করিয়া,পরে জপসমর্পণ করিবে বিধিপূর্বক জপসমর্পণ না করিলে সাধকের জপজনিত তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়।

অজপা জপসমর্পণ—মূলাধারমণ্ডপে স্বর্ণবর্ণচতুর্দলপদ্মে দ্রুতসৌবর্ণ-বর্ণ-বাদিসান্তচতুর্বর্ণান্বিতে গায়ত্রীসহিতায় রক্তবর্ণায় গণনাথায় ষট্‌শত-সংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। স্বাধিষ্ঠানমণ্ডপে বিদ্রুমনিভে বিদ্যুৎপুঞ্জ-প্রভাবে বাদিলান্তষড়্‌বর্ণান্বিতে ষড়্‌দলপদ্মে সাবিত্রীসহিতায় ব্রহ্মণে অজপামন্ত্রং ষট্‌সহস্রমহং সমর্পয়ামি নমঃ। মণিপুরমণ্ডপে সুনীলপ্রভে মহানীলপ্রভা-ডাদিফান্তদশবর্ণ-বিভূষিতে দশদলপদ্মে লক্ষ্মীসহিতায় বিষ্ণবে ষট্‌সহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। অনাহতমণ্ডপে তরুণরবিনিভে মহাবহ্নিকর্ণিকাভ-কাদিঠান্তদ্বাদশদলপদ্মে গৌরীসহিতায় শিবায় ষট্‌সহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। বিশুদ্ধ-মণ্ডপে ধূম্রবর্ণ-রক্তবর্ণাকারাদিঅঃকারান্ত ষোড়শস্বরান্বিতে ষোড়শদলপদ্মে প্রাণশক্তি-সহিতায় জীবাত্মনে সহস্রসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। আজ্ঞা-মণ্ডপে বিদ্যুৎপুঞ্জনিভে শুভ্র-হক্ষবর্ণান্বিতে দ্বিদলপদ্মে মায়াসহিত-পরমাত্মনে একসহস্রমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রমণ্ডপে কর্পূরাভে নানাবর্ণোজ্জলদলবিভূষিতে নানাবর্ণসমুদয়োজ্জলে সহস্রারে নাদবিন্দুপরি-স্থিত ব্রহ্মরূপসশক্তিকগুরবে একসহস্রসংখ্যমজপাজপমহং সমর্পয়ামি নমঃ।

* যাঁহারা এইরূপ জপ করিতে অক্ষম, তাঁহারা সাধারণ জপের ন্যায় হংসঃ সোঽহং মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবেন।

অনন্তর "ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্রজপেন পরদেবতারূপঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ প্রীয়তাম্‌" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক মানসিক সঙ্কল্প করিয়া পরদিনের জন্য পুনরায় হংসের ধ্যান করিতে হয়। সেই ধ্যান এইরূপ—

আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং মায়াপুরীহৃদয়পঙ্কজসন্নিবিষ্টম্‌।
শ্রদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাবগাহং নিত্যং সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায় ॥

অজপা-গায়ত্রী দ্বিবিধা—ব্যক্তা ও গুপ্তা। উপরোক্ত প্রকারে জপের নাম ব্যক্তা, আর ভ্রামরী-কুম্ভক-যোগে নিশ্বাস রোধকরতঃ অন্তরে যে জপ করা যায়, তাহাই গুপ্তা।* যাহা গুপ্তা, তাহা অতি গুপ্ত, সুতরাং গুপ্ত রাখাই ভাল। যাহা হউক, লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রত্যহ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এই ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে অচিরেই সাধক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ ও অপার্থিব পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন।

অজপা-গায়ত্রী সিদ্ধি করিয়া তাহার সহিত গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র অথবা অন্য যে কোন মন্ত্র জপ করিলে তাহাও অচিরে চৈতন্য হয় এবং সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ন্যাসাদি না করিয়াও সাধক দিবারাত্র সংসারের কাজ করিতে করিতেও হংসধ্যানে সোঽহং জ্ঞানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন।†

জীবাত্মার দেহত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এই অজপা পরমমন্ত্র জপ হইয়া থাকে। অতএব দেহত্যাগের সময় জানিয়া শেষ "হং"-এর সহিত দেহত্যাগ করিতে পারিলে শিবরূপে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মানন্দ-রস সাধন

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ে যত প্রকার সাধন-ভজনের উপায় প্রচলিত আছে, সর্ববিধ প্রণালীর উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক আত্ম-

---

* এই প্রণালী মৎপ্রণীত 'যোগীগুরু' গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাদসাধন-শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।

† মৎপ্রণীত 'তান্ত্রিকগুরু' গ্রন্থে অজপার সহিত ইষ্টমন্ত্র জপের প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞান লাভ করা। ইন্দ্রিয়পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বহু-স্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি প্রযত্নের দ্বারা, পথরোধের দ্বারা একত্র করা যায়, ক্রম-সঙ্কোচপ্রণালীতে পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত চিত্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্তুর সমস্তই তাহার প্রকাশ্য হইবে। যেমন বিস্তৃত, তরল বা বিরলাবয়ব সূর্যকিরণ —যাহাকে আমরা প্রভা বা আলোক বলি—সে কাহাকেও দগ্ধ করে না, প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়; কিন্তু কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোকরাশিকে যদি কেন্দ্রীকৃত করা যায়, ঘন বা পুঞ্জীকৃত করা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, সেই সূর্যা-লোকসমূহের পুঞ্জনস্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলয়াগ্নির ন্যায় দাহিকাশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। আতশ-পাথরের নিম্নে তুলা অথবা শুষ্ক তৃণ রাখিলে ঐ তুলা বা তৃণে আগুন ধরিয়া যায়। আবার সময় সময় আগুন ধরিতে বিলম্ব হয়, কারণ উহার Focus (ফোকাস) ঠিক হয় নাই বলিয়া আগুন ধরে না। ঐরূপ হইলে পাথরখানিকে অল্পে অল্পে হয় উপরের দিকে না হয় নিম্নের দিকে লইবে, তারপরে যখন ঐ পাথরের Focus ঠিক হইবে, তখনই নিম্নের তুলা বা তৃণে আগুন ধরিয়া যাইবে। পাথরের কোন্ শক্তিতে বা সূর্যকিরণের কোন্ ক্ষমতায় সহসা আগুন হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখ বিরলাবয়ব সূর্যকিরণ আতশপাথরের শক্তিতে এককেন্দ্রিক হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটি অগ্নিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং কেন্দ্রস্থানস্থিত দাহ্যবস্তুমাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। তেমনি ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহস্রমুখী চিত্তবৃত্তিকে এককেন্দ্রিক করিতে পারিলেই সমস্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। আর্যঋষিগণ আতশপাথরের দ্বারা সূর্যকিরণ কেন্দ্রীকৃত বা পুঞ্জীকৃত করিয়া তদ্দ্বারা তৃণপুঞ্জ দগ্ধ হইতে দেখিয়া সর্বব্যাপী চিত্ত-বৃত্তিকে এককেন্দ্রিক করিয়া তদ্দ্বারা যোগের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ব্যবহৃত-

বিজ্ঞান ও অতীতানুগত-বিজ্ঞান আবিষ্কারপূর্বক প্রকৃষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা—

যথাহর্করশ্মিসংযোগাদর্ককান্তো হুতাশনম্।
আবিঃকরোতি তুলেষু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ॥

—সূর্যরশ্মিসংযোগে সূর্যকান্তমণি বহ্নি আবিষ্কার করে, ইহা দেখিয়া যোগিগণ সর্বজ্ঞত্ব শিক্ষা করিয়াছেন।*

বাস্তবিক চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলে মানবজীবন সার্থক; এবম্ভূত সাধকের সর্বসিদ্ধি করতলগত। বাটীতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাসী বন্ধুকে চিন্তা করুন। বন্ধু যত দূরদেশেই অবস্থান করুন, মুহূর্তে নয়নগোচর হইবে। এইরূপ দেবদেবী বা দেবলোক দর্শন করা যায়। জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে শরীরস্থ রূপরসাদি মিশাইতে পারিলে অনন্তের প্রতীতি হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য নরনারীগণ সাধনায় একাগ্রতা-শক্তি (Will force) লাভ করিয়া জগতের নরনারীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত-করিয়া দিতেছেন। ম্যাডাম্ ব্লাভাটাস্কি, কর্ণেল অলকট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ

* আমাদের পূর্বপুরুষগণের এই সকল মহৎ কীর্তি ও অদ্ভুত আবিষ্কার আজকাল অনেকেই জ্ঞাত নহে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ ঘুড়ির লকে বিদ্যুতের আবেশ দেখিয়া তাড়িত-বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন, রন্ধনস্থালীর মুখের শরাব বাষ্পবলে উৎপাটিত হইতে দেখিয়া ষ্টিম্ ইঞ্জিনের সৃষ্টি করেন, পক্বফলের পতন দর্শনে মাধ্যাকর্ষণ অবগত হইয়াছেন; পাশ্চাত্যশিক্ষিত যুবক, ইংরাজের এই অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া অবগত হইয়া শতমুখে তাঁহাদের গুণগান করিতে আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত হিন্দুকুলে জন্ম হওয়ায় অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতে ব্যস্ত। ঘরের খবর জানে না বলিয়াই তাহাদের আক্ষেপ করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয়। বাহ্যবিজ্ঞান দূরের কথা, আর্যগণ কত অগণিত অজ্ঞানিত নূতন নূতন সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া আরও প্রকৃষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা যতই সে সকল বিষয় অবগত হইতেছি, ততই পূর্বপুরুষগণের মহিমা জ্ঞাত হইয়া আনন্দে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে।

এতদ্দেশে আসিয়া কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন, অনেকে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

চিত্তের একাগ্রতাসাধনই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিতে পারিলেই মানবজীবনের পূর্ণত্ব। যিনি ভাগ্যক্রমে পূর্বজন্মের সুকৃতিবলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনে সক্ষম, তাঁহার প্রাণসংরোধরূপ কঠোর যোগাভ্যাসের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। কেবল আত্মজ্ঞানের জন্য ব্রহ্মবিচারদ্বারা জ্ঞান অর্জন করিবেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভবের জন্য ব্রহ্মানন্দ-রস সাধন করিবেন। যথা—

সাধক আপনাকে (জীবাত্মাকে) শক্তি (রাধা বা দুর্গা) এবং পরমাত্মাকে পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ বা সদাশিব) ভাবনা করিবেন। স্ত্রী-পুরুষবৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গাররসপূর্ণ বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবেন এবং এতাদৃশ সম্ভোগ হইতে উৎপন্ন পরমানন্দরসে মগ্ন হইয়া পরব্রহ্মের সহিত স্বয়ং অভেদরূপে পরম প্রেমে প্রলীন জ্ঞান করিবেন। সেই সময় এইরূপ চিন্তা করিবেন—

অহমাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্।
বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম সতত্ত্বমসি কেবলম্॥
অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্ম অশরীরমনিন্দ্রিয়ম্।
অহং মনোবুদ্ধির্মরুদহঙ্কারাদি-বর্জিতম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিমুক্তং জ্যোতিস্তদীয়কম্।
নিত্যশুদ্ধং বুদ্ধিমুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ম্॥
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমখণ্ড ওঁ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাধক সমাধিস্থ হইবেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে পর আর অন্তর-বাহ্যে ভ্রান্তিদর্শন হয় না এবং তখনই ব্রহ্মানন্দ-রসের উপভোগ হইয়া থাকে। এই সাধনায় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের চিত্ত স্থির ও শান্ত নহে, তাঁহারা প্রথমে পূর্বোক্ত যে কোন যোগ অভ্যাস করিয়া পরে ব্রহ্মানন্দরসের সাধন করিবেন।

বিভূতি-সাধন

যোগসিদ্ধ হইলে সাধকের নানাবিধ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিতপ্রাণ, আমাতে (পরমেশ্বরে) চিত্তধারণকারী যোগীর নিকটে যাবতীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়।" যথা—

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেত উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥—ভাগবত ১১।১৫।১

আমরা কল্পনাসাহায্যে যাহা যাহা আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি, যোগবলে তাহার সবগুলিই লাভ হইয়া থাকে। সরলভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মানবাত্মা যখন পরমাত্মার অংশ, তখন পরমাত্মার যে যে গুণ ও শক্তি আছে, মানবাত্মারও তাহাই থাকা উচিত। তবে উভয়ের এত তারতম্য লক্ষিত হয় কেন?—স্থান ও অবস্থাভেদে কেবল এই তারতম্য জন্মে। মেঘের জল, সরোবরের জল, নদীর ও সমুদ্রের জল, সকল জল এক জল হইলেও প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ বিভিন্নতা আছে; সেইরূপ পরমাত্মা ও মানবাত্মার মূল এক হইলেও স্থানবিশেষে স্থাপিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মানবশরীরের মধ্যে আবদ্ধ হইলে আত্মার এক ভাব, মানবশরীরের বাহিরে থাকিলে তাহার অন্য এক ভাব। যখন ইহাই প্রকৃত ব্যাপার, তখন কোনরূপে মানবাত্মাকে মানবশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, মানবাত্মা যে পরমাত্মার শক্তি প্রাপ্ত হইবেন,

তাহাতে আর আশ্চর্য কি? যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য, মানবাত্মাকে মানবশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করা। যখন যোগবলে ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন মানবের ঐশ্বরিক শক্তি-সকল লাভ করা কোন মতেই অসম্ভব নহে। একবার কোনও ক্রমে মানবাত্মাকে মানবশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই মানবাত্মা ঠিক পরমাত্মার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগের ইহাই উদ্দেশ্য।

শরীরে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই প্রধান। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পৃথিবীর সকল পদার্থের অনুভূতি লাভ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা ইহাও জানি যে চক্ষু না থাকিলেও দেখা যায়, কর্ণ না থাকিলেও শুনা যায়, জিহ্বা না থাকিলেও আস্বাদ পাওয়া যায়, নাসিকা না থাকিলেও গন্ধ পাওয়া যায় এবং ত্বক্ না থাকিলেও স্পর্শ অনুভব করা যায়। স্বপ্নে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য হইতে দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শরীর না থাকিলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। স্বপ্নদ্বারা আমরা সময় সময় আরও একটি বিষয় দেখিতে পাই। স্বপ্নে মানবের দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যৎজ্ঞান জন্মে। ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটিবে, তাহা অনেক সময় আমরা স্বপ্নে বহুপূর্বে জানিতে পারি, অথবা দূর ভবিষ্যতে যাহা হইবে হয়ত তাহা বহু পূর্বে ঘটিতেছে বলিয়া অনুভব করি।*

---

* বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" নামক পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম "স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা মাত্র।" তদবধি স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিমাত্রকেই উক্ত বাক্যে প্রবোধ দিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিতাম; কারণ স্কুলপাঠ্য পুস্তকের কথা মিথ্যা হইতে পারে না, এই বিশ্বাস অভ্রান্তজ্ঞানে হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। কিন্তু কার্য-কারণের প্রত্যক্ষতাফলে এখন উক্ত বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, সে অপূর্ব বিশ্বাস উড়িয়া গিয়াছে। কেননা আমার ভাগ্যে অনেক সময় স্বপ্নফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং স্বচক্ষে কয়েকজনকে স্বপ্নে ঔষধ পাইয়া রোগমুক্ত হইতে দেখিয়াছি। খুলনা জেলাবাসী কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিয়া দুই মাইল দূর হইতে বাটী আসিয়া সিঁদমুখে চোর ধৃত করে। সুতরাং দুগ্ধপোষ্যশিশুপাঠ্যে আর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

ইহাতে এই পর্যন্ত বুঝা যায় যে, শরীরের সহিত মানবাত্মা যৎকিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব যোগবলে মানবাত্মাকে সম্পূর্ণভাবে শরীর হইতে বিযুক্ত করিতে পারিলে সর্ববিধ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করা কোনমতেই অসম্ভব নহে।

যোগে বিভূতিলাভ, যোগের সম্পূর্ণ সাধনার পরে যে ঘটে, এরূপ নহে। যোগপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি করিয়া ক্ষমতা লাভ হইতে থাকে—এমন কি প্রথম সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষমতা আপনা-আপনিই লাভ হইতে থাকে। আসন-সাধনায় আরও কয়েকটি শক্তি লাভ হয়, প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে মানব অসীম-শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। যোগের উদ্দেশ্য মুক্তি বটে, কিন্তু এই মুক্তিলাভের বহুপূর্বেই বিভূতিলাভ হইয়া থাকে। এই সকল শক্তিলাভ এতই মনোরম, এতই লোভপ্রদ এবং এতই সুখদায়ক যে, অনেক যোগী এই সকল ক্ষমতা ও শক্তিলাভ করিয়া, যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য যে মুক্তিলাভ তাহা বিস্মৃত হইয়া এই সকল শক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যগ্র হন ; ফলে তিনি যোগভ্রষ্ট হইয়া যান। কেহ বা একটি ক্ষমতা লাভ করিয়া, কেহ বা দুইটি, কেহ বা ততোধিক ক্ষমতা লাভ করিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়া যান ; তাঁহাদের আর মুক্তিলাভ ঘটে না। সংসারে তাঁহারা যোগলব্ধ সেই দুই-একটি শক্তি ব্যবহার করিয়া, ভোজবাজীকরের ন্যায় লোককে আশ্চর্যান্বিত ও মুগ্ধ করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাচ বিভূতিলাভকেই যোগফলের চরমোৎকর্ষ মনে করিবেন না। যোগের চরম উদ্দেশ্য মুক্তি ; বিভূতিলাভে ভুলিয়া গেলে মোক্ষ বা কৈবল্যলাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। আসক্তিশূন্য হইতে গিয়া আবার যেন আসক্তির আগুনে দগ্ধ হইতে না হয়।

তবে যিনি শক্তিলাভ করিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার প্রাণায়াম পর্যন্ত সাধন করিলেই চলিতে পারে। প্রাণায়াম সাধনা করিয়া সংযম অভ্যাস করিলেই তাঁহার বহুবিধ শক্তি লাভ হইবে এবং

তৎপরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিসাধনে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তিলাভ উদ্দেশ্য না থাকিলেও যোগে বিভূতিলাভ হইতে পারে।

যোগসাধন দ্বারা সাধক বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারেন, সমস্ত রস আস্বাদন করিতে পারেন ; বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের উপরে অসাধারণ কর্তৃত্ব করিবার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন ; সেই ক্ষমতাবলে যোগীর বহুপ্রকার অদ্ভুত অভাবনীয় শক্তি জন্মে ; বাক্‌সিদ্ধি ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন, পরশরীরে প্রবেশ, অন্তর্ধান, অন্তর্যামিত্ব, শূন্যপথে অবিরোধে ও অনায়াসে বিচরণ, কায়ব্যূহ ধারণ, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ, দেবত্বলাভ এবং মৃত্যুজ্ঞান হয়।*

যোগের আরম্ভ হইতে তাহার পূর্ণতাকালের মধ্যে চারিটি ভাগ বা অবস্থা আছে। চারিটি অবস্থার নাম—প্রথমকল্পী, মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয়।

যোগ আরম্ভ করিয়া যখন বিশেষ সিদ্ধিলাভ হয় নাই, সংযমে রত থাকিয়াও বিশেষরূপে কার্য সম্পন্ন হয় নাই, তখন তাহাকে প্রথমকল্পী অবস্থা বলা যায়। এই সময়ে যোগী সংযমকালে বিশেষ কোন অলৌকিক পদার্থ সন্দর্শন করিতে সক্ষম হন না, কেবলমাত্র অত্যল্প আলোক কিংবা সামান্য জ্ঞানবিকাশ উপলব্ধি করেন মাত্র।

এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে যে অবস্থা আসে, তাহার নাম মধুমতী। মধুমতী অবস্থায় উপনীত হইলে যোগিব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন ও সর্বভাবের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন।

---

* অনূর্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন্ দূরশ্রবণদর্শনম্। মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনম্॥ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনম্। যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতা গতিঃ॥ ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা। অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোঽপরাজয়ঃ॥ এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তা যোগধারণসিদ্ধয়ঃ।—ভাগবত, ১১।১৫।৬-৯

এই দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার নাম প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ। এই অবস্থায় দেবতা ও সিদ্ধপুরুষ-সাক্ষাৎকার হয়।

চতুর্থ অবস্থার নাম অতিক্রান্তভাবনীয়। এই অবস্থায় যোগিগণ অত্যধিক বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হন এবং বিবেকজ্ঞানের অবান্তর ফলের প্রতি বিরক্ত ও জীবন্মুক্ত হন।

কেবল বিভূতিলাভ বা অমানুষী শক্তিলাভই যাঁহাদের লক্ষ্য, যোগমার্গে সংযম তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। সংযম কি—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটির একত্র প্রয়োগ। প্রথমে ধারণা, পরে ধ্যান ও সমাধি। যখন মন বস্তুর বাহ্যভাগকে পরিত্যাগ করিয়া উহার আভ্যন্তরিক ভাবগুলির সহিত নিজেকে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল সেইটিই ধারণা করিয়া মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ করে, তখন তাহাকেই সংযম বলে। সংযমের দ্বারা সাধকের কিছুই অসাধ্য থাকে না। সামান্য শক্তি হইতে মহাশক্তি-সাধনা পর্যন্ত সকলই এই সংযমের অন্তর্গত। তবে উহা সামান্য হইতে মহতে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে অভ্যাস করিতে হয়। সংযমবিজয়ে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়। সংযমদ্বারা যে যে বিভূতি লাভ হয়, পাতঞ্জলদর্শন হইতে তাহার আভাস প্রদত্ত হইল।

অষ্টসিদ্ধি

অনাহত-পদ্মে সংযম করিলে অর্থাৎ ঐ পদ্ম মানসনেত্রে দর্শন করিয়া ধ্যান করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি বা অষ্টৈশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। অষ্টৈশ্বর্য যথা—

অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিপ্রেরণমীশিতা॥

গুণেষসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

—ভাগবত, ১১।১৫।৪-৫

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব এই অষ্টবিধ সিদ্ধিই অষ্টৈশ্বর্য।

অণিমা অর্থে বৃহৎ শরীরকে অণুর ন্যায় করিবার শক্তি; মহিমা—শরীরকে বা যে-কোন অঙ্গকে ইচ্ছামত বৃহৎ করিবার শক্তি; লঘিমা—শরীরকে ইচ্ছানুসারে লঘু বা হাল্‌কা করা; প্রাপ্তি—জগতের সমস্ত দ্রব্য লাভের ক্ষমতা; প্রাকাম্য—দৃষ্টাদৃষ্ট সমস্ত পদার্থের ভোগ ও দর্শনাদি করিবার শক্তি; ঈশিত্ব—সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা; বশিত্ব—সকলকে স্ববশে রাখিবার শক্তি; কামাবসায়িত্ব—সকল প্রকার মনোরথসিদ্ধি, সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ যেমন সঙ্কল্প তেমনি কাজ।

দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক এই তিন প্রকারের অষ্টৈশ্বর্য লাভ হইয়া থাকে। সংযমাবলম্বনে ভূতজয়ী হইলেই অণিমা, মহিমা লঘিমা ও প্রাপ্তি এই চারিটি ঐশ্বর্য লাভ হয়। আর সংযমদ্বারা ভূতের স্বরূপ অবস্থা সাক্ষাৎকৃত হইলে প্রাকাম্য ঐশ্বর্য লাভ হয়। ভূতসমূহের সূক্ষ্ম অবস্থা প্রত্যক্ষগোচর হইলে বশিত্ব লাভ হয়। ভূতগ্রামে অন্বয়রূপ পরিদৃষ্ট হইলে ঈশিত্ব এবং অর্থবত্ত্বরূপ জিত হইলে কামাবসায়িত্ব লাভ হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে এই অষ্টমহৈশ্বর্য স্বতঃসিদ্ধভাবে অবস্থিত আছে; সাধনবলে ঐসকল মানুষেও লাভ করিতে পারে। একজনে দুই-একটি বা ততোধিক ঐশ্বর্য লাভ করিতে পারে; আর সবগুলি লাভ করিতে পারিলে ভগবানের তুল্য হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রে ভগবানের এইরূপ সংজ্ঞা লেখা আছে—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য "ভগ"শব্দপ্রতিপাদ্য। এই ষড়্‌বিধ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে ও অপ্রতিবন্ধরূপে যাঁহাতে নিত্য বর্তমান আছে, তিনিই ভগবান্।

যোগিগণ এই ঐশ্বর্যলাভের জন্য চেষ্টা করেন না, আপনিই হয়ত ফুটিয়া উঠে। স্বরশাস্ত্রমতে যিনি নিঃশ্বাসের স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুল বহির্গতি হইতে আট আঙ্গুল কমাইয়া চতুরঙ্গুলি করিতে পারেন, তিনিই অষ্টৈশ্বর্য লাভ করিতে পারেন, যথা—

অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধয়ো নব।*

—পবনবিজয়-স্বরোদয়

অন্যান্য বিভূতি-সিদ্ধি

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্। —সংযমবলে ধর্মাধর্ম বা পাপপুণ্য কর্মসংস্কার-সাক্ষাতে পূর্বজন্ম জ্ঞান হয় অর্থাৎ চিত্তসংস্কারের প্রতি সংযম করিলে পূর্বাচরিত কর্ম ও পূর্বজন্ম অবগত হওয়া যায়। **কায়-রূপসংযমাত্তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্।** —দর্শন ব্যাপারে সংযমপ্রয়োগে চাক্ষুষ শক্তি স্তম্ভিত করিয়া অন্তর্হিত হওয়া যায়। দর্শন কি?—দ্রব্যের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযোগ। অতএব চক্ষু ও দৃশ্যদ্রব্যের মধ্যে দৃষ্টিস্তম্ভন-সংযমপ্রয়োগে লোকসমক্ষে অদৃশ্য হওয়া যায়। **বলেষু হস্তিবলাদীনি।**—সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বলবান্ জীবের বলে সংযম প্রয়োগ করিলে তাহাদের ন্যায় অমানুষিক বল লাভ করা যায়। **ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ।** —সূর্যে সংযম প্রয়োগ করিলে ত্রিজগতের জ্ঞান লাভ হয়। **নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্।**—নাভিচক্রে সংযম প্রয়োগ করিলে সমগ্র শরীরের

* মৎপ্রণীত "যোগীগুরু" পুস্তকের স্বরকল্প দেখ।

জ্ঞান জন্মে। **মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্।**—ব্রহ্মরন্ধ্রপথে বিমল আলোকে সংযম প্রয়োগ করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। **বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ।**—চিত্ত ও শরীরের বন্ধনের কারণ জানিয়া, উহা শিথিল করিতে পারিলে পরশরীরে প্রবেশ করা যায়। **শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্।**—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর আরোপজন্য একরূপ সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে, সমুদয় ভূতের শব্দজ্ঞান জন্মে। **উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ।** —উদান-বায়ু জয় হইলে জল, পঙ্ক ও কণ্টক প্রভৃতিতে নিমগ্ন হইতে হয় না। **প্রাতিভাদ্বা সর্বম্।**—প্রাতিভজ্ঞান লাভ হইলে সর্বজ্ঞত্ব জন্মিয়া থাকে। **সমানজয়াজ্জ্বলনম্।**—সমান-বায়ু বিজয়ে ব্রহ্মতেজ জন্মে। **হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ।**—হৃদয়ে সংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞান হয়। **শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্দিব্যং শ্রোত্রম্।**—কর্ণ ও আকাশ উভয়ের সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগে দিব্য শ্রোত্র লাভ হয়। **কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ।**—কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে ক্ষুধা এবং পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। **ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্।**—ক্ষণ এবং তাহার ক্রমে সংযম করিলে বস্তুবিবেক-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। **গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ।**—ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থ—এই পাঁচ প্রকার রূপ বা ঐশ্বর্য আছে, সংযম-দ্বারা সেই সকল রূপ জয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষকৃত হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয়। **প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।**—অন্যের শরীরে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহা দর্শন করিয়া তদুপরি সংযম প্রয়োগ করিলে, তাহার মনের ভাব জানা যায়। **কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতুলসমাপত্তে-**

শ্চাকাশগমনম্।—শরীর এবং আকাশ—এতদুভয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপরে সংযম করিলে আকাশে গমনাগমন করিতে পারা যায়। কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্।—কূর্মনাড়ীতে সংযম করিলে দেহের স্থৈর্য হয়। সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম তৎসংযমাদপরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা।—সোপক্রম (প্রারব্ধ কর্ম) এবং নিরুপক্রম (সঞ্চিত কর্ম) এই দুই প্রকার কর্মের উপর অথবা অরিষ্ট নামক লক্ষণসমূহের উপর সংযম প্রয়োগ করিলে দেহত্যাগের সময় জানিতে পারা যায়। ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্।—ধ্রুবনামক নক্ষত্রে সংযম প্রয়োগ করিলে নক্ষত্রসমূহের স্বরূপ ও গতি জ্ঞান হয়। প্রোক্ত বিভূতিলাভ ব্যতীত যোগীর কায়সম্পৎ লাভ হইয়া থাকে। রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ।—রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রতুল্য দৃঢ় শরীর এবং বেগশীলতা প্রভৃতি শারীরিক গুণবিশেষের নাম কায়সম্পৎ। ব্রহ্মজ্ঞানহীন অমুক্তব্যক্তিগণ যোগাভ্যাস দ্বারা এই সকল বিভূতি লাভ করিতে পারে। যথা—

যস্তু চাভাবিতাত্মাপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি।
স সিদ্ধিসাধকৈর্দ্রব্যৈস্তানি সাধয়তি ক্রমাৎ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

—যে অজ্ঞান ব্যক্তি পরমাত্মার ভাবনা না করিয়া সিদ্ধি বাঞ্ছা করে, সেই সাধকও সাধনাদ্বারা সেই সকল (বিভূতি) লাভ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞ, তাঁহার এই সকল অবিদ্যা সাধ্য নহে। যথা—

আত্মনাত্মনি সংতৃপ্তে নাবিদ্যামনুধাবতি।—যোগবাশিষ্ঠ

—আত্মজ্ঞ ব্যক্তি মনদ্বারা সদা পরমাত্মাতে তৃপ্ত থাকিবেন, তিনি কখনও অবিদ্যার অনুসরণ করিবেন না।

অথবা এ সকলের দ্বারা বুজরুকি দেখাইয়া নাম জাহির করিতে চেষ্টা বা ইচ্ছা করাও কর্তব্য নহে। ঐরূপ ক্ষমতা লাভ হইলেও তাহা নগণ্য

জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার লক্ষ্য কৈবল্য।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।

সত্ত্ব ও পুরুষের যখন সমভাবে শুদ্ধি হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। যখন আত্মা অবগত হইতে পারেন যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অণু হইতে দেবতাগণ পর্যন্ত কাহারও উপরে তাঁহার নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই, তখনকার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা বলা যাইতে পারে।

জীবন্মুক্ত অবস্থা

যোগ, যাগ, তপ, জপ সমস্তই কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের জন্য। জ্ঞানোদয় হইলে ভ্রমরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই মায়া, মমতা, সুখ, দুঃখ, শোক, ভয়, মান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মদ, মোহ, মাৎসর্য ও দয়া প্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলির নিরোধ হইয়া যাইবে। তখন কেবল বিশুদ্ধ-চৈতন্য মাত্র স্ফূর্তি পাইতে থাকিবে। এইরূপ কেবল চৈতন্য স্ফূর্তি পাওয়া জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি ও অন্তে নির্বাণপ্রাপ্তি বলিয়া কথিত হয়।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোক আচরেৎ ॥—শ্রুতি

—আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইয়া সর্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয়; অর্থাৎ তখন আর দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। সুতরাং আত্মাকে অদ্বৈতরূপে জানিতে পারিলেই "সোঽহং" অর্থাৎ আমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান হয়। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তখন আর লৌকিক ব্যবহারসকল থাকে না।

নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।

চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ॥—শ্রুতি

তত্ত্বজ্ঞ যতিব্যক্তি কাহাকেও স্তুতি বা নমস্কার করেন না; স্বধা, স্বাহা শব্দাদি প্রয়োগপূর্বক পিতৃকার্যাদিও করেন না। তিনি দেবপূজাদিও করেন না। তিনি দেবপূজাদি সর্বপ্রকার কর্মযোগ পরিত্যাগ করেন। তখন পারমহংস্য প্রব্রজ্যাদি ধর্ম গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করেন। তখন জ্ঞান হয়—"চলং শরীরং প্রতিক্ষণমন্যথাভাবাৎ"—দেহের সর্বদাই অন্যথাভাবহেতু দেহ চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে; "অচলম্ আত্মতত্ত্বম্"—আত্মা অচল অর্থাৎ চিরকালই একভাবে থাকেন। এজন্য আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানপারদর্শী যতিব্যক্তি যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ অযত্নলভ্য কৌপীনাদি ও একগ্রাস মাত্র ভোজনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥—গীতা, ২।৫৬

—দুঃখে-কষ্টে যাঁহার মন বিষাদিত না হয় আর সুখভোগেও যাঁহার স্পৃহা না থাকে এবং অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাঁহাকেই যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলা যায়।

ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। যথা—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়ান্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তঃ উচ্যতে॥—যোগবাশিষ্ঠ

—যে ব্যক্তি হইতে লোকের উদ্বেগ না হয় এবং লোকসকল হইতে যিনি উদ্বিগ্ন না হন, আর যিনি হর্ষ, ক্রোধ এবং ভয় হইতে মুক্ত, তিনিই।

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জনৈঃ।

সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥—বিবেকচূড়ামণি

—সাধুগণ কর্তৃক পূজিত হইলে অথবা দুর্জনগণ কর্তৃক পীড়া প্রাপ্ত হইলে যাঁহার চিত্ত উভয় অবস্থাতেই সমভাবে অবস্থিতি করে, তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষের লক্ষণবিশিষ্ট।

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাবে গুণবর্জিতে।
ব্রহ্মজ্ঞানরসাস্বাদে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥—জীবন্মুক্তি গীতা

—যিনি স্বাভাবিক গুণবর্জিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ রসাস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদাই একাকী অবস্থিতি করিতে ভালবাসেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

যশঃপ্রভৃতিকো যস্মৈ হেতুনৈব বিনা পুনঃ।
ভোগ ইহ ন রোচন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥—যোগবাশিষ্ঠ

—রোগাদি হেতুব্যতিরেকে স্বভাবতঃ যশঃ, পুণ্য, ঐশ্বর্যাদি ভোগে যাঁহার রুচি না হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত।

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥—জীবন্মুক্তি গীতা

—সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্যস্বরূপ জগদীশ্বর, তাঁহাকে যিনি সমুদয় জীবের অন্তরাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন।

চিদাত্মন ইমা ইত্থং প্রস্ফুরন্তীহ শক্তয়ঃ।
ইত্যস্যাশ্চর্যজালেষু নাভ্যুদেতি কুতূহলম্॥—যোগবাশিষ্ঠ

—জগতে যত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে, সকলই চিদাত্মার শক্তি, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা জীবন্মুক্তব্যক্তির কোন আশ্চর্য বিষয়ে কৌতূহল হয় না।

জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥—জীবন্মুক্তি গীতা

—এই জীবই শিবস্বরূপ, তিনি সর্বত্র সর্বভূতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন। এরূপ দর্শনকারী ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

তত্ত্ববিচার এবং নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানদ্বারা আবরণশক্তিসম্পন্ন তমোরাশি ক্রমশঃ বিদূরিত হইলে হৃদয়াকাশ নির্মল হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। যথা—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্মলাত্মনাম্॥

—মহানির্বাণতন্ত্র, ১৪।১১২

যোগসাধন দ্বারা সাধক, হৃদয়স্থিত দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত ষট্‌চক্র ভেদপূর্বক শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদল-কমলকর্ণিকা-মধ্যগত পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া তদীয় ক্ষরিত সুধা পান করাইয়া পরমানন্দ ও পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি সমাধি অবস্থায় এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ-রূপ দেখিয়া তাঁহাতে দৃঢ়ভক্তি ও অহেতুক-প্রেমসম্পন্ন হন। তখন সাযুজ্য বল, সারূপ্য বল, আর যাহা বল সমস্তই লাভ হয়। তখন সেই শ্যামসুন্দর চিদ্‌ঘনরূপ আর ভুলিতে পারা যায় না। তখন বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, পুত্রকলত্র ধনৈশ্বর্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে; চন্দ্র, সূর্য, রূপ, রস কিছু নহে, মদন, বসন্ত, মলয়, কোকিল কিছু নহে। তখন যোগী আদি-অন্ত-মধ্যহীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারেন,—যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত উরু, যাঁহার দীপ্তি কোটিসূর্যপ্রভ, যাঁহার স্থিতি ত্রিকালব্যাপী, সুরাসুর নর-নাগ যাঁহার ভগ্নাংশের অন্তর্ভূত, প্রলয়সংক্ষোভ যাঁহার বিশোদরে, দংষ্ট্রাকরালতা যাঁহার কোটিমুখে, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু যাঁহার নিশ্বাসে, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া যাঁহার শক্তি, সেই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ সুন্দর। সুন্দরের প্রেমে অসুন্দর ভাসিয়া যায়, সত্যস্বরূপের সত্যজ্ঞানে অসত্য দূরে যায়—কামনা-বাসনার খাদ গলিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রকৃতি-পুরুষের মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যায়।

এইরূপ দর্শন ঘটিলে সাধক জীবন্মুক্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞান-বিচারকারী কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ মনুষ্যের দেহত্যাগে যে মুক্তি হয়,সেই মুক্তি জীবদ্দশাতেই লাভ হয়। যথা—

নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহামুক্তৈব যা॥

—যোগবাশিষ্ঠ

ইহলোকে যিনি জীবন্মুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী। নতুবা ইহলোকে যে অজ্ঞানান্ধ, পরলোকে সে ততোধিক। অতএব পাঠক! পরলোকে পরমাগতি লাভ হইতে পারে এই ভাবিয়া নিশ্চিন্তে কালক্ষয় করিবেন না; সকলেরই সাধনাদ্বারা জীবন্মুক্ত হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।*

যোগবলে দেহত্যাগ

রোগশয্যায় শায়িত হইয়া রোগযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া কিংবা দৈব-দুর্বিপাকে মৃত্যুর কবলিত না হইয়া যোগিগণ যোগবলে দেহত্যাগ করেন, ইহাতে বিশ্বাস না থাকিলেও হিন্দুমাত্রই ইহা অবগত আছেন। যদুবংশ ধ্বংস হইলে রেবতীরমণ বলদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, বিদুর উদ্ধবের নিকট ইচ্ছামরণ শিক্ষা করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবীর সহিত হিমাচলে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাপাপী দুরাচারব্যক্তিও যোগবলে দেহত্যাগ করিতে পারিলে মহামুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তাহার প্রক্রিয়া এইরূপ—

* মৎপ্রণীত "প্রেমিকগুরু" গ্রন্থে মুক্তি ও তাহার সাধন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের জীবন্মুক্তি অধ্যায় দেখ।

যোগী সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া নবদ্বার রোধ করিবেন। অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা কর্ণবিবরদ্বয়, তর্জনী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা উভয় নাসাপুট এবং অনামিকাদ্বয় ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা মুখবিবর রোধ করিয়া গুল্‌ফদ্বয় দ্বারা গুহ্যস্থান পীড়ন করিবেন। তৎপরে কুণ্ডলিনী-উত্থাপনের ক্রিয়ানুসারে শ্বাসের সাধনে পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সহিত জীবাত্মাকে কুণ্ডলিনীর সাহায্যে মূলাধারপদ্ম হইতে ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং ললনাচক্র ভেদ করিয়া ভ্রূর মাঝারে আজ্ঞাচক্রে নিরুদ্ধ করিবেন। এইসময় নাসিকাদি মুক্ত করিয়া বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করতঃ গুহ্যদেশ সংকোচনপূর্বক কুম্ভক করিয়া যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিতে হয়।* তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই প্রাণবায়ু মহাতেজে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদকরতঃ বাহির হইয়া পরব্রহ্মে মিলিত হইবে। ইহাতেই জীবাত্মার মহামুক্তি সাধিত হইয়া থাকে।

এইরূপে যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের সময়ে ভিতরে কিরূপ কার্য হয়, যোগবলে যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। দেহত্যাগকালে প্রথমে স্থূলদেহে তিনি বায়ুসাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্যোতির স্পন্দন স্থির করেন, ধূম কিংবা মায়া উৎপন্ন হইতে দেন না। কোন প্রজ্বলিত দীপে বহির্বায়ুসংযোগে ধূমের উৎপত্তি হয়; কিন্তু আবার যদি আভ্যন্তরিক অন্য একটি শক্তিসংযোগে সেই ধূমের কারণকে সংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন করা যায়, তবে নির্ধূম জ্যোতিঃ স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই জ্যোতিঃই জ্ঞান। ইহা অন্তর্নিহিত শক্তি, জলন্ত অগ্নি। জীবাত্মা সুষুম্নাবর্ত্মে আজ্ঞাচক্রে আসিয়া ঐ জ্যোতিঃকে টানিয়া লয়। এই জ্যোতির নাম কুণ্ডলিনী, অন্তর্নিহিতা শক্তি, যাহা

* নয়ন শ্রবণ মুক্ত লিঙ্গ মলদ্বার।
মুহূর্তেকে রোধ তবে করিবে আবার।—শ্রীমদ্ভাগবত

যারা আত্মসংবরণ বা প্রাকৃতিক বাহ্যাকর্ষণ সংবরণ করা যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বোধহয় জানেন যে পৃথিবীর মধ্যশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া যদি কোন প্রকারে সূর্যলোকে লওয়া যাইত, তবে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইয়া পিণ্ডের ন্যায় লীন হইয়া যাইত, চন্দ্রও আকর্ষণ-বিচ্যুত হইয়া সূর্যে গিয়া মিশিত। এরূপ ঘটনা জড় সৌরজগতে এখনও হয় নাই; অতীন্দ্রিয় সৌরজগতে হইয়াছে। এইখানে প্রাণ কুণ্ডলিনীশক্তির সহযোগে অর্চিঃপথ প্রাপ্ত হয়। কুণ্ডলিনীর দুইটি স্পন্দন আছে; তাহাই জীবের দুই নিশ্বাস। এই স্পন্দন দুইটি না থামাইলে কুণ্ডলিনী-শক্তি নিশ্চয় দুই পথে হেলিতে দুলিতে থাকে। ইহার ফলে পিতৃযানের পথ সৃষ্টি হয়। কিন্তু উদ্বোধিতা শক্তি স্পন্দনমুক্ত হইলে জ্যোতির্বর্ত্মে সূর্যলোকে যাইবে। প্রথমে এই প্রক্রিয়াদ্বারা যোগী দ্বাদশ রাশি, চন্দ্র প্রভৃতির আকর্ষণ এড়াইয়া, কিংবা কাল, দেশ প্রভৃতি উপাধি এড়াইয়া শীর্ষস্থানীয় সূর্যমণ্ডলে বা সহস্রারে আসেন। সেখানে উদ্বোধিতা শক্তি চপলার ন্যায় শোভা পায়। তখন জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মরন্ধ্রভেদকালে সেখান হইতে শ্রীগুরুরূপী মহাপুরুষ জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

বলা বাহুল্য, পূর্বপূর্ব অভ্যাসযোগে পারদর্শী না হইলে কেহই দেহ-যোগ অবলম্বন করিতে পারেন না। উপযুক্তভাবে শিক্ষা-প্রণালী জানিতে পারিলে, সহজেই দেহযোগ-অভ্যাসে জীবাত্মাকে মুক্ত করা যায়। এক্ষণে—

উপসংহার-

কালে দীন গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, সকলেই একবার ভাবিয়া দেখিবেন, অধর্মপ্রণোদিত হইয়া কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু আপনি যখন সেই অজ্ঞাত

প্রদেশে চলিয়া যাইবেন, তখন রাহাখরচ বলিয়াও একটি পয়সা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। যে স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করিবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কতই গর্হিতাচরণ করিয়াছেন, সেই স্ত্রী-পুত্রাদি কেহই ত সঙ্গে যাইবে না। তখন স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন, সিপাই-শাস্ত্রী কাহারও দ্বারা কোন উপকার পাইবেন না, নিজেই কেবল যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইবেন। এই যে অধর্ম আশ্রয় করিয়া, পরের অনিষ্ট করিয়া অর্থোপার্জন ও সঞ্চয় করিয়াছেন, তখন ঐ অর্থদ্বারা আপনার কোন উপকার হইবে না, প্রত্যুত তাহার জন্য তীব্র যাতনা ভোগ করিবেন। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবাদ্ বিভবাদপি।
ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা ন তু রোগজা॥

—বরং দরিদ্র হইয়া দুঃখে থাকা ভাল, তথাপি অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নয়। যেমন সুস্থ ক্ষীণশরীরও ভাল, অথচ রোগে ফুলিয়া মোটা হওয়া ভাল নহে।

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে, ধনই বল, আর জীবনই বল, তৃণপত্রগামী জলবিন্দুর ন্যায় সকলই চঞ্চল, অতএব ধর্মাচরণ কর। তাহা হইলে ইহকালে কীর্তি ও পরকালে অনন্তসুখ লাভে অধিকারী হইবে। এই অনিশ্চিত ও সুদুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্মোপার্জন করিল না, তাহার জীবন বৃথা এবং সে ব্যক্তি ইহ-পরকালে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। যথা—

যস্য ত্রিবর্গশূন্যস্য দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ।
স লৌহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥—মহাভারত

—ধর্মোপার্জনাদি না করিয়া যে ব্যক্তির দিন আসিতেছে ও যাইতেছে, কর্মকারের ভস্ত্রা (জাতা) যেমন বৃথা নিশ্বাস ফেলিয়া থাকে,

সে ব্যক্তিও তদ্রূপ বৃথা জীবিত। বাস্তবিক বংশমর্যাদায় অথবা বিষয়-খ্যাতিতে মানুষ উচ্চ হইতে পারে না, জ্ঞান ও গুণই মানবের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করে। কেননা—

বিদ্যা বিত্তং বপুঃ শৌর্যং কুলে জন্ম নিরোগিতা।
সংসারোচ্ছিত্তিহেতুশ্চ ধর্মাদেব প্রবর্ত্ততে ॥—মহাভারত

বিদ্যা, বিত্ত, দেহ, শৌর্য, শ্রেষ্ঠকুলে জন্ম, দেহ অরুগ্ন থাকা ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, সকলই ধর্ম হইতে প্রসূত হয়। কিন্তু আধুনিক বিবেকবাদিগণ স্বীয় বিকৃত বুদ্ধিকেই "বিবেক" জ্ঞানে বিষম অনর্থোৎপাদন করিতেছেন। তাঁহারা বিবেকের দোহাই দিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, যোগবলশালী আর্যঋষিপ্রণীত শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে শাস্ত্র আশ্রয় ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য গতি নাই। যাহারা ধর্মে কর্মে স্বেচ্ছাচার-বশবর্তী হইয়া স্বকপোলকল্পিত মতস্থাপনে প্রয়াসী, যাহারা পাশ্চাত্যদেশের আমদানি "বিবেকবুদ্ধি" ধার করিয়া এবং বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া স্বজাতীয় শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, যাহারা শাস্ত্র-বাক্য উপেক্ষা করিয়া, বিষয়বিষবিদগ্ধ চিত্তে বিচক্ষণ বুদ্ধিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করে, তাহারা ইহকালে সুখ ও পরলোকে পরমাগতি লাভ করিতে পারে না। যাহারা বিবেকের দোহাই দিয়া নিজের মতলবমত কার্যাকার্য বিচার করে, তাহাদিগের বিবেক-শব্দের কোন অর্থজ্ঞানই নাই। জীবের বুদ্ধি নিজের সংস্কারানুরূপ গঠিত; সুতরাং তাহার কার্যাকার্য-বিচারের শক্তি কোথায়? যাহারা বিষয়-সম্পত্তি এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিকেই প্রাণতোষক ও মুখরোচক জ্ঞান করিয়া তদাশায় পাপসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কত প্রকার মন্দকর্ম করিতেছে, তাহাদের নিকট ধর্ম ভয়ানক অরুচিকর ও অতৃপ্তিদায়ক। যে সকল ব্যক্তির হৃদয় স্বার্থে পরিপূর্ণ, তাহাদের দ্বারা কোনকালে কোন

দেশে, দেশের, দশের বা সমাজের উপকার সাধিত হয় নাই। যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি গীতার দোহাই দিয়া অধর্ম প্রচার করেন, তাঁহাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ভগবান্ বলিয়াছেন—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

—গীতা, ১৭৫-৬

—যাহারা অশাস্ত্রবিহিত তপস্যা করে এবং দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ, বলযুক্ত, তাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে কৃশ করিয়া আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে নিশ্চয় বিবেকবর্জ্জিত অসুর বলিয়া জানিবে।

অতএব সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আজকাল হালফ্যাশনের বাবুদিগের খামখেয়ালি ও মনগড়া উপাসনা কিছুই নহে। জাতীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যদি কেহ গীতার ঐ শ্লোক দুইটি প্রক্ষিপ্ত বা ব্রাহ্মণের স্বার্থগাথা বলেন, তবে আমি নাচার। বাস্তবিক যাঁহার যাহাতে অধিকার নাই, তাঁহার তাহাতে হস্তক্ষেপ দেশের ও সমাজের মহা অনিষ্টকারক। আত্ম-অভিমানে পূর্ণ হইয়া তাঁহারা ত প্রবঞ্চিত হন, আবার নানা উপায়ে অপরকেও প্রবঞ্চিত করিয়া থাকেন। মহাত্মারা এই সকল ব্যক্তিকে বঞ্চক শব্দে অভিহিত করেন। যথা—

গৃহী হো কর্ কহৈ জ্ঞান।
ভোগী হো কর্ লগাবে ধ্যান॥
যোগী হো কর্ ঠোকৈ তপ।
তিনোঁ আদমী মহা ঠগ্॥

অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দেখায়, ভোগী হইয়া ধ্যানানুসন্ধানে রত হয় এবং যোগী হইয়া নারীসহবাস করে, এরূপ ব্যক্তিদিগকে মহাঠগ্ (বঞ্চক) বলে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা গৈরিকবসন পরিধান করিয়া, চুলদাড়ি বা জটাজুট রাখিয়া, বিভূতি বা চন্দনাদি দ্বারা অলকা-তিলকা করিয়া মহাসাধুর ভাব দেখাইয়া থাকে; কিন্তু অন্তর বিষয়চিন্তা, কপটতা, কুটিলতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, নিন্দা ও অহংভাবে পরিপূর্ণ। এরূপ বর্ণচোরা ভণ্ডদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্নাহার ত্যাগ করিয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে। অনেক নির্বোধ লোক ভুলিয়া বচনবাগীশ ব্যবসায়ীর নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করে। এইরূপ মাতাল (ভণ্ড তান্ত্রিক) এবং বৈতাল (গৌড়ীয় বৈরাগী)-গণ দেশ উৎসন্ন দিতেছে।

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ॥

—অভিমানকে সুরাপানসম, গৌরবকে রৌরব নরকসম, প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠাসম জ্ঞান করিলে, তবে ত সাধন ভজন হয়!

নতুবা বসনে কি আসনে, অশনে কি অনশনে, রসনে কি ভাষণে এবং আসল অভাবে নকলে কিছু সফল হইবে না। মহাত্মা কবীর বলিতেছেন—

"মূঁড় মূঁড়াবে জটা রক্‌খাবে মস্ত ফিরৈ জৈসা ভৈসা।
খলড়ী উপর খাক্ লগাবে মন জৈসা কা বৈসা॥"

অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে, জটা রাখিলেই বা কি হইবে, আর গাত্রোপরি ভস্ম লেপন করিলেই বা কি হইবে? যদি চিত্তশুদ্ধি না হইল, তবে এসকল বেশ-ভূষা কি কার্যকারক?

তাই বলি ভণ্ডামিতে মানবজীবনটা পণ্ড না করিয়া, অহঙ্কারাদি সর্বাশা ত্যাগ করিলে আর চিরবদ্ধ থাকিতে হয় না; অনায়াসে

ত্রিতাপমুক্ত হইয়া নির্বাণমুক্তি লাভ করা যায়। মানব আপনাকে মারিতে তারিতে আপনিই কর্তা, কেননা বাসনাই সকল বিষয়ে বিষয়ীর ভর্তা। আপনি মনে মনে বাসনাকে ত্যাগ করিয়া দেখুন, আপনাকেও দেখিতে পাইবেন না। কামনাকে ত্যাগ করিতে পারিলে আর সাধারণের মত শরীরধারণ না হইয়া সর্বাধার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইবেন।

সংসারে ধর্ম, কর্ম, চরিত্ররক্ষা বা সাধনা-তপস্যারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। জগতে সকল ভাব, সকল চিন্তা, সকল কামনাই অভ্যাসপুষ্ট। যাহা নিত্য করা যায়, তাহা একরূপ আত্মিক-সংস্কার বা প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যাহা অভ্যাস করিবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারই শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। কর্ম ও কামনা অনুসারে মানুষের গঠনের যখন পরিবর্তন ও বিকৃতি হয়, তখন মানসিক প্রকৃতিও যে তাহাতে বিশিষ্টরূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে, এ কথা অধিক বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না।

তাহার পর, এক কথায় জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে, জীবন কেবল মরণের জন্য আয়োজন। সংসারী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী, ভোগী সকলেই আজীবন মরণের বিলি-বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত। দাতা, কৃপণ, বিলাসী, বৈরাগী, সকলের জীবনেরই একমাত্র লক্ষ্য মৃত্যু বা মনুষ্য-জন্মের অবসান। কারাবদ্ধ ব্যক্তি খাটিয়া-খুটিয়া আপনার মুক্তি-স্বাধীনতা অর্জন করে, দেহবদ্ধ জীবের জীবনও ঠিক সেইরূপ ভাবে কাটিয়া যায়। সংসারে যে এত বিভিন্নজাতীয় মনুষ্য-উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লক্ষ্য একই—অদৃষ্টানুসারে তাহার প্রকারের ভিন্নতা হইয়া থাকে। যে চোর, যে সাধু, উভয়েই কামনার দাস, তবে তাহাদের কামনার স্বরূপ বুঝিবার প্রভেদ হয় মাত্র। অতএব ভাল করিয়া, জ্ঞান

মরণের আয়োজন করিতে হইলে "ভাল"র উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করাই একমাত্র অনিবার্য সাধনা। কেননা, ভাল কামনা, ভাল চিন্তা জীবনে বিশেষ অভ্যস্ত বা প্রকৃতিগত না হইলে, মৃত্যুযাতনা বা অন্তিম বিদায়ের ব্যস্ত-কোলাহলের ভিতর তাহা মনে না আসাই সম্ভব। যাহা আহার করা যায়, তাহারই উদ্গার ওঠে; তাই বলি কামনা-লালসা দু'দণ্ডের খেয়াল নহে, তাহা অনন্তের পরমায়ু, সংস্কাররূপে তাহা আত্মার আবরণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সংস্কার ভেদেই সাধু-অসাধুর ব্যবধান। সংসারে কুলোক বলিয়া কোন জীব জন্মগ্রহণ করে না। এইরূপ কামনা-কৃত্যের কু-সু অনুসারে অদৃষ্ট-উন্নতির তারতম্য হয়। কামনা তাই মনুষ্যভাগ্যের অপর পৃষ্ঠা। অদৃষ্ট কি, তাহা কথায় বুঝান যায় না, অদৃষ্ট—অ-দৃষ্ট; তাহা রুগ্ন-ভগ্নের সাফাই সাক্ষী নহে।

সকলেই জানেন, মৃত্যুপতি ধর্মরাজের পার্শ্বে চিত্রগুপ্ত নামে একজন পার্ষদ আছেন। তাঁহার বিরাট খাতায় আমাদের পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম লেখা রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, চিত্র গুপ্ত অর্থাৎ এখানে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া বেমালুম পাপকর্ম করিয়া হজম করা যায়; কিন্তু সেখানে আমাদের গুপ্তচিত্র সমস্তই অঙ্কিত রহিয়াছে, সুতরাং নিস্তার নাই। অতএব সকলেরই কর্তব্য যে, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিয়া রিপুগণকে স্ববশে রাখিয়া অর্থাৎ পরদার, পরদ্রব্যে লোভ, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, দ্বেষ-হিংসা, পরপীড়নাদি না করিয়া সত্য, দয়া, শান্তি, ক্ষমাদি সাধু ইচ্ছার বশীভূত হইয়া সর্বদা পরোপকার করা এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পিতামাতা গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের সেবা করা। আহারের সময়, বিহারের সময়, শয়নের সময়, ভ্রমণের সময়, কার্যের সময়, সকল সময় এবং সকল কার্যে মানব যখন আপনার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিকে লইয়া আপন ইষ্টদেবে মন-প্রাণ সহ আত্মসমর্পণ করিতে শিখে, যখন ইষ্টদেব হইতে

আপনাকে আর ভিন্ন বোধ করিতে পারে না, তখন সমুদয় সিদ্ধিই আপনা-আপনি উপস্থিত হয়।

পাঠক! এই পুস্তকের লিখিত বিষয় আমার পুঁথিগত বিদ্যা নহে; অথবা গহনাদায়গ্রস্ত হইয়া আমি এই সকল পুস্তক প্রচার করিতেছি না। হিন্দুধর্ম অনুশীলনে আমি যে অপার্থিব পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার বঙ্গবাসী ভ্রাতাগণকে তাহার অংশভাগী করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। খৃষ্টান, মুসলমান, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম সকলে আপন আপন সম্প্রদায়োক্ত ভাব বজায় রাখিয়া, পুস্তকোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন ও মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারিবেন। হিন্দুধর্মের কোন জটিল রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর দেওয়া হইবে। প্রকৃত অধিকারী হইয়া আমার নিকট আসিলে সাদরে সযত্নে যোগ ও তন্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী শিক্ষা দিব। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে, তাই আমার এই বিরাট আয়োজন। ধর্মবল সুদৃঢ় না হইলে কেহ কখনও কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। জীবনের প্রথম কার্য চরিত্রগঠন;—যাহার চরিত্রবল নাই, সে কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। তাই বলি পাঠক! জাতীয় ধর্মে, জাতীয় আচার-ব্যবহারে অবিশ্বাসী হইয়া জগতের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে লুক্কায়িত থাকিবেন না। গ্রন্থ-অধ্যয়নে জ্ঞান হয় না—জ্ঞান হয় সাধনায়। সাধন-বলহীন কামকলুষিত জীবের বিদ্যা কেবল পাখীর হরিনামশিক্ষা। অনধিকারী শাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে তাহার চক্ষে সমস্ত বিকৃত, বিশৃঙ্খল, বিসংবাদী বোধ হইবে। আগে সাধনবল সংগ্রহ কর, দেখিবে হিন্দুধর্ম গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণ। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে আর্য-ঋষিগণের যুগযুগান্তরের আবিষ্কৃত শাস্ত্রে কি অমূল্য রত্ন সঞ্চিত আছে। হিন্দুধর্ম অলঙ্ঘ্য প্রমাণে সুদৃঢ় ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইয়া স্বয়ংসিদ্ধ

ব্রহ্মবিদ্যারূপে চিরদিন বর্তমান রহিয়াছে। এমন উদার ও উচ্চ শিক্ষা কোন ধর্মসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হইবে না। হিন্দুধর্মের উদারগর্ভে সর্বজনগণকে স্থান দিবার জন্য এই ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। অতএব সামান্য জনগণের ধর্মাচরণ-পদ্ধতি দেখিয়া কেহ যেন ইহাকে কুসংস্কার বা অজ্ঞানবিজৃম্ভিত শূন্যোচ্ছ্বাস মনে করিবেন না। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে তত্ত্ব ধারণা করিতে পার না, তাহা মিথ্যা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলে, বিজ্ঞলোকে কখনও অভিজ্ঞ বলিবে না, বরং অনভিজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। যদি কেহ এই পুস্তকলিখিত সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবেই হিন্দুশাস্ত্রের মহত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবেন। অনুসন্ধান করিয়া, সাধনা করিয়া, সনাতন হিন্দুধর্মের পূর্বগৌরব জাগ্রত ও পূর্বপুরুষগণের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করুন এবং নিজেও দুর্লভ মানবজীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন। এখন আমিও "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" বলিয়া পূর্ণানন্দে আনন্দ-কন্দসম্ভূত দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষের হরি-হর-বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদদ্বন্দ্বারবিন্দ বন্দনা করিয়া ভক্তভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আনন্দকন্দসম্ভূতং জ্ঞাননালসুশোভনম্।
ত্রাহি মাং নরকাদ্ঘোরাদ্দিব্যজ্যোতির্নমোঽস্তু তে॥

ওঁ শান্তিরেব শান্তির্ ওম্

সম্পূর্ণ

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

শ্রীশ্রীনিগমানন্দের

জীবনী ও বাণী

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি. লিট. (অন) কবিশেখর মহোদয় লিখিয়াছেন—

বহু গল্প, বহু উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ আজকাল সপ্তাহে সপ্তাহে বঙ্গভাষার পাঠাগার অলঙ্কৃত করিতেছে; কিন্তু একখানি নিগমানন্দের "জীবনী ও বাণী" পুস্তকে যে আনন্দ, যে উপদেশ, যে উপন্যাসের ন্যায় ঘটনাবৈচিত্র্য ও সারগর্ভ কথা পাইলাম, তাহা পূর্বোক্ত শত শত রত্নমালার মধ্যে মধ্যমণিস্বরূপ। এই পুস্তকে যে সাধুকে দর্শন করিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া সত্যই ঠাকুরদর্শনের পুণ্যলাভ হইল। যে সাধনা দেশ হইতে লুপ্তপ্রায়, এই পুস্তকে সেই সাধনার অমৃত-পথ দেখিতে পাইলাম। নিগমানন্দের বাণী দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের বাণীর মতই সরল, মর্মস্পর্শী ও জীবন পথ চিনাইবার পক্ষে আলোক-বর্তিকা-স্বরূপ। * * * এই বইখানি বাঙ্গালা গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে সযত্নে রাখার সামগ্রী। ইহা দেবমাল্যের মত পবিত্র, উৎকৃষ্ট কাব্যের মত রসোদ্দীপক এবং মধুচক্রের ন্যায় মধুর। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি পুত্রকন্যাগণ লইয়া সশ্রদ্ধভাবে ইহার দুই এক অধ্যায় পাঠ করেন, তবে তাঁহার গৃহের বায়ু নির্মল ও বিশুদ্ধ হইবে।

প্রবর্ত্তক—* * জিজ্ঞাসু মন এবং শ্রদ্ধাবান্ ইহাতে তৃপ্ত হইবে, অপ্রাকৃত সাধন-পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা এই পুণ্যগ্রন্থে সন্নিবদ্ধ সদ্‌গুরুর দিব্যদর্শন ও অনুভূতিলব্ধ বাণীর মাঝে আলো ও সঙ্কেত পাইবেন। * *

আনন্দবাজার পত্রিকা—* * * এই সুলিখিত ও সুসম্পাদিত পুস্তকখানি অধ্যাত্মরসপিপাসুদিগকে যথেষ্ট শান্তি দিবে॥

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত

ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ-পরিচালিত ত্রৈমাসিক পত্র সুদর্শন বলেন—

কালধর্মে মহাপুরুষদের পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইলেও তাঁহাদের সিদ্ধ জীবনের অলৌকিক কাহিনী ও উপদেশামৃত একদিকে যেমন এই নশ্বর জগতে তাঁহাদিগকে অবিনশ্বর করিয়া রাখে, অন্যদিকে আবার ত্রিতাপে তাপিত নরনারীর জন্য অমৃতের সন্ধান দিয়া থাকে। বাংলার জাতীয় জীবন আজ চরম দুর্দশায় উপনীত। মৃতপ্রায় এই অভিশপ্ত জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, পাশ্চাত্য রাজনীতির কোন ইজমের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে না। ভারতীয় জাতির মূল প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা। অতএব আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা লইয়াই জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত এইরূপ একখানা গ্রন্থ যাহা হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা আমরা শুধু ব্যষ্টিজীবনে নহে, সমষ্টিজীবনেও পাইতে পারি। মনোরম ভাষায় ও অপূর্ব ভঙ্গীতে এই সকল উপদেশ বলা হইয়াছে। গ্রন্থপাঠে কর্মী কর্মের প্রেরণায়, জ্ঞানী জ্ঞানের মহিমায় উদ্দীপিত হইবে এবং প্রেমিক ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব আস্বাদ লাভ করিবেন। প্রবাসী, গৃহী ও সন্ন্যাসীর আদর্শের কথা যেমন ইহাতে বলা হইয়াছে, আবার সমাজ-সংস্কারক এবং রাষ্ট্রনেতাও তাঁহাদের চলার পথের নির্দেশ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। অতএব এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির নিত্য-পাঠ্য—নিত্য-সঙ্গী হইবার উপযুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে।

উত্তরস্কন্ধে—ভক্তিই মুক্তির কারণ, মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ, বেদান্তোক্ত নির্বাণ মুক্তি, মুক্তিলাভের উপায়, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ, অবধূতাদি সন্ন্যাস, সন্ন্যাসীর কর্তব্য, ভগবান্ শঙ্করাচার্য ও তদ্ধর্ম, আচার্য শঙ্কর ও গৌরাঙ্গদেব, ভগবান্ রামকৃষ্ণ, জীবন্মুক্ত অবস্থা ইত্যাদি।

৬ মায়ের কৃপা

এই গ্রন্থে মা—কে, এবং কিরূপে মায়ের কৃপা লাভ করা যায়, তাহা অধিকারভেদে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীগুরুর কৃপাই যে সাধনা ও সিদ্ধির মূল, তাহা সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। **উপদেশগুলি মা স্বয়ং শ্রীমুখে প্রদান করিয়াছেন।** নবম সংস্করণ, মূল্য ১·৫০ টাকা মাত্র। **হিন্দী সংস্করণ** ১·০০ টাকা।

৭ কুম্ভযোগ ও সাধু মহাসম্মিলনী

এই গ্রন্থে কুম্ভযোগ, তাহার স্থান ও সময়, সাধুসম্মিলনী কি উদ্দেশ্যে কাহার কর্তৃক স্থাপিত, সাধকগণের বিবরণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, ইহাতে তাহার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ২·০০।

৮ তত্ত্বমালা (প্রথম খণ্ড)

এই খণ্ডে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব, মহাবিদ্যাতত্ত্ব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শারদীয়া ও কালী প্রভৃতি শাক্তসম্প্রদায়ে প্রচলিত যাবতীয় পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদির তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য ২·৫০ মাত্র।

৯ তত্ত্বমালা (দ্বিতীয় খণ্ড)

এই খণ্ডে ভগবত্তত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উৎসবাদির তত্ত্বসমূহ বিবৃত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের চরম তত্ত্ব অবগত হইবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণ মূল্য ৩·০০ টাকা মাত্র।

১০ তত্ত্বমালা (তৃতীয় খণ্ড)

এই খণ্ডে আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগতত্ত্ব, যোগনিদ্রাতত্ত্ব নিবৃত্তিতত্ত্ব, সেবাতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, মৃত্যুতত্ত্ব, অশৌচতত্ত্ব, উৎসবতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব ইত্যাদি— হিন্দুর সাধনা সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ, মূল্য ৩·০০ মাত্র।

১১ সাধকাষ্টক

এই গ্রন্থে আটজন গৃহস্থ সাধুর পূত জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক চরিত্র-গঠন ও ধর্মলাভে বিশেষ সহায়তা করিবে। ৪র্থ সংস্করণ মূল্য ২·০০ মাত্র।

১২ বেদান্ত-বিবেক

ইহাতে নিত্যানিত্যবিবেক, দ্বৈতাদ্বৈতবিবেক, পঞ্চকোষ-বিবেক, আত্মানাত্মবিবেক ও মহাবাক্য-বিবেক এই কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ২·০০।

১৩ শিক্ষা

শিক্ষার আদর্শ, সমস্যা, সমাধান, প্রয়োগ—এই পর্বচতুষ্টয়ে বিভক্ত। শিক্ষাকে অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া দেখিবার ইহা অভিনব প্রয়াস। শিক্ষাকে কি করিয়া জীবনে ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে, তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্কেত এই পুস্তকে পাইবেন। ৩য় সংস্করণ মূল্য ৫·০০ মাত্র।

১৪ উপদেশ-রত্নমালা

এই পুস্তকখানিতে ঋষি ও সাধু-মহাপুরুষদিগের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমূলক কতকগুলি আধ্যাত্মিক-তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। সপ্তম সংস্করণ, মূল্য ০·৭৫ পয়সা মাত্র।

১৫ স্তোত্রমালা

সারস্বত-মঠে পঠিত নিত্য-নৈমিত্তিক স্তোত্রসমূহের সংগ্রহ। বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা। দ্বাদশ সংস্করণ, মূল্য ১·০০ টাকা।

১৬ শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত জীবন-কথা আত্মপরিচয়, তত্ত্বোপদেশ ও অভয়বাণীর অপূর্ব সমাবেশ। ইহা গীতাপাঠের

ন্যায় স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন সমভিব্যাহারে প্রতিটি গৃহে নিত্য পঠিত হইলে সংসারে বিমল আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। ষষ্ঠ সংস্করণ, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সহ মূল্য ৯.০০ মাত্র।

১৭ অভয়বাণী

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তবৃন্দ সমীপে লিখিত ও শ্রীমুখ-কথিত আশা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণীবিশেষের সংগ্রহ। হতাশাযুক্ত নিরাশ প্রাণের একমাত্র অবলম্বন। ইহা পাঠ করিলে শক্তি, শান্তি ও আনন্দ পাইবেন। ৩য় সংস্করণ, ১.০০।

১৮ নিগম-বাণী

শ্রীমদাচার্য স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব তদীয় শিষ্য-ভক্তগণের নিকট স্বহস্তে যে সমস্ত উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পত্রাবলী হইতে সার্বভৌম বাণী-গুলির সঙ্কলনে এই গ্রন্থের প্রকাশ। ৩য় সংস্করণ, ১.০০।

১৯ কীর্ত্তনমালা

সারস্বত মঠ, আশ্রম ও তদন্তর্গত সঙ্ঘসমূহে গীত কীর্ত্তন ও সঙ্গীতসমূহের অপূর্ব সমাবেশ। চতুর্থ সংস্করণ, ৫.০০।

২০ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত অমূল্য উপদেশ-বাণীর অপূর্ব সমাবেশ। অমৃতের মতই মধুর। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৫.০০ মাত্র।

২১ নিগম-প্রসাদ

শ্রীশ্রীনিগমানন্দদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী তত্ত্ববাণী। ২.০০ মাত্র।

২২ শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-সঞ্চয়ন

গুরুতত্ত্ব সম্পর্কে অভিনব গ্রন্থ। একাধারে বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণের সার নির্যাস এবং সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মর্মবাণীর অপূর্ব সমাবেশ মূল্য ৩.০০ মাত্র।

সারস্বত মঠান্তর্গত শাখাশ্রম ও সঙ্ঘসমূহ হইতে প্রকাশিত

ঠাকুরের চিঠি—ঠাকুর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব কর্তৃক তদীয় শিষ্য-ভক্তগণসমীপে লিখিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্রাবলী। ১ম খণ্ড ২'৫০, ২য় খণ্ড ২'০০, ৩য় খণ্ড ২'০০।

সম্মিলনীর চিঠি—১৩৩৮ হালিসহর ভক্ত-সম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশরাশি। মূল্য ১'৫০।

জয়গুরু নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনম্—মূল্য ০'২০ পঃ।

সদ্গুরু নিগমানন্দ—শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-বিশ্লেষণ। ১'৫০।

সেবকের দিনলিপি—সাধকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের বাণী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। প্রতি খণ্ড ১'৫০ হিসাবে।

নিগম-স্মৃতি—কবিতার ছন্দে ঠাকুরের জীবন কথা। মূল্য ০'৫০ পঃ।

শ্রীশ্রীগুরুগীতা—সংস্কৃত মূল ও তাহার প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ। ০'৭৫ পঃ।

আচার্য্যপ্রসঙ্গ—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ পরমহংসদেব-সম্পর্কিত। গুরু-শিষ্য বা ভক্ত ভগবানের মধুর লীলার উজ্জ্বল প্রকাশ। মূল্য ১'৫০।

আমি কি চাই—ঠাকুরের প্রাণের চাওয়া। ০'৫০ পঃ।

হিন্দুবোধন—ঘুমন্ত জাতির জাগরণের বিদ্যুদ্দণ্ড। ১'৫০।

নিয়মপঞ্চক—শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রোক্ত পাঁচটী নিয়মের প্রাঞ্জল বিস্তার। ০'৫০।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবন গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনগঠনোপযোগী উপদেশ-রাশিতে সমলঙ্কৃত—প্রতিগৃহে রাখার এবং বিবাহবাসরে উপহার দেওয়ার উপযুক্ত পরিবর্ধিত অভিনব ৪র্থ সংস্করণ। ১০'০০ টাকা।

নিত্যলোকের ঠাকুর—ভাবলোক বা নিত্যলোকের অপূর্ব বর্ণনা। ১'৫০।

মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর—২য় সংস্করণ। ১'৫০।

নিগমানন্দের আচার্য-অভিমান—১'০০ টাকা। **ঋষি নিগমানন্দ**—১'০০।

নিগমানন্দের গুরুভক্তি—০'৫০। **মায়েদের সিদ্ধি**—০'৫০।

বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ ০'৫০। **সঙ্ঘে যোগদান করিব কেন?** ২'০০

গুরুব্রহ্মের আসনপূজা—২'০০ টাকা। **পঞ্চদশী-প্রদীপ** ১ম—২'৫০।

কামাখ্যায় কুমারী পুজা—পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ। সাধকের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ অনুভূতি ; শেষাংশে কবিতায় 'কামাখ্যা-দর্শন'। মূল্য ১'৫০। **বেদান্তবিদ্ গুরুর বিকাশ ও বেদান্তধর্মপ্রচার** ২'০০।

নিগমানন্দ-দর্শন—সমন্বয়ী চিন্তার মৌলিক আকর। "শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ"-এর দার্শনিক বিশ্লেষণ। মূল্য ৭'০০ টাকা। **ব্রহ্মাভ্যাস** ১'০০।

অমিয় স্মৃতি—শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের অমিয় মধুর স্মৃতি অবলম্বনে রচিত কবিতার নির্ঝর। মূল্য ০'৭৫ পঃ। **আচার্য-শিষ্যের পারম্পর্য**—০'৫০।

প্রেমসেবোত্তরা গতি—বৈষ্ণবশাস্ত্রমন্থনে উদ্ভূত অমৃত-লহরী ৩'০০।

শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ—জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় ৩'০০।

মিলন-বাণী—সুললিত কবিতার ছন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী। প্রথম খণ্ড ১'৫০, দ্বিতীয় খণ্ড ১'৫০ টাকা। **ছন্দে অভয়বাণী** - ১'০০।

সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ—মূল্য ৫'০০ টাকা। **শ্রীকৃষ্ণ**—৫'০০, **ভক্তচরিতামৃত**—৩'০০। **শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুমহিমা**—০'৭৫ পঃ।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-কথামৃত—১ম খণ্ড ৭'০০, ২য় খণ্ড ৩'০০, ৩য় খণ্ড ৩'০০।

নীলাচলের পথে—শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় স্মৃতি-বিজড়িত বিরহ-বিধুর ভক্ত-প্রাণের মর্মনিঙাড়ী ভাবোচ্ছ্বাস। মূল্য ০'৭৫ পঃ।

কচির কূজন ১'০০। **বর্ত্তমান সমাজে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা** ০'৫০। **নিগম-স্মৃতিরেখা** ২'০০। **পুণ্যস্মৃতি** ২'০০। **পুরাতনী** ২'০০। **মর্ম্মবাণী** ৩'০০। **মর্ম্মবীণা** ৩'০০। **মর্ম্মবেণু** ৩'০০। **আনন্দ-নির্ঝর** ৩'০০। **গুরুপদাবলী কীর্ত্তন** ২'০০।

শ্রীশ্রীঠাকুর-মাহাত্ম্য (অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ)—মূল্য ৩'০০ টাকা।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ হালিসহর (২৪ পরগণা)।

২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

৩। সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন, হাওড়া।